Contents

দিগদর্শন-১

(সম্পাদকীয় সংকলন)

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

معالم الطريق–١

تأليف: الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب

الأستاذ فى العربى، جامعة راجشاهى الحكومية

الناشر: حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة و النشر)

প্রকাশক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩

হা.ফা.বা. প্রকাশনা- ৫৫

ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫

মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০

১ম প্রকাশ

রবীউল আখের ১৪৩৭ হি.

মাঘ ১৪২২ বঙ্গাব্দ

ফেব্রুয়ারী ২০১৬ খৃ.

মুদ্রণ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য

৮০ (আশি) টাকা মাত্র

Dikdorshon-1 [Compilation of Editorials (1997-2005) of Monthly At-Tahreek] by the Founder & Chief Editor **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib.** Professor, Department of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh. Published by: HADEETH FOUNDATION

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده–

প্রকাশকের নিবেদন

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা **মাসিক আত-তাহরীক**-এর শুরু হয়েছিল **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর মুখপত্র হিসাবে। যা ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দিক নির্দেশনা প্রদান করে। দেশের সার্বিক সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে 'আত-তাহরীক' তার আপোষহীন ভূমিকা শুরু থেকে এ যাবৎ অব্যাহত গতিতে পালন করে যাচ্ছে। যার সুফল দেশে ও দেশের বাইরে সর্বত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। জাতি গতানুগতিকতা ছেড়ে পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে জামা'আতবদ্ধ ভাবে এগিয়ে চলেছে। জাতীয় জীবনে সংস্কারের এক নতুন স্পন্দন শুরু হয়েছে।

এই আন্দোলনের মুহতারাম আমীরে জামা'আত পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হিসাবে নিজেই এর সম্পাদকীয় সমূহ লিখতেন এবং আজও লিখে চলেছেন। তবে মাঝে-মধ্যে সাথীদের দিয়ে লিখাতেন তাদের হাত পাকা করার জন্য। যার সুফল তিনি পেয়েছিলেন যখন তিনি দীর্ঘদিন কারাগারে থাকা সত্ত্বেও তাঁর হাতে গড়া সাথীরা সৎসাহসের সাথে পত্রিকা চালিয়ে গেছেন। একটি সংখ্যাও বন্ধ হয়নি। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ*।

এক্ষণে আমরা পাঠকদের দাবীতে ও সমাজের সার্বিক কল্যাণ বিবেচনা করে মাননীয় প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকের কারাগার-পূর্ব সম্পাদকীয়সমূহ (১৯৯৭-২০০৫ইং) দিগদর্শন-১ নামে একত্রিতভাবে প্রকাশ করলাম। এরপরেই কারামুক্তির পর থেকে লিখিত সম্পাদকীয়গুলি একত্রিত করে 'দিগদর্শন-২' বের করার এরাদা রইল।

সম্পাদকীয় হ'ল আন্দোলনের প্রাণ। এর মাধ্যমে যেমন আন্দোলন-এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে জানা যাবে, তেমনি অনেক পুরানো তথ্যাবলী সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে। সে দিক বিবেচনায় সম্পাদকীয় সমূহ হ'ল স্ব স্ব সময়ের দর্পণ স্বরূপ। জ্ঞানী পাঠকের নিকট তা মূল্যবান খোরাক হবে বলে আমরা আশা করি। ইতিপূর্বে 'দর্শন' বিষয়ক ১৬টি সম্পাদকীয় নিয়ে 'জীবন দর্শন' নামে প্রকাশিত বইটি সকলের অন্তর কেড়েছে। আশা করি দিগদর্শন-১-য়ে জমাকৃত ৭৯টি সম্পাদকীয় যা আমরা ১০টি শিরোনামে ভাগ করেছি, সেগুলি বিদগ্ধ পাঠকের সামনে সমাজ পরিবর্তনে নতুন চিন্তার দুয়ার সমূহ খুলে দিবে। আল্লাহ মাননীয় লেখককে এবং গবেষণা বিভাগ ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ইহকালে ও পরকালে উত্তম জাযা দান করুন -আমীন!

বিনীত

-প্রকাশক

Contents

সূচীপত্র (المحتويات)

বিষয় **পৃষ্ঠা**

Contents

Contents

রাজনৈতিক

আন্তর্জাতিক

মুসলিম বিশ্ব

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

নাহ্মাদুহু ওয়া নুছাল্লী 'আলা রাসূলিহিল কারীম

আত-তাহরীক : যাত্রা হ'ল শুরু

১. আরবীতে **'তাহরীক'** অর্থ আন্দোলন। **'আত-তাহরীক'** অর্থ বিশেষ আন্দোলন। ইংরেজীতে যাকে বলা যাবে The Movement অথবা That very Movement. অতএব **'আত-তাহরীক'** বিশেষ একটি আন্দোলনের লক্ষ্যে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। সে আন্দোলন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জীবন গড়ার আন্দোলন। সে আন্দোলন আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি ভিত্তিক সমাজ গড়ার আন্দোলন। সে আন্দোলন বিশ্ব মানবতার প্রকৃত মুক্তি আন্দোলন।

যে মানুষ নিজের জ্ঞানকে অহি-র জ্ঞানের সামনে বিনা দ্বিধায় সমর্পণ করে দিবে। যে মানুষ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নির্দেশকে সানন্দে মাথা পেতে নিবে। দুনিয়ার চাইতে আখেরাতকে সর্বক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিবে- 'আত-তাহরীক' তাদেরই মুখপত্র হবে।

আত-তাহরীক-এর যাত্রা শুরুতে বিশ্বপ্রভু আল্লাহ্র নিকটে আমাদের একান্ত প্রার্থনা তিনি যেন এর যাত্রাপথকে নিরাপদ রাখেন, তাঁর বান্দাদের অন্তরকে এর দিকে রুজূ করে দেন এবং কল্যাণময় সমাজ গড়ার প্রকৃত লক্ষ্য হাছিলের পথে তাওফীক দান করেন। আমীন!

দীর্ঘ দিনের সোনালী স্বপ্ন বাস্তবায়নের রক্তিম প্রভাতে আমরা আমাদের সকল গ্রাহক, অনুগ্রাহক, লেখক-লেখিকা, পাঠক-পাঠিকা ও শুভাকাংখী ভাই-বোনকে আন্তরিক সালাম ও মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন![১]

২. ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা **'আত-তাহরীক'** বের হওয়ার সাথে সাথেই এমনভাবে জনপ্রিয়তা পাবে আশা করিনি। আল্লাহ পাকের হাযারো শুকরিয়া যে, তিনি তাঁর বান্দাদের অন্তরকে আমাদের দিকে রুজূ করে দিয়েছেন। **'আত-তাহরীক'** আত্মপ্রকাশের সাথে সাথে তা যে পরহেযগার মুমিনদের হৃদয় কেড়েছে, তার

১. ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৭।

প্রমাণ প্রতিদিন আগত চিঠিপত্রের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। মনে হচ্ছে যেন ক্ষুধিত জনগণ এতদিন এর অপেক্ষায় প্রহর গুণছিলেন। সুধী পাঠকবৃন্দের প্রাণভরা দো'আ ও মূল্যবান পরামর্শ পেয়ে আমরা উৎসাহিত বোধ করছি। ১ম সংখ্যার চাহিদা বারবার আসছে। কিন্তু স্টক প্রথম এক সপ্তাহের মধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। ফলে ২য় সংখ্যা দ্বিগুণ ছাপা হ'ল। বিভাগও ৬টির স্থলে ১৪টি করা হ'ল। যত দিন যাবে, **'আত-তাহরীক'** তত সমৃদ্ধ হবে ইনশাআল্লাহ। সুধী লেখকবৃন্দকে তাঁদের মূল্যবান লেখা পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি ও আগামীতে আরও সারগর্ভ লেখা পাঠানোর আহ্বান জানাচ্ছি।

আধুনিক জাহেলিয়াতের গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত বাংলার ঘুমন্ত চেতনাগুলিকে **'আত-তাহরীক'** আন্দোলিত করে তুলুক। অহি-র স্বচ্ছ আলোকের তীব্র ঝলকানিতে কালো অমানিশা বিদূরিত হৌক। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনে শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরে আসুক- এই কামনা নিয়েই শেষ করছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন![২]

৩. ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা **'আত-তাহরীক'** আত্মপ্রকাশের ছুবহে ছাদিকে হৃদয় নিংড়ানো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি মহান কারুণিক আল্লাহ পাকের হুযূরে, যাঁর অফুরন্ত রহমতে আমরা আমাদের প্রিয় পত্রিকার প্রথম সরকারী রেজিস্ট্রেশন হাতে পেয়েছি, *আল-হামদুলিল্লাহ*। আজ আমরা স্মরণ করছি আমাদের প্রথম প্রকাশিত **'তাওহীদের ডাক'** মাসিক মুখপত্রকে। 'শত ফুল ফুটতে দাও' এই আহ্বান রেখে ১৯৮৫ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১ম যুগ্ম সংখ্যা বের হওয়ার পরপরই সরকারী রেজিস্ট্রেশন হওয়ার মুখে বিশেষ মহলের গোপন হস্তক্ষেপে যা বন্ধ হয়ে যায়। তার দীর্ঘ এক যুগ পরে নতুন নামে ও নতুন আঙ্গিকে প্রকাশিত হচ্ছে মাসিক **'আত-তাহরীক'**। 'ইসলামের নির্ভেজাল সত্যকে জনসমক্ষে তুলে ধরার যে প্রতিজ্ঞা' নিয়ে সেদিন 'তাওহীদের ডাক' আত্মপ্রকাশ করেছিল, সেই একই প্রতিজ্ঞা নিয়ে 'আত-তাহরীক' তার নবযাত্রা শুরু করেছে। নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করাই আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে উত্তরণের বন্ধুর পথ পাড়ি দেওয়ার জন্য আমরা আল্লাহ্র রহমতের ভিখারী।

---

২. ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৯৭।

বিগত দুই সংখ্যার ৪০ পৃষ্ঠার স্থলে এবারের সংখ্যা ৪৮ পৃষ্ঠা করা হ'ল। পরবর্তীতে পৃষ্ঠা সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করার ইচ্ছা রইল। গতবারের ১৪টি বিভাগের সাথে এবারে আরেকটি যোগ করে মোট ১৫টি বিভাগ করা হ'ল।

পরিশেষে যে মহান প্রভুর মঙ্গল ইচ্ছায় সরকারী রেজিস্ট্রেশন নিয়ে **'আত-তাহরীক'** তার ৩য় সংখ্যায় পদার্পণ করল, সেই আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে জানাই লাখো সিজদায়ে শুক্র। *আল্লাহুম্মা আমীন!*[৩]

ধর্মীয়

৪. তাওহীদ ও রিসালাত

মুসলিম জীবনের চলার পথে দু'টি প্রধান আলোকস্তম্ভ হ'ল 'তাওহীদ' ও 'রিসালাত'। দু'টি রেলপথের একটি না থাকলে বা দুর্বল হ'লে যেমন রেলগাড়ী চলে না। তাওহীদ ও রিসালাতের যেকোন একটির উপরে বিশ্বাস ও আমল না থাকলে মুমিনের জীবন গাড়ী তেমনি অচল হয়ে যায়। ঈমানের গণ্ডীভুক্ত হওয়ার জন্য মুখে আল্লাহ ও রাসূলের স্বীকৃতি দিলেই যথেষ্ট হয়। কিন্তু জাহান্নাম থেকে বাঁচা ও জান্নাত লাভের জন্য কেবল মৌখিক স্বীকৃতিই যথেষ্ট নয়। জাহেলী আরবের মুশরিকরা আল্লাহকে মুখে স্বীকার করত। তাঁকে সৃষ্টিকর্তা, রূযীদাতা, জীবন ও মরণদাতা হিসাবে বিশ্বাস করত। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কেও তারা 'সত্য' বলে জানতো। অনেকে তা মুখেও স্বীকার করত। তবুও তারা ইসলামে প্রবেশাধিকার পায়নি। তাদের রক্ত হারাম হয়নি। বদর, ওহোদ, খন্দক, হোনায়েন প্রভৃতি যুদ্ধ তাদের সঙ্গেই হয়েছে। তাই বিশ্বাস ও স্বীকৃতির বাস্তবতাই হ'ল মূল কথা।

আমলী যিন্দেগী যদি তাওহীদ ও রিসালাতের আলোকে গড়ে না ওঠে, তাহ'লে কেবল বিশ্বাস ও স্বীকৃতি আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবে না। 'তাওহীদ' অর্থ আল্লাহ্র একত্ব। মুমিনের সার্বিক জীবনের সকল ক্রিয়াকর্ম হবে আল্লাহমুখী। সবকিছুই হবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের একক লক্ষ্যে। কোন পথে কিভাবে কি কাজ করলে তিনি খুশী হবেন, তার বাস্তব পথনির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)। তাই রিসালাতের সিঁড়ি বেয়ে তাওহীদের

৩. ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৯৭।

লক্ষ্যপথে এগোতে হবে। একটিকে বাদ দিয়ে আরেকটি হাছিল করা যেমন সম্ভব নয়। তেমনি দু'টির প্রতি কেবল ভক্তি দেখিয়ে অন্য কোন স্থান থেকে ফায়ছালা গ্রহণ করলে সেটাকে 'ত্বাগূত' বলা হবে। মানুষের সার্বিক জীবনকে ত্বাগূত মুক্ত করার জন্য যুগে যুগে নবীগণ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তাই ত্বাগূতকে পুরোপুরি অস্বীকার করা ব্যতীত তাওহীদ হাছিল হওয়া সম্ভব নয় এবং বিদ'আতকে অস্বীকার ও তা থেকে পুরোপুরি মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত রিসালাতের পূর্ণ অনুশীলন সম্ভব নয়।

আজকের মুসলিম জীবনে তাওহীদ ও রিসালাত বাধামুক্ত নয়। তাওহীদের স্বচ্ছ নীলাকাশ যেমন শিরকের ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, রিসালাতের সবুজ ময়দান তেমনি অসংখ্য বিদ'আতের ক্রিমিকীটে পূর্ণ হয়ে গেছে। বরং বলা চলে যে, এখন শিরক ও বিদ'আতগুলিই এদেশে ইসলাম হিসাবে গণ্য হচ্ছে। দেশের ধনিক শ্রেণী ও রাষ্ট্রশক্তি আজ শিরক ও বিদ'আতের পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে। সমাজের অধিকাংশ লোক সেগুলিতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং ক্রমেই সমাজের রুচি বিকৃতি ঘটছে। মদ্যপায়ী জানে যে, মদ হারাম। তবুও সে মদের জন্য পাগল হয়ে ওঠে। শিরক ও বিদ'আতের অনুসারীরাও অনেকে জানে যে, এর পরিণাম জাহান্নাম। তবুও তারা ঐগুলির দিকে প্রতিনিয়ত ছুটে চলেছে। কে এদেরকে বাধা দেবে?

এ দায়িত্ব ছিল সরকার ও আলেম সমাজের। কিন্তু সরকারের কাছ থেকে বর্তমান যুগে এ বিষয়ে কিছু আশা করা বৃথা সময় নষ্ট করার শামিল। আলেম সমাজের অনেকে সরাসরি ও অনেকে পরোক্ষভাবে শিরক ও বিদ'আতের সাথে জড়িত। বাকী যারা আছেন, যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহভীরু, যোগ্য ও সচেতন, তাঁদের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। সমাজের কাছে তাঁরা অপরিচিত। তাঁদেরকে খুঁজে বের করে এনে সমাজ সংস্কারের দায়িত্বে নিয়োজিত করা খুবই যরূরী। এজন্য প্রয়োজনে দ্বীনদার ধনী সমাজকে এগিয়ে এসে আর্থিক দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। মুত্তাক্বী আলেমদের উপরে কোন একক ব্যক্তির সরাসরি খবরদারী করা চলবে না। এজন্য একটি দ্বীনদার জামা'আতকে বেছে নিতে হবে। যাদের মাধ্যমে পুরা সমাজকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঢেলে সাজিয়ে তাওহীদ ও রিসালাতের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। হৌক না সংখ্যায় কম, তবুও আমাদেরকে

সেই জামা'আতের সাথে থাকতে হবে। তাকে পরিচর্যা করতে হবে। তাকে এগিয়ে নিতে হবে। হাদীছের ভাষায় 'ক্বিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত এই জামা'আত বর্তমান থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না' এবং কারু নিন্দাবাদকে তারা ভয় পাবে না'। আপনি কি কখনো তাদেরকে খুঁজতে চেষ্টা করেছেন? আল্লাহ তুমি আমাদেরকে মুত্তাক্বীদের সেই জামা'আতের সাথে আমৃত্যু থাকার তাওফীক দাও এবং এদেশে তাওহীদ ও রিসালাতকে অক্ষুণ্ন রাখ- আমীন!

৩য় বর্ষে পদার্পণ

'আত-তাহরীক' অর্থ বিশেষ আন্দোলন। এ আন্দোলন তাওহীদ ও রিসালাতের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। এ আন্দোলন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সমাজ গড়ার আন্দোলন। আমাদের কাংখিত শিরক ও বিদ'আত মুক্ত এবং তাক্বওয়াশীল সমাজ গঠনের উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে দু'বছর পূর্বে মাসিক আত-তাহরীক ২ হাযার কপি দিয়ে তার যাত্রা শুরু করেছিল। এই স্বল্প সময়ে প্রচার সংখ্যা ১১ হাযারে উন্নীত হওয়াই আত-তাহরীকের জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে। বাংলাদেশে কোন ধর্মীয় মাসিক পত্রিকার এত অল্প সময়ে এত অধিক প্রচার সংখ্যার রেকর্ড সম্ভবতঃ এটাই এবং বলা যেতে পারে যে, দীর্ঘ ৩৫ বছরের পুরানো মাসিক মদীনার প্রচার সংখ্যার পরে এই নবীন পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা সম্ভবতঃ সর্বাধিক। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ*। আমাদের সূচিত আন্দোলনের প্রতি জনগণ আকৃষ্ট হচ্ছেন, তাদের অনেকেরই আক্বীদা-আমলের পরিশুদ্ধি ঘটছে এবং এর মাধ্যমে আমরাও নেকীর অধিকারী হচ্ছি, এটুকু ভেবে কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করছি। ইতিমধ্যে 'আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম' গঠিত হয়েছে। আমরা পাঠক ভাইদের এই স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং দেশের ও বিদেশের পাঠক-পাঠিকাগণ সর্বত্র অনুরূপ পাঠক ফোরাম গড়ে তুলবেন, এরূপ কামনা করি *(৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৯৯)*।[৪]

৪. বর্তমানে ২৯ হাযারের উপর (প্রকাশক)।

৫. খোশ আমদেদ মাহে রামাযান

বর্ষ পরিক্রমায় অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও আমাদের দুয়ারে নেকী ও ছওয়াবের ডালি নিয়ে মাহে রামাযানের আগমন ঘটেছে। আল্লাহভীতির বিশেষ গুণ অর্জনের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন ও সংযমশীলতার প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে যে আত্মশক্তির উন্মেষ ঘটে, সেই আত্মশুদ্ধি ও আত্মশক্তির উন্মেষ সাধনের জন্যই বছরে একবার রামাযানের আগমন ঘটে। ঈমান ও তাক্বওয়া অর্জনের মাধ্যমে মানবতার পূর্ণ বিকাশ সাধন রামাযানের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।...

মানুষের জীবনের দু'টি ভাগ আছে। একটি আধ্যাত্মিক ও অন্যটি বৈষয়িক। বৈষয়িক জীবন পরিচালিত হয় আধ্যাত্মিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধের উপরে ভিত্তি করে। যখন কোন জাতির আধ্যাত্মিক মূল্যবোধে ধস নামে, তখন সে জাতির বৈষয়িক উন্নতি হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ে। বিধ্বস্ত বিগত সভ্যতাগুলি তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। ইসলামের সকল ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য থাকে তাযকিয়ায়ে নফ্স বা আত্মশুদ্ধি অর্জন করা। ছিয়ামে রামাযান একই উদ্দেশ্যে নিবেদিত একটি ফরয ইবাদত। অতএব ছিয়াম সাধনার মূল উদ্দেশ্য যদি ব্যর্থ হয়, তাহ'লে ছিয়াম কেবল উপবাসের নাম হবে, অন্য কিছু হবে না।

এখানে আরেকটি বিষয় স্মর্তব্য যে, রামাযান মাসেই আল্লাহপাক তাঁর সেরা আসমানী গ্রন্থসমূহ নাযিল করেছেন। বিশ্ববাসীর হেদায়াতের জন্য পবিত্র কুরআনও এমাসের ক্বদর রজনীতে নাযিল হয়েছে। যার ফলে ক্বদর রজনীর ইবাদত হাযার মাসের ইবাদতের চেয়েও উত্তম। কুরআন নাযিল হওয়ার সম্মানে এবং আল্লাহ্র বিশেষ রহমতে রামাযানে সকল নেকীর কাজের ছওয়াব আল্লাহ নিজে দিবেন। আল্লাহ্র ঐ মহা নে'মত আল-কুরআন ও আল-হাদীছ মুসলমানদের কাছে আমানত রয়েছে। জীবন পরিচালনার জন্য অন্য কারু হেদায়াত প্রয়োজন নেই। নুযূলে কুরআনের মাস হিসাবে রামাযানের যে সম্মান, কুরআন তথা আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র ধারক ও বাহক হিসাবে মুসলমানেরও সেই সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে সকল উম্মতের উপর। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমরা কি কুরআন-হাদীছকে সেই মর্যাদা ও সম্মান দিতে পেরেছি?

অতএব আসুন! রামাযানকে স্বাগত জানানোর সাথে সাথে প্রতিজ্ঞা গ্রহন করি যেন একে সত্যিকারভাবে সম্মান দিতে পারি। যাবতীয় পাপ ও অন্যায় থেকে তওবা করে আত্মশুদ্ধি অর্জনে সক্ষম হই... ।[৫]

৬. প্রশিক্ষণের মাস রামাযান

ধৈর্য ও সংযমের সুমহান আদর্শ নিয়ে প্রতিবারের ন্যায় এবারও ফিরে এসেছে মাহে রামাযান। আত্মত্যাগ ও আত্মশুদ্ধির মাস, সহানুভূতি ও সহমর্মিতার মাস, রহমত ও মাগফেরাতের মাস, কাম-ক্রোধ, লোভ-মোহ বশীভূত করার মাস, জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাস, আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের মাস, সদাচার ও সদ্ব্যবহারের মাস, তাক্বওয়া ও পরহেযগারীর মাস, সর্বোচ্চ কৃচ্ছ্রতা সাধনের মাস এই মাহে রামাযান। এ মাসেই একজন মুমিন ছিয়াম সাধনার মাধ্যমে জীবনের সকল পাপ-পঙ্কিলতা ধুয়ে-মুছে নিষ্পাপ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন। সুশৃংখল জীবন যাপনের সুতীব্র প্রেরণা নিয়ে আগামী ১১ মাসের জন্য মুমিন তার জীবনের একটি পরিকল্পনা স্থির করতে পারেন। সহনশীলতা ও সহমর্মিতার প্রশিক্ষণ নিয়ে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করতে পারেন। ধৈর্য ও সংযমের মাসব্যপী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত করে হ'তে পারেন আল্লাহ্‌র প্রিয় পাত্র। শান্তি ও স্থিতিশীলতার শিক্ষা নিয়ে হ'তে পারেন শান্তিকামী জনতার অগ্রসৈনিক। কামাচার, পাপাচার, মিথ্যা ও অশ্লীলতা পরিত্যাগের মাসব্যাপী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে চরিত্রবান আদর্শ ব্যক্তিত্ব রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।

আরবী মাস সমূহের মধ্যে রামাযান হ'ল ৯ম মাস। বিভিন্ন কারণে মাসটি গুরুত্ববহ ও স্মরণীয়। এ মাসেই পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এ মাসের ছিয়াম মুমিনের জন্য ফরয। এ মাসেই লায়লাতুল ক্বদর রয়েছে। যা হাযার মাসের চেয়েও উত্তম। সব মিলিয়ে এই মহিমান্বিত মাসের গুরুত্ব অপরিসীম। অন্য সকল ইবাদতের চেয়ে ছিয়ামের মর্যাদা অনন্য। কারণ ছিয়াম সাধনায় 'রিয়া' বা লোক দেখানোর কোন অবকাশ নেই। ছিয়াম পালনকারী কেবল আল্লাহ্‌র ভয়ে ও তাঁকে সন্তুষ্ট করার নিমিত্তেই খানাপিনা ইত্যাদি হ'তে বিরত

৫. ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, জানুয়ারী ১৯৯৮।

থাকেন। সেকারণ আল্লাহ বলেন, 'বান্দা একমাত্র আমার উদ্দেশ্যেই ছিয়াম পালন করে। আর আমিই এর প্রতিদান দিব'।[৬]

সর্বাধিক প্রশিক্ষণের মাস রামাযান। এই এক মাসের প্রশিক্ষণেই বাকী **১১** মাস পথ চলার দিক নির্দেশনা পরিস্ফূট হয়ে উঠে। এ মাসেই জীবনের পাপ মোচনের মোক্ষম সময়। রাসূল (ছাঃ) একদা জুম'আর খুৎবা প্রদানের জন্য মিম্বরে উঠার সময় প্রথম সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন! দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন! তৃতীয় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন! পরে তিনি বললেন, আমি যখন মিম্বরে উঠছিলাম তখন জিব্রীল এসে আমাকে বলেন, 'ধ্বংস ঐ ব্যক্তির জন্য, যে রামাযান মাস পেল, অথচ তাকে ক্ষমা করা হ'ল না'। আমি বললাম, 'আমীন'। অতঃপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে অথবা তাদের একজনকে পেল, অতঃপর জাহান্নামে প্রবেশ করল। তার জন্য ধ্বংস'। আমি বললাম, আমীন। অতঃপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তির নিকট আপনার নাম উচ্চারণ করা হ'ল, অথচ সে আপনার উপর দরূদ পাঠ করল না, তার জন্য ধ্বংস'। আমি বললাম, আমীন'।[৭]

দুর্ভাগ্য, এই মহিমাময় মাসকে বরণ করতে বিশ্বব্যাপী সকল প্রস্তুতি যখন সম্পন্ন প্রায়, মুসলিম উম্মাহ শান্তির বার্তাবাহী এ মাসটির অপেক্ষায় যখন গভীর উৎসাহের সাথে পতীক্ষায় ছিল ঠিক তখনই মানবাধিকারের স্বঘোষিত বিশ্ব মোড়ল আমেরিকার সন্ত্রাসী প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ইরাকের উপর বিমান হামলা চালায়। অর্ধশতাধিক মুসলিম হতাহত হন। ধ্বংস হয় কোটি কোটি টাকার সম্পদ। একদিনেই সে ক্ষান্ত হয়নি। পরপর কয়েকদিন সে হামলা চালায়। ইসলাম বিদ্বেষী ইহূদী-খ্রিষ্টান চক্রের এই পরিকল্পিত হামলা বিশ্ববাসীকে হতবাক করেছে। বিস্মিত হয়েছে ও ধিক্কার দিয়েছে সকলে বোমার উপর '<u>এই নাও রামাযানের উপহার</u>' লেখা দেখে।

অথচ এরপরও মুসলিম বিশ্বের নীরবতা হতাশা বৈ কি হ'তে পারে? ওআইসি, আরবলীগ সহ ইসলামী সংস্থা সমূহ এক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয়তারই পরিচয় দিচ্ছে বলা চলে। আন্তর্জাতিক পরাশক্তিগুলো যখন বিশ্বব্যাপী মুসলিম নিধনে তৎপর,

৬. বুখারী হা/৭৪৯২; মুসলিম হা/১১৫১; মিশকাত হা/১৯৫৯ 'ছিয়াম' অধ্যায়।
৭. হাকেম হা/৭২৫৬; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪০৯, হাদীছ ছহীহ।

তখন মুসলিম বিশ্বের উচিত ছিল সম্মিলিত ভাবে দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ গড়ে তোলা। এজন্য ইসলামী সংস্থা সমূহকে আরও তৎপরতার সাথে এগিয়ে আসতে হবে। বৈষয়িক শক্তি অর্জনের চেয়ে আত্মিক শক্তি অর্জনের প্রয়োজন অনেক বেশী। কেননা ঈমান ও তাক্বওয়ার শক্তিতে বলিয়ান মুমিন সমাজকে প্রতিহত করার কোন ক্ষমতা কোন যুগেও কোন শক্তির হয়নি। আজও হবে না। কিন্তু আমরা ক্রমেই বস্তুবাদী হয়ে যাচ্ছি। ঈমানী জগত ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। মাসব্যাপী ছিয়াম সাধনা থেকে প্রকৃত ঈমান ও তাক্বওয়ার শিক্ষা গ্রহণ করে বাকী ১১ মাসের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে এবং আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক উভয় ক্ষেত্রে শক্তি অর্জনে সচেষ্ট হ'তে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দিন- আমীন![৮]

৭. আত্মশুদ্ধির মাস রামাযান

...আল্লাহ জিন ও ইনসান সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। আমরা তাঁর ইচ্ছায় দুনিয়াতে এসেছি। তাঁর হুকুমে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে আবার তাঁর নিকটে চলে যাব। যে সময়টুকু দুনিয়াতে আছি, সেটুকু কেবল তাঁর ইবাদতের জন্যই আছি। এখানকার কর্মতৎপরতার ভিত্তিতেই পরকালে আমাদের জন্য জান্নাত অথবা জাহান্নাম প্রস্তুত রাখা হয়েছে। আমরা প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল আলোর গতিতে আমাদের তৃতীয় ঠিকানা কবরের দিকে এগিয়ে চলেছি। অতএব এ পৃথিবী নশ্বর, অবিনশ্বর নয়। এটি আমাদের জন্য মুসাফিরখানা, স্থায়ী ঠিকানা নয়। দ্রুত হারিয়ে যাওয়া প্রতিটি সেকেণ্ড ও মিনিটে আমরা আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্য আখেরাতে মুক্তির জন্য বেশী বেশী পাথেয় যাতে সঞ্চয় করি, রামাযান আমাদেরকে বাধ্যগতভাবে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর রেখে সেদিকেই পথনির্দেশ করে।

হে মুসলিম! তোমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হ'ল তোমার জীবনটুকু। একে ব্যর্থ করে দিয়ো না। অলসতা ও বিলাসিতায় তোমার আয়ুষ্কাল শেষ করে দিয়ো না। বার্ধক্য আসার পূর্বে তোমার যৌবনকে, অসুখের পূর্বে তোমার সুস্থতাকে, ব্যস্ততার পূর্বে তোমার অবসরকে, মৃত্যু আসার পূর্বে তোমার জীবনকে যথার্থভাবে কাজে লাগাও। মনে রেখ, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সেই, যে দীর্ঘ জীবন পেয়েছে ও তাকে

৮. ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জানুয়ারী'৯৯।

নেকীর কাজে ব্যয় করেছে। রামাযান সেই পবিত্র জীবন গড়ায় আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে।

হে মুসলিম ভাই ও বোন! আসুন আমরা আল্লাহ্র অনুগত হই। যতটুকু করি, কেবল তাঁর জন্যই ইখলাছের সাথে করি। কোনরূপ 'রিয়া' ও প্রদর্শনী যেন আমাদের ইখলাছের স্বচ্ছ আকাশকে কালিমালিপ্ত না করে। কেননা আল্লাহ কেবল আমাদের ইখলাছটুকুই কবুল করবেন। আমরা যদি তাঁর নে'মতের শুকরিয়া আদায় করি, তাহ'লে তিনি আমাদের বেশী বেশী দিবেন। কেননা আসমানেই সবকিছুর ফায়ছালা হয়ে থাকে, যমীনে নয়। অতএব, আসুন! আমরা আমাদের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ্র আনুগত্যে ব্যয় করি। আমাদের জিহ্বাকে তাঁর যিকরে সিক্ত রাখি। প্রতি ওয়াক্ত ছালাত শেষে যদি এক পারা করে তেলাওয়াত করি, তাহ'লে সপ্তাহে আমরা একবার কুরআন খতম করতে পারি। রামাযানে যার প্রতি হরফে ১০ থেকে ৭০০ গুণ ও তার চেয়ে বেশী নেকী লেখা হয়ে থাকে। আসুন! আমরা সাধ্যমত ইবাদত ও তেলাওয়াতে রত হই। মানুষকে দ্বীনে হক-এর দাওয়াত দেই। কেননা আপনার দাওয়াতে কেউ ফিরে এলে তার সমপরিমাণ নেকী আপনার আমলনামায় লেখা হবে। মনে রাখবেন, রামাযানে নেকীর কাজের ছওয়াব যেমন অন্য সকল মাসের চেয়ে বেশী, এ মাসে অন্যায় কাজের শাস্তি তেমনি অন্য মাসের চেয়ে বেশী।

হে বনু আদম! তুমি সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহশীল হও, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহশীল হবেন। হে দায়িত্বশীল! তুমি দায়িত্ব সচেতন হও। তোমার দায়িত্ব যার উপরে তিনি তোমার ব্যাপারে সচেতন হবেন। প্রত্যেকে আমরা ক্বিয়মাতের দিন স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হব। চক্ষু, কর্ণ, হৃদয় তথা প্রতিটি নে'মতকে আমরা কিভাবে ব্যয় করেছি, সে বিষয়ে আমাদের যথাযথ কৈফিয়ত সেদিন দিতে হবে।

হে ব্যবসায়ী! অন্য মাসের চেয়ে রামাযানে তুমি কম লাভ কর। যতটুকু ছাড়বে, তার চেয়ে বহু গুণ তুমি আখেরাতে পাবে। এমনকি আল্লাহ্র ইচ্ছা হ'লে দুনিয়াতেও পেতে পার। সূদ-ঘুষ-মওজুদদারী ও সকল প্রকার দুর্নীতি হ'তে বিরত হও! জাহেলী আরবের কাফেররাও বছরের চারটি সম্মানিত মাসে অন্যায়-অপকর্ম ও মারামারি-কাটাকাটি হ'তে বিরত থাকত। আমরা কি

সেটাও পারব না? অতএব এসো যাবতীয় হিংসা-হানাহানি, গীবত-তোহমত ও অমানবিক কর্মকাণ্ড হ'তে আমরা তওবা করি। প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী। আর শ্রেষ্ঠ ভুলকারী তারাই, যারা তওবাকারী। এসো আল্লাহ্র নিকটে চূড়ান্ত হিসাব দেওয়ার আগে নিজেই নিজের হিসাব নিই। আমার জানাযার ছালাত অন্যে আদায়ের আগে নিজের ছালাত নিজে আদায় করি। আমার দেহ গোসল করিয়ে শুভ্র কাফনে ঢাকার আগে নিজের দেহকে হালাল খাদ্য ও পোষাক দিয়ে আবৃত করি।

হ'তে পারে এটিই আমার জীবনের শেষ রামাযান। অতএব এসো এ রামাযানেই আমরা সর্বোচ্চ তাক্বওয়া ও আল্লাহভীতি অর্জন করি। ক্বিয়ামতের ভয়ংকর মুহূর্তকে স্মরণ করি। নিজ পিতা-মাতার মৃত্যুকরুণ বিদায়ী চেহারা মনে করে তাঁদের জন্য প্রাণখোলা দো'আ করি ও সাধ্যমত দান করি। আমরা এসেছি এক, যাব একা, ক্বিয়ামতে উঠব একা, কৈফিয়ত দেব একা। অতএব সাথীদের মাঝে আত্মহারা হয়ো না হে আত্মভোলা মানুষ। রামাযান তোমায় ডাকছে তাক্বওয়ার দিকে। এসো আমরা আল্লাহভীরু হই। অতএব হে মাহে রামাযান! তোমাকে জানাই খোশ আমদেদ।

...নতুন বছরের শুরু অক্টোবর'০৪ হ'তে আত-তাহরীকের নিজস্ব 'ওয়েবসাইট' চালু হ'ল- *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ*। এখন পৃথিবীর যেকোন স্থান থেকে ইন্টারনেটে www.at-tahreek.com ক্লিক করলেই ঘরে বসে আত-তাহরীক পড়তে পারবেন । আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন![৯]

৮. মাহে রামাযান

হিজরী বর্ষের ৯ম মাস রামাযান আমাদের দুয়ারে সমাগত। বছরে একবার রামাযান তার মাসব্যাপী অফুরন্ত রহমতের পশরা নিয়ে আমাদের নিকটে হাযির হয়। যারা একে চিনেন ও বুঝেন, তারা একে সম্মান করেন, মর্যাদা দেন, নিজের গোনাহ মাফের জন্য তওবা করেন, আল্লাহ্র নিকট থেকে বিশেষ পুরস্কার নেবার আশায় সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। আর যারা একে চিনেন না, চিনতে চান না, বুঝতে চান না, তাদের উদ্দেশ্যেই আমাদের আজকের নিবেদন।

---

৯. ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অক্টোবর ২০০৪।

ছিয়ামের উদ্দেশ্য : ছিয়ামের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল মানুষের মধ্যে আল্লাহভীরুতা সৃষ্টি করা। এর সরলার্থ এটাই যে, আল্লাহভীরুতার মধ্যেই মানবতার কল্যাণ ও মুক্তি নিহিত। এর বিপরীতটার মধ্যে তার অকল্যাণ ও ধ্বংস অনিবার্য। আল্লাহভীরুতার মাধ্যমেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ সম্ভব এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ব্যতীত জান্নাত লাভ অসম্ভব। উপরোক্ত বিষয়ে দৃঢ় ঈমান ও আল্লাহ্‌র নিকট থেকে পারিতোষিক লাভের দৃঢ় প্রত্যাশা নিয়ে যদি কেউ ছিয়াম পালন করেন, প্রতি রাত্রিতে ও বিশেষ করে ক্বদরের রাত্রিগুলিতে নফল ইবাদত ও ছালাত আদায় করেন, তার বিগত জীবনের সকল গোনাহ মাফ করা হবে' বলে ওয়াদা করা হয়েছে।[১০] মূলতঃ জান্নাত লাভের স্থির লক্ষ্য নিয়ে যিনি ছিয়াম পালন করেন, জান্নাত লাভে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী সকল বিষয় তিনি পরিহার করেন বা করতে সাধ্যমত চেষ্টা করেন। একদিনেই সেটা অর্জিত হওয়া সম্ভব নয়, তাই পূর্ণ একমাস তাকে সময় দেওয়া হয়। যাতে আল্লাহভীরুতা তার অভ্যাসে পরিণত হয় এবং তার চরিত্রে স্থিতিশীলতা আসে।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য : জীবন যুদ্ধে ক্ষুৎপিপাসার কষ্টকে জয় করা এবং ক্ষুধার্ত মানবতার প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া। 'ক্ষুধার রাজ্যে জীবন গদ্যময়' কথাটি কিছুটা বাস্তব হ'লেও প্রকৃত মানবতা কখনোই ক্ষুধার কাছে হার মানেনা। ক্ষুধার জ্বালায় সে তার বিবেককে, তার মানবতাকে বিসর্জন দিতে পারে না। একজন মুমিন পুরা একমাস দৈনিক ১২/১৩ ঘণ্টা ক্ষুৎ-পিপাসার তীব্র দহনজ্বালা হাসিমুখে সহ্য করে এবং যাবতীয় হারাম ও মিথ্যার কালিমা হ'তে মুক্ত থেকে নিজেকে দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে যে, ষড়রিপুর তীব্র আবেগের কাছে সে পরাজিত হয়নি। বস্তুবাদীদের লোভনীয় চক্রজাল তাকে মানবতার উচ্চতম শিখর হ'তে সামান্যতম নীচে নামাতে পারেনি। এভাবে সবকিছুকে জয় করেই সে এগিয়ে চলে সম্মুখ পানে জান্নাত লাভের তীব্র আকাংখা নিয়ে। ধনী-গরীবের পার্থক্য তার কাছে কোন পার্থক্যই নয়; বরং মনুষ্যত্বের তারতম্যই তার কাছে বড়। ছবর, ছালাত ও সহমর্মিতার সাথে মাসব্যাপী ছিয়াম সাধনা তাই আল্লাহ্‌র নৈকট্যশীলতার অবিরত প্রশিক্ষণের মাস হিসাবে গণ্য হয়।

---

১০. বুখারী হা/২০১৪; মুসলিম হা/৭৬০; মিশকাত হা/১৯৫৮।

তৃতীয় উদ্দেশ্য : বান্দার স্বাস্থ্যগত উন্নতি। অধিক ভোজনের ফলে শরীরে যে বাড়তি মেদ বা কোলেস্টেরল (Cholesterol) জমা হয়, তা শিরা-উপশিরায় ও হৃৎপিণ্ডে রক্ত প্রবাহে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এমনকি রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে হঠাৎ মানুষের মৃত্যু ঘটে। নদী-নালায় পলি জমলে যেমন পানির স্রোত বাধাগ্রস্ত হয় ও এক সময় নদী মরে যায়। অনুরূপভাবে দেহের শিরা-উপশিরা ও ধমনীগুলিতে মেদ জমলে রক্ত স্রোত বাধাগ্রস্ত হয় ও রক্তচাপ (Blood pressure) সৃষ্টি করে এবং যেকোন সময় রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয়ে মানুষ মারা যায়। রামাযানের মাসব্যাপী ছিয়ামের ফলে শরীরে বাড়তি মেদ জমতে পারে না। বরং জমা মেদ গলে যায় ও বহুলাংশে হ্রাস পায়। ড্রেজিং করার ফলে নদীর স্রোত যেমন বৃদ্ধি পায়। ছিয়ামের ফলে তেমনি শিরায় ও হৃৎপিণ্ডে রক্ত প্রবাহে অধিক গতি সঞ্চারিত হয়। এতদ্ব্যতীত যাদের পেটের দোষ, অজীর্ণ, গ্যাস্ট্রিক আলসার ইত্যাদি রয়েছে, ছিয়াম তাদের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। ছিয়ামের ফলে সারা দিন পাকস্থলী বিশ্রাম পায়। তাতে গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা কমে যায় ও রোগীর উপকার হয়। 'ধূমপান বিষপান' কথাটি সর্বাংশে সত্য। বরং সিগারেটের ধোঁয়া একজন অধূমপায়ী ব্যক্তির স্বাস্থ্যের বেশী ক্ষতি করে। যদিও অন্যের ক্ষতি করার কোন অধিকার কারো নেই, তথাপি ধূমপায়ী লোকেরা বাসে-ট্রেনে, লঞ্চে-স্টীমারে, অফিসে-ক্লাবে একাজটিই করে থাকেন সর্বদা মহা স্বস্তিতে বঙ্কিম ভঙ্গিতে ধোঁয়া উড়িয়ে। ভদ্রলোক নিজে বিষপান করেন ও অন্যের দেহে বিষপ্রয়োগ করেন। **এতে নিঃসন্দেহে তিনি হত্যাযোগ্য অপরাধী হন।** কিন্তু চেতনার ঐ উচ্চমার্গে এখনো আমরা পৌঁছতে পারিনি। তাই পোষাকী ভদ্রতার আড়ালে সবকিছু ঢেকে যায়। রামাযানুল মুবারকে বাধ্যতামূলকভাবে সারাদিন ধূমপান না করায় ফুসফুস দীর্ঘ সময় ধরে নিকোটিনের বিষক্রিয়া হ'তে মুক্ত থাকে। যা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী হয়। তাছাড়া যারা ধূমপান ত্যাগ করতে চান, তাদের জন্য রামাযান একটি মোক্ষম সুযোগ এনে দেয়। ছিয়াম অবস্থায় কিছু লোক ঘন ঘন থুথু ফেলে। তাদের ধারণা থুথু গিললে ছিয়াম ভঙ্গ হয়। এটা নিতান্তই ভুল ধারণা। ঘন ঘন থুথু ফেলা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। থুথুর সাথে দেহের অনেক মূল্যবান পদার্থ যেমন 'টায়ালিন' (Ptyalin) বেরিয়ে যাওয়ায় শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই এ বদভ্যাস অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

রামাযানের একমাস ছিয়াম শেষে পুনরায় পূর্ণোদ্যমে চালু হওয়া পাকস্থলী হঠাৎ দুর্বল হয়ে পড়া স্বাভাবিক। তাই পরবর্তী মাসে তাকে আবার ছয়টি সুন্নাত ছিয়াম পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে প্রতি চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে অর্থাৎ পূর্ণিমার আগে-পিছে আইয়ামে বীয-এর তিনটি নিয়মিত নফল ছিয়াম এবং প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবারের নিয়মিত নফল ছিয়াম পালনের নির্দেশ। এভাবে সারা বছর মানুষের সুষম স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার শারঈ ব্যবস্থা প্রদান করা হয়েছে।

রামাযানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল এই যে, এমাসেই বিশ্ব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নে'মত হিসাবে পবিত্র কুরআন নাযিলের সূচনা হয়। যা দীর্ঘ ২৩ বছরে সমাপ্ত হয়। কুরআনের বৈশিষ্ট্য হিসাবে বলা হয়েছে 'হুদা' ও 'ফুরক্বান' অর্থাৎ সত্যের পথনির্দেশ এবং সত্য-মিথ্যা ও হালাল-হারামের পার্থক্যকারী *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। নুযূলে কুরআনের মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষের জন্য সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে সর্বশেষ পথনির্দেশ প্রেরিত হয়েছে এবং বিগত সকল এলাহী গ্রন্থের হুকুম রহিত হয়ে গেছে। অতএব যারা পৃথিবীতে সত্যিকারের শান্তি ও কল্যাণ পিয়াসী, তাদের জন্য ফুরক্বানের অনুসরণ ও তার বাহক শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের পূর্ণ অনুগমন ব্যতীত অন্য কোন পথ খোলা নেই। কুরআন নাযিলের মাস হিসাবে রামাযান যেভাবে আল্লাহ্‌র নিকটে সম্মানিত, তেমনিভাবে কুরআনের যথার্থ অনুসারীরাও আল্লাহ্‌র নিকটে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতি *(আলে ইমরান ৩/১১০)*। অতএব আসুন! আমরা আমাদের সেই শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখার চেষ্টা করি এবং ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করে রামাযানে তাক্বওয়ার সাধনা ও আল্লাহভীরুতার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন![১১]

৯. হে কল্যাণের অভিসারীগণ! এগিয়ে চল

রহমত ও বরকতের পশরা নিয়ে, মাগফেরাত ও নাজাতের সুসংবাদ নিয়ে বছর ঘুরে রামাযান আমাদের দুয়ারে সমাগত। মুক্তি ও কল্যাণের অভিসারীগণ এ মাসকে তাদের পরকালীন মুক্তির অসীলা হিসাবে স্বাগত জানায়। তাই রামাযানের এক মাস পূর্বে শা'বান মাস থেকেই তাদের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। শা'বানের প্রথমার্ধেই তারা নফল ছিয়ামের অভ্যাস শুরু করে দেয়। অতঃপর

১১. ৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০০।

রামাযানের আগমনে বিপুল উৎসাহে ও গভীর ভালবাসা নিয়ে ফরয ছিয়াম শুরু করে। সারাদিন সে কেবল খানাপিনা ও যৌন সম্ভোগ থেকেই বিরত থাকে না, বরং ছিয়ামকে ত্রুটিপূর্ণ করতে পারে এমন ছোট-বড় সকল কাজ থেকে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিরত রাখে। নিজের অন্তরকে যাবতীয় অসৎ চিন্তা থেকে দূরে রাখে। কারণ যে হাত-পা ও চক্ষু-কর্ণ এখন তার অনুগত রয়েছে, ক্বিয়ামতের দিন তা স্বাধীন হয়ে যাবে। যদি এদেরকে আমি আল্লাহ্‌র আনুগত্যে ব্যবহার না করে শয়তানের আনুগত্যে ব্যবহার করি, তাহ'লে ক্বিয়ামতের দিন এরাই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে' *(ইয়াসীন ৩৬/৬৭)*। অন্যদের চোখে ধূলা দেওয়া যাবে, কিন্তু এই সাক্ষীরা অবিচ্ছেদ্য। শয়নে-স্বপনে, চলনে-বলনে দিবা-রাত্রি এরা আমার একান্ত সাথী। এদের মাধ্যমেই আমি সবকিছু করি। এদেরকে লুকিয়ে কিছুই করার ক্ষমতা আমার নেই। তাই গোয়েন্দা পুলিশের চাইতে আমি এদেরকে বেশী ভয় করি। দুনিয়াবী আদালতের বিচারকদের চাইতে আমি মহা বিচারক আল্লাহ্‌র আদালতকে বেশী ভয় পাই। সেদিন যদি আমার দেহ-ত্বক ও জিহ্বা, আমার হাত-পা, চক্ষু-কর্ণ, আমার যৌনাঙ্গ, আমার হৃদয়, আমার সমস্ত দেহযন্ত্র একযোগে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়, সেদিন আর কে আছে, যে আমার পক্ষে ছাফাই সাক্ষী হবে।

হে যুবক! বার্ধক্য আসার আগে তোমার যৌবনকে, রোগ আসার আগে তোমার সুস্থতাকে, দরিদ্রতা আসার আগে তোমার সচ্ছলতাকে, ব্যস্ততা আসার আগে তোমার অবসরকে, মৃত্যু আসার আগে তোমার জীবনকে তোমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির কাজে নিয়োজিত কর।[১২] তোমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাক্বওয়াশীল বান্দা ব্যতীত কারু আমল কবুল করেন না *(মায়েদাহ ৫/২৭)*। রামাযান তোমাকে সেই সুযোগ এনে দিয়েছে। অতএব এসো! আমরা জান্নাতের পথে চলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এসো! আমাদের জিহ্বাকে সর্বদা আল্লাহ্‌র যিকরে ব্যস্ত রাখি। দেহ-মন ঢেলে দিয়ে তাঁর ইবাদতে রত হই। রামাযানের রাত্রিগুলিকে আমরা ইবাদতের মাধ্যমে জীবন্ত রাখি। হে মুমিন পুরুষ ও নারী! একবার পিছন ফিরে দেখ, জীবনের ক'টি বসন্ত তুমি পার করে এসেছ? তোমার কাছে প্রেরিত আল্লাহ্‌র বাণী আল-কুরআনুল হাকীম তোমার ঘরের তাকে রক্ষিত আছে। ঐ মূল্যবান সম্পদ কি তুমি কখনো পড়ে দেখেছ?

---

১২. হাকেম হা/৭৮৪৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩৩৫৫; মিশকাত হা/৫১৭৪ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়।

কখনো কি তা শেষ পর্যন্ত অর্থসহ পাঠ করেছ? হয়তবা করোনি। অতএব আর দেরী নয়। সিদ্ধান্ত নাও রামাযানেই তুমি কুরআন খতম করবে এবং সারা বছর সাধ্যমত দৈনিক কিছু অংশ অর্থসহ তেলাওয়াত করবে। আখেরাতের অমূল্য পাথেয় ছহীহ হাদীছের সংকলনগুলি খরীদ কর ও তা থেকে মুক্তা আহরণ করে পরকালের পাথেয় হাছিল কর। মনে রেখ, কুরআন তার পাঠক ও আমলকারীর জন্য ক্বিয়ামতের দিন সুফারিশকারী হবে।[১৩]

হে মুমিন! সর্বদা হালাল রূযী গ্রহণের সিদ্ধান্ত নাও। আর তোমার আয়ের একটি অংশ আল্লাহ্র বিশুদ্ধ দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে ব্যয় কর। নইলে সম্পদের মূল মালিক আল্লাহ্র কাছে তুমি কিভাবে জবাবদিহি করবে? তোমার সম্পদের একটি অংশ দুস্থ মানবতার সেবায় ব্যয় কর। আল্লাহ তার অনুগ্রহের হাত তোমার দিকে বাড়িয়ে দিবেন। হে শক্তিমান! তুমি শক্তিহীনের উপরে যুলুম করো না। যুলুম ক্বিয়ামতের দিন তোমার জন্য অন্ধকার হয়ে দেখা দিবে।[১৪]

হে ব্যবসায়ী! রামাযানকে তুমি তোমার ব্যবসায়ের হাতিয়ারে পরিণত করো না। বরং রামাযানের বরকত হাছিলের স্বার্থে অন্য সময়ের চাইতে কিছু কম লাভ কর। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্রেতার উপরে যুলুম করে যে কয়টা পয়সা তুমি বেশী উপার্জন করবে, ঐ হারাম পয়সা ক্বিয়ামতের দিন বিষধর সর্পের আকারে তোমার গলায় বেড়ী দিয়ে দু'চোয়াল চেপে ধরে বলবে, আমিই তোমার মাল, আমিই তোমার সম্পদ'।[১৫]

হে সুউচ্চ প্রাসাদের অধিবাসী! অহংকার করো না। অতি সত্বর তোমাকে ভূগর্ভের অন্ধকার কবরে স্থান নিতে হবে। হে বিচারক! অবিচার করো না। তোমাকে বিচার করবেন যিনি, তিনি তোমার মাথার উপরে আছেন।

হে আলেম! তাক্বওয়া অর্জন করুন। তাক্বওয়াহীন আলেম মূর্খের চেয়েও ক্ষতিকর। হে নেতা! লাখো কোটি মানুষের ভাল-মন্দের দায়িত্ব আপনার উপরে। যদি আপনি দায়িত্ব পালনে খেয়ানত করেন, তাহ'লে আপনার জন্য জান্নাতকে হারাম করা হয়েছে *(মুসলিম হা/১৪২)*।

---

১৩. মুসলিম হা/৮০৪; মিশকাত হা/২১২০ 'ফাযায়েলুল কুরআন' অধ্যায়।
১৪. মুসলিম হা/২৫৭৮; মিশকাত হা/১৮৬৫ 'যাকাত' অধ্যায়।
১৫. বুখারী হা/১৪০৩; মিশকাত হা/১৭৭৪ 'যাকাত' অধ্যায়।

হে মসজিদের খাদেম ও ইমাম! সাহারী ও ইফতারের পূর্বে ও পরে মাইকবাজি করে গোনাহ কামাই করো না। তোমার ঐ সুরেলা কণ্ঠের তেলাওয়াত ও ইসলামী সঙ্গীত তোমার জন্য নেকীর বদলে গোনাহ বয়ে আনে। এর মাধ্যমে তুমি ইবাদতকারীর ইবাদত নষ্ট করছ, রোগীর, তেলাওয়াতকারীর ও নিদ্রিত ব্যক্তির প্রশান্তিতে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছ এবং তুমি 'রিয়া'র অপরাধে অপরাধী হচ্ছ। 'রিয়া' হল ছোট শিরক।[১৬] আর শিরকের গোনাহ তওবা ছাড়া মাফ হয় না। অতএব রিয়া ও শ্রুতি ছেড়ে আল্লাহভীরু হও।

হে প্রিয় বোনেরা! আল্লাহ তোমাদেরকে 'শ্রেষ্ঠ সম্পদ' রূপে *(মুসলিম হা/১৪৬৭)* পরীক্ষা হিসাবে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। তাই সর্বদা নিজেকে সংযত রাখো। পর্দাহীন অবস্থায় কখনোই বের হবে না। গৃহকোণ তোমার জন্য সর্বাধিক নিরাপদ। শুধু রান্না-বান্না ঘরকন্না নিয়েই ব্যস্ত থেকো না। ইবাদত ও তেলাওয়াতের জন্য একটা সময় বের করে নাও। তোমার অতলান্তিক প্রেম ও স্নেহ দিয়ে তোমার স্বামী ও সন্তানদেরকে আল্লাহ্র পথে ধরে রাখো। তোমার গৃহকে জান্নাতী গৃহে পরিণত করো। আধুনিক শয়তানী মিডিয়া সমূহের হিংস্র ছোবল থেকে তোমার পবিত্র গৃহকে হেফাযত কর। ধর্মের নামে চালু হওয়া অসংখ্য শিরক ও বিদ'আতী রসম-রেওয়াজ থেকে তোমার গৃহকে মুক্ত রাখো। মনে রেখ এগুলি তোমার জান্নাতের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। হে বোন! নিত্য নতুন পোষাক কেনার আগে নিজের কাফনের কথা চিন্তা কর। আখেরাতে হিসাব দেওয়ার আগে দুনিয়ায় নিজের হিসাব নাও।

হে মুমিন পুরুষ ও নারী! ঐ শোন রামাযানের প্রতি রাত্রির আহ্বান... 'হে কল্যাণের অভিযাত্রীরা এগিয়ে এসো! হে অকল্যাণের অভিসারীরা বিরত হও! আল্লাহ্র হুকুমে রামাযানের প্রতি রাত্রিতে বহু ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রাপ্ত হয়ে থাকে'।[১৭] অতএব এসো যাবতীয় অন্যায় থেকে তওবা করি। এসো আমরা সেই মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন।[১৮]

---

১৬. আহমাদ হা/২৩৬৮০; মিশকাত হা/৫৩৩৪ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়।
১৭. তিরমিযী হা/৬৮২; ইবনু মাজাহ হা/১৬৪২; মিশকাত হা/১৯৬০ 'ছিয়াম' অধ্যায়।
১৮. ৭ম বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর ২০০৩।

১০. ঈদুল আযহা সমাগত

কুরবানীর সুমহান আদর্শ নিয়ে ঈদুল আযহা সমাগত। উৎসর্গ ও সহিষ্ণুতার আহ্বানের মধ্যে দিয়ে পালিত হবে এই মহান ব্রত। দেওয়ার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করবে বিশ্ব মুসলিমকে। ত্যাগ এবং ভোগ উভয়ই জড়িয়ে আছে ঈদুল আযহার সাথে। ভোগের আনন্দ ক্ষণিক। কিন্তু ত্যাগের আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী ও মহিমান্বিত। ভোগের আনন্দ দুনিয়াতেই সীমিত। কিন্তু ত্যাগের আনন্দ দুনিয়া ও আখেরাতে পরিব্যপ্ত। ইসলাম ত্যাগ ও ভোগের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছে ও আল্লাহ্র জন্য ত্যাগকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। ত্যাগ মানুষকে বিনয়ী, সহনশীল, সংযমী ও সর্বোপরি মানবতাবাদী হ'তে শিক্ষা দেয়। ঈদুল আযহা সেই মহান ত্যাগেরই এক অনন্য উৎসব।

ঈদুল আযহার মূল শিক্ষা হ'ল মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠভাবে আনুগত্য প্রকাশ করা। বিত্তের মোহ, ভোগ-বিলাসের আকর্ষণ, সন্তানের স্নেহ, স্ত্রীর মহব্বত সবকিছুর উর্ধ্বে আল্লাহ্র প্রতি নিজেকে সমর্পণ করে দেওয়া।

বান্দা যখন সম্পূর্ণরূপে স্বীয় প্রভু আল্লাহ্র নিকটে নিজকে সমর্পণ করে দেয়, তখন আল্লাহ তার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবার ছিলেন এমনই এক আত্মনিবেদন ও আত্মসমর্পণের অনন্য প্রতীক।

আল্লাহ্র প্রতি ইবরাহীমের নিখাদ আনুগত্য আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে। পিতার ছুরির নীচে কুরবানী হওয়ার জন্য পুত্র ইসমাঈলের আত্মসমর্পণ ও নির্ভেজাল আনুগত্য আমাদের ব্যাকুল করে। শিহরিত করে প্রত্যেক মুমিন বান্দাকে। একমাত্র সন্তান ইসমাঈল ও স্ত্রী হাজেরাকে মক্কার নির্জন উপত্যকায় আল্লাহ্র নিকটে সোপর্দ করে যখন বুকে পাষাণ বেঁধে ইবরাহীম ফিরে যাচ্ছেন, আর ব্যাকুলিত হাজেরা পিছু পিছু এগুচ্ছেন আর বলছেন, ওহে স্বামী! আপনি এ বিরান ভূমিতে আমাদের একাকী ফেলে যাচ্ছেন কেন? নির্বাক ইবরাহীমের অসহায় দৃষ্টি! জবাব না পেয়ে হাজেরা ঈমানী শক্তিতে বলে ওঠেন, তাহ'লে কি আল্লাহ আপনাকে এ নির্দেশ দিয়েছেন? ইবরাহীম মাথা নাড়লেন, হ্যাঁ। তখন ঈমানী বলে বলিয়ান হয়ে হাজেরা বলে উঠেন 'তাহ'লে আল্লাহ আমাদের ধ্বংস করবেন না' *(বুখারী হা/৩৩৬৪)*।

অতঃপর আল্লাহকে খুশী করার জন্য তাঁর হুকুম মোতাবেক সেই সন্তানকে নিজ হাতে যবেহ করার কঠিনতম পরীক্ষায় উত্তরণ ছিল আল্লাহ্র প্রতি অটুট আনুগত্য ও গভীর আল্লাহ প্রেমের এক তুলনাহীন দৃষ্টান্ত। পুত্রকে কুরবানী করে আল্লাহ্র আদেশই মান্য করেন ইবরাহীম। কিন্তু আল্লাহ কুরবানী চাননি, চেয়েছিলেন তার আনুগত্যের পরীক্ষা নিতে। আর সে কারণেই বেঁচে গেলেন ইসমাঈল। কুরবানী হ'ল দুম্বা। চালু হ'ল ঈদুল আযহা। আল্লাহ্র ভালোবাসার চেয়ে পুত্রের ভালোবাসা যে গৌণ, সেটাই প্রমাণ করেন ইবরাহীম। এর চাইতে আল্লাহ প্রেমের বড় উদাহরণ পৃথিবীতে আর আছে কি?

তৎকালীন পুঁতিগন্ধময় সমাজ ছিল শয়তানের আনুগত্যে পূর্ণ। শিরক আর অনৈতিকতায় সমাজ ভেসে চলছিল। এমনি সময় আল্লাহ্র প্রতি ইবরাহীমের অনন্য আনুগত্য ছিল এক বৈপ্লবিক ঈমানী জাগরণ। সে জাগরণ রাজনৈতিক নয়, অর্থনৈতিক নয়; বরং নৈতিক এবং আল্লাহ্র পথে নিবেদিত।

বর্তমানে আমরা এমন এক দৃশ্যপটে দাঁড়িয়ে আছি, যা নমরূদী সমাজ ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি। দুর্নীতির পঙ্কে নিমজ্জিত আজ সমাজের প্রতিটি স্তর। ভোগ-বিলাসে মত্ত সবাই। মূল্যবোধ আজ তিরোহিত। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে হানাহানি। দলে দলে সহিংসতা। নৈতিকতাহীন দলীয় রাজনীতির গরল স্রোতে ভেসে চলেছে সবাই। সুতরাং এ অধঃপতিত সমাজকে টেনে তোলার জন্য চাই আজ ইবরাহীমী তাক্বওয়াশীল নেতৃত্ব ও ইসমাঈলী আনুগত্যশীল একদল অকুতোভয় ঈমানদার যুবগোষ্ঠী। ইবরাহীমী ঈমান ও ইসমাঈলী ত্যাগের মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে আমাদের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে। কুরবানীর পশুর গলায় ছুরি চালানোর আগে নিজের মধ্যে লুক্কায়িত পশুত্বের গলায় ছুরি চালাতে হবে। মানবিকতার উত্থান ঘটাতে হবে। আত্মত্যাগের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঈদুল আযহার এ শুভক্ষণে সত্যিকারের ঈমানদার ও আল্লাহভীরু এবং আপোষহীন সত্যসেবী হওয়ার জন্য আসুন আমরা আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করি। আমরা যেন আমাদের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইবরাহীমী ত্যাগের প্রতিফলন ঘটাতে পারি, আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন- আমীন![১৯]

১৯. ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৯।

১১. দিবস পালন নয়, চাই আদর্শের অনুসরণ

‘ঈদে মীলাদুন্নবী’ নামক প্রচলিত নবী দিবস সমাগত। এই দিবসকে বরণ করে নেবার জন্য সারা দেশে চলছে ব্যাপক প্রস্তুতি। অতি গরীব মানুষটিও এদিনটি উদযাপনের জন্য আগে থেকেই প্রস্তুতি নিচ্ছে। অধিকাংশ জনগণের অনুভূতির দিকে খেয়াল করে ইসলামী বা ধর্মনিরপেক্ষ সকল দলের রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা এদিন ও মাসকে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে উদযাপন করেন। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও কোন কোন মাদরাসা ‘জশনে জুলূসে ঈদে মীলাদুন্নবী’ বের করে শহর-বন্দরের রাস্তাসমূহ প্রদক্ষিণ করে। ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলি জনপ্রিয়তা অর্জনের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় মিছিল নিয়ে গগনবিদারী শ্লোগানে রাস্তা মুখরিত করে তোলে। সরকারীভাবে অধিক আড়ম্বরের সাথে এ দিবস পালিত হয়। বিলাসী সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের আয়াসী আয়োজন করা হয়। বড় বড় বুলি আওড়ানো ছাড়া যার ফলাফল হয় শূন্য। শহরের বিলাসবহুল হোটেলগুলো দেশী-বিদেশী আমন্ত্রিত মেহমানদের আপ্যায়নে সরগরম হয়ে উঠে। কোটি কোটি টাকা এ দিবসকে সামনে রেখে খরচ করা হয়। কিন্তু একবারও কি আমরা ভেবে দেখেছি, যে নবীর মহব্বতে এসব করছি, তিনি এতে খুশী না হয়ে বরং নাখোশ হবেন। ক্বিয়ামতের দিন হাউয কাওছারের পানি পান করার জন্য যখন আমরা সকলে তাঁর নিকটে ভিড় জমাবো, তখন ফেরেশতারা আমাদের সরিয়ে দিবেন ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের মত বিদ‘আতীদেরকে ‘সুহক্বান’ ‘সুহক্বান’ ‘দূর হও’ ‘দূর হও’ বলে তাড়িয়ে দিবেন’।[২০]

আমরা কি তাহ’লে ছাহাবীদের চাইতে বেশী রাসূলপ্রেমী হয়ে গেলাম? রাসূলের ২৩ বছরের নবুঅতী জীবন ও তাঁর পরে আবুবকর, ওমর, ওছমান ও আলী (রাঃ)-এর দীর্ঘ ৩০ বছরের খেলাফতকাল এমনকি তার পরেও ৬০৫ বা ৬২৫ হিজরী পর্যন্ত কোন মুসলমান তো মীলাদ অনুষ্ঠানের নামও জানতেন না। রাসূলের প্রেমে গদগদ হয়ে কই তারা তো কোন রাষ্ট্রীয় বা সাধারণ অনুষ্ঠানও করেননি। রাস্তায় মিছিল করেননি। মিষ্টি বিলাননি। মীলাদুন্নবী, ইয়াওমুন্নবী, দাওয়াতুন্নবী বা সীরাতুন্নবী পালন করেননি। যেখানে জুম‘আর দিনকে ছিয়াম

২০. বুখারী হা/৬৫৮৪; মুসলিম হা/২২৯০; মিশকাত হা/৫৫৭১।

ও রাতকে ইবাদতের জন্য খাছ করে নিতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করলেন।[২১] যেখানে নিজের জন্ম ও মৃত্যু দিবস সোমবার। নবুঅত প্রাপ্তির দিন সোমবার। ছওর গিরিগুহা থেকে মদীনায় হিজরতের দিন সোমবার। মদীনার উপকণ্ঠে ক্বোবায় উপনীত হওয়ার দিন সোমবার হওয়া সত্ত্বেও এই বিশেষ দিনে উম্মতকে দিবস পালনের ইঙ্গিত দিলেন না বা নিজেও কোন অনুষ্ঠান করলেন না; সেখানে আমরা কার অনুসরণে এসব করছি? আমরা কি তবে মীলাদের আবিষ্কারক ইরাকের এরবল প্রদেশের গবর্ণর আবু সাঈদ মুযাফফরুদ্দীন কুকুবুরীর (৫৮৬-৬৩০ হিঃ) অনুসরণ করছি? না খ্রিষ্টানদের পালিত যীশু খৃষ্টের কাল্পনিক জন্মদিন Xmas day বা বড় দিনের অনুসরণে আমাদের নবীর বড় দিন উদযাপন করছি? তাও আবার তাঁর কথিত মৃত্যু দিবসে জন্মদিবস পালন।

যখন কসোভো, কাশ্মীর, ফিলিস্তীন ও পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা মুসলমানের রক্তে ভাসছে। ইযযতহারা মা-বোনদের আহাযারীতে আকাশ-বাতাস ভারি হচ্ছে। বাংলাদেশের সর্বত্র চলছে খুন-ধর্ষণ ও রাহাযানির ক্বিয়ামত সদৃশ মর্মন্তুদ জীবন যন্ত্রণা। যখন ইসলামের আইন ও বিধান জারির মাধ্যমে সামাজিক শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা প্রতিটি সুনাগরিকের আন্তরিক কামনা। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া অহি-র বিধানকে পাশ কাটিয়ে তাঁর নামে মিথ্যা প্রশংসার অনুষ্ঠান করে সেযুগের কুকুবুরীর মত এ যুগের মিথ্যা নবীপ্রেমিকগণ সাধারণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে রাজনৈতিক ও ব্যক্তি স্বার্থে কাজে লাগাচ্ছেন অবলীলাক্রমে বাধাহীন গতিতে।

অতএব দেশের দায়িত্বশীল সরকার ও সচেতন দ্বীনদার ভাইবোনদের প্রতি আমাদের আবেদন, শিরকী ও বিদ‘আতী অনুষ্ঠান সমূহের পিছনে অহেতুক অপচয় বন্ধ করে সেগুলি তাওহীদ ও সুন্নাহ্র পথে নির্ভেজাল দ্বীন প্রতিষ্ঠার খাতে ব্যয় করুন! শিরকের পক্ষে বিদ‘আতের পক্ষে যখন সরকারী ও বেসরকারী প্রচার মাধ্যমগুলি তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করছে, তখন তাওহীদ ও সুন্নাহ্র দাবীদারগণ নিশ্চুপ কেন? কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ার দৃপ্ত শপথে দীপ্যমান ভাই-বোনেরা কোথায়? কাল ক্বিয়ামতের মাঠে

২১. মুসলিম হা/১১৪৪; মিশকাত হা/২০৫২।

যখন বিদ‘আতীরা আপনাদের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ দায়ের করবে আপনাদের অলসতার বিরুদ্ধে, আপনাদের কৃপণতার বিরুদ্ধে, আপনাদের দায়িত্বহীনতার বিরুদ্ধে, তখন আপনি কি জওয়াব দিবেন? বন্ধুকে বাদাম না খাইয়ে সেই পয়সা দিয়ে একটা ছোট্ট পুস্তিকা কিনে তাকে পড়তে দিন। যদি বন্ধু এর দ্বারা বিদ‘আত হ’তে তওবা করেন, তবে তিনি ও তার পরবর্তী বংশধরগণ ইনশাআল্লাহ বিদ‘আত হ’তে মুক্ত থাকবেন বলে ধরে নেওয়া যায়। ফলে তার ও তার আমলনামায় যত নেকী সঞ্চিত হবে, তার সমপরিমাণ নেকী আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে আপনার আমলনামায় জমা হবে বলে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) ওয়াদা করেছেন।[২২]

নেকী উপার্জনের এই সুন্দর সুযোগটি আপনি হাত ছাড়া করতে চান? একবার মনের চোখ দিয়ে তাকিয়ে দেখুন তো আপনার মৃত্যুকাতর পিতার পাংশু চেহারার দিকে। আপনাকে বড় করার জন্য, সুন্দর করার জন্য, সুখী করার জন্য যিনি তার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছেন। একবার তাকিয়ে দেখুনতো আপনার কাফনে ঢাকা মায়ের বিবর্ণ চেহারার দিকে। দেহের শোষিত রক্তের সবটুকু দিয়ে বুকের সঞ্চিত সুধা উজাড় করে দিয়ে শীত-গ্রীষ্মের ও রাত্রি-দিনের সকল আরামকে হারাম করে যিনি আপনাকে মানুষ করেছেন তিলে তিলে। আজ তাঁরা কবরে শুয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন আপনার দো‘আর, আপনার ছাদাক্বার, আপনার উপহারের। কেন তাঁকে কিছু দিচ্ছেন না? কেন তাদেরকে ভুলে যাচ্ছেন? আপনি আপনার পিতাকে ভুললে আপনার সন্তানেরা আপনাকে ভুলবে- একথা ধরে নেওয়া যায়। অতএব আসুন! যার যা আছে তাই নিয়ে শিরক ও বিদ‘আতের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি। মাল নিয়ে, জান নিয়ে, যবান ও কলম নিয়ে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। মুজাহিদের সম্মান ও মর্যাদা বসে থাকা অলসদের চাইতে বেশী। আসুন সেই মর্যাদা নিয়ে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করি। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন-আমীন![২৩]

---

২২. মুসলিম হা/২৬৭৪; মিশকাত হা/১৫৮।
২৩. ১ম বর্ষ, ১১তম সংখ্যা, জুলাই ১৯৯৮।

১২. জশনে জুলূস ও আমরা

গত ২৭শে জুন'৯৯ রবিবার দেশব্যাপী মহা সমারোহে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' পালিত হ'ল। ঈমানী তেজে বলীয়ান হ'ল বাংলাদেশের মুসলিম সমাজ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'ল সবাই। ইসলামপন্থী, ধর্মনিরপেক্ষ বা জাতীয়তাবাদী সকল দলের মুসলমান স্ব স্ব দৃষ্টিকোণ থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবন চরিত ব্যাখ্যা করলেন বিভিন্ন মীলাদ মাহফিল, সেমিনার, সুধী সমাবেশ ইত্যাদির মাধ্যমে। পত্রিকা সমূহ বিশেষ সংখ্যা বা ক্রোড়পত্র বের করল। বের হ'ল বড় বড় ধর্মীয় মিছিল ও সড়ক কাঁপানো জশনে জুলূসে ঈদে মীলাদুন্নবী (ছাঃ)-এর দীর্ঘ শোভাযাত্রা। প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেত্রী, জাতীয় সংসদের স্পীকার সকলেই সুন্দর সুন্দর বাণী প্রদান করলেন। সকলেই সকলকে রাসূল (ছাঃ)-এর উত্তম জীবনাদর্শ অনুসরণের আহ্বান জানালেন এবং বললেন যে, রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ বাস্তবায়নের মধ্যেই কেবল বিশ্বশান্তি নির্ভর করছে। কতই না সুন্দর কথা সব। সেই সাথে ব্যয় হ'ল সরকারী রাজস্ব ও বেসরকারী সম্পদের একটি বিরাট অংশ। এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল- কি জন্য এই জোশ? কি জন্য এই ভালবাসার প্রদর্শনী?

জবাব যদি এটাই হয় যে, রাসূল (ছাঃ)-এর জন্মে আমরা খুবই খুশী। তাই আনন্দের প্রকাশ ঘটাচ্ছি মাত্র। তবে তো বলা যাবে যে, রাসূল নয় মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ্‌র জন্ম মুহূর্তে খুশী হয়েছিলেন এই পিতৃহীন ইয়াতীম শিশুর দাদা-চাচা ও নিকটাত্মীয় জাহেলী আরবের নেতারা। এমনকি চাচা আবু লাহাব এই সুসংবাদ পেয়ে খুশী হয়ে সংবাদ বাহিকা ক্রীতদাসী ছুওয়াইবাকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। দাদা আব্দুল মুত্ত্বালিব, চাচা আবু তালিব তাঁকে জীবন দিয়ে আদর-যত্ন করেছিলেন। সারা আরবের লোক তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল। তাঁকে সকলে 'আল-আমীন' বা 'বিশ্বস্ত' বলে আহ্বান করত। শৈশব, কৈশোর, তারুণ্য ও যৌবন পেরিয়ে প্রৌঢ়ত্বের শুরুতে ৪০ বৎসর বয়সে যেমনি মাত্র তিনি প্রচলিত শিরকী প্রথা সমূহের বিরোধিতা করে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন, অমনি শুরু হ'ল বিরোধিতা, চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র, গীবত, তোহমত, চরিত্রহনন, সমাজচ্যুতি, বয়কট, দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন, হত্যার ষড়যন্ত্র এবং অবশেষে চিরদিনের মত মাতৃভূমি ত্যাগ ও মদীনায় হিজরত ও সেখানেই মৃত্যুবরণ।

যে চাচা আবু লাহাব ভাতীজার জন্মে খুশীতে বাগবাগ হয়েছিল। সেই চাচা ছাফা পাহাড়ে ভাতীজার নিকট থেকে তাওহীদের দাওয়াত পেয়ে রাগে-দুঃখে-ক্ষোভে বলে উঠল : 'তুমি এজন্য আমাদেরকে এখানে জমা করেছ?' অতঃপর কুরায়েশ-এর প্রায় সব নেতাই রাতারাতি তাঁর শত্রু হয়ে গেল।

বুঝা গেল যে, ভাতীজা মুহাম্মাদকে গ্রহণ করলেও রাসূল মুহাম্মাদকে তারা বরদাশত করেনি। তারা তাঁর আনীত শরী'আতকে গ্রহণ করেনি। যদিও তারা আল্লাহকে, হাশর-নশরকে, ক্বিয়ামত ও হিসাব-নিকাশকে, জান্নাত ও জাহান্নামকে, হজ্জ ও ওমরাহকে, সর্বোপরি আল্লাহ্‌র ঘর কা'বাকে বিশ্বাস করত। কিন্তু আল্লাহ্‌র বিধানকে তারা মানেনি। কিছু ক্ষেত্রে তারা নিজেদের বিধান জুড়ে দিয়েছিল। ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র সাথে অসীলা পূজারী হয়েছিল। মৃত নেককার লোকদের মূর্তি গড়ে তারা কা'বা গৃহে জমা করেছিল ও তাদের অসীলায় ও সুফারিশে আল্লাহ্‌র নিকটে মুক্তি কামনা করেছিল। রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) স্বীয় বাপ-দাদাদের শিরকী আক্বীদা ও আমলের বিরোধিতা করলেন। ফলে সবাই হ'ল তাঁর শত্রু এবং তিনি হ'লেন অপবাদগ্রস্ত, নির্যাতিত ও বিতাড়িত। নানার বাড়ী মদীনার আনছাররা তাঁকে বরণ করে নিলেন। তাদের সাহায্যে তিনি পরবর্তীতে মক্কার উপরে সামরিক ও রাজনৈতিক বিজয় লাভ করলেন। সফল নবী হিসাবে বিশ্বের ইতিহাসে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। যদি সেদিন তিনি মক্কায় নিজ বাপ-চাচাদের হাতে নিহত হ'তেন কিংবা পরবর্তীতে মক্কা বিজয়ে ব্যর্থ হ'তেন, তাহ'লে হয়তবা তাঁর জীবনেতিহাস অন্যভাবে লেখা হ'ত।

এক্ষণে প্রশ্ন : রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কোনটা? তাঁর জন্ম না তাঁর নবুঅত লাভ? 'মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ' বেশী গুরুত্বপূর্ণ না 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' (ছাঃ) বেশী গুরুত্বপূর্ণ? জন্মকে গুরুত্ব দিয়ে রিসালাতকে গুরুত্ব না দিলে তাঁর চাচাদের চরিত্রের সাথে আমাদের চরিত্রের মিল হয়ে যাবে। দু'টোকেই গুরুত্ব দিয়ে স্রেফ দিবস পালন করলে দেখা যাবে রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ কখনোই এসব করেননি। তাহ'লে এগুলো কার আদর্শ? ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে যে, খ্রিষ্টানদের বড় দিন পালনের অনুকরণে ৬০৫ বা ৬২৫ হিজরীতে ইরাকের 'এরবল' প্রদেশের গবর্ণর আবু সাঈদ মুযাফফরুদ্দীন কুকুবুরী (৫৮৬-৬৩০ হিঃ) সর্বপ্রথম 'মীলাদুন্নবী'র প্রথা

চালু করেন। প্রতি বৎসর মীলাদুন্নবীর মৌসুমে প্রাসাদের নিকটে তৈরী অন্যূন ২০টি খানক্বাহে তিনি গান-বাদ্যের আসর বসাতেন *(আল-বিদায়াহ ১৩/১৩৭)*। কখনো মুহাররম কখনো ছফর মাস থেকে এই মৌসুম শুরু হ'ত। মীলাদুন্নবীর দু'দিন আগে থেকেই খানক্বাহের আশপাশে গরু-ছাগল যবহের ধুম পড়ে যেত। কবি, গায়ক, ওয়ায়েয সহ অসংখ্য লোক সেখানে ভিড় জমিয়ে মীলাদুন্নবী উদযাপন করত। আলেমদের উপঢৌকন ও চাপ দিয়ে মীলাদের পক্ষে জাল হাদীছ ও বানোয়াট গল্প লিখতে বাধ্য করা হ'ত। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, মিথ্যা নবীপ্রেমের মহড়া দেখিয়ে জনসাধারণের মন জয় করা।

এক্ষণে রবীউল আউয়াল মাস এলে আমাদের দেশে যেভাবে দিবস পালন, মিছিল-মিটিং, জশনে জুলূস, মীলাদুন্নবী, সীরাতুন্নবী, ইয়াওমুন্নবী, দাওয়াতুন্নবী ও আশেকে রাসূল (ছাঃ) মহাসম্মেলন ইত্যাদি শুরু হয়ে যায়, তাতো কেবল সেই কুকুবুরীর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। অথচ রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যামানায় এ সবের কোন খবর ছিল না। যদি এটা ধর্মীয় প্রথা হয়, তাহ'লে অবশ্যই রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী, কর্ম বা সম্মতি দ্বারা এর সমর্থন থাকতে হবে। কিন্তু সে সবের তো কোন অস্তিত্ব নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না, যেভাবে নাছারাগণ ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করেছে... বরং তোমরা বল যে, আমি আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল'।[২৪] হাদীছে রিয়া ও শ্রুতিকে 'শিরকে আছগার' বা ছোট শিরক বলা হয়েছে।[২৫] যা সকল পাপের বড় পাপ। মিছিল, জশনে জুলূস ইত্যাদি তো 'রিয়া' বা প্রদর্শনীর মধ্যেই পড়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি ভালবাসার প্রকৃত প্রমাণ হ'ল তাঁর 'ইত্তেবা' বা অনুসরণ করা। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা সার্বিক জীবনে তাঁর আদর্শ যথাযথভাবে অনুসরণ করার মধ্যেই তাঁর প্রকৃত প্রেম নিহিত রয়েছে। দেশের সরকারী ও বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক দল সমূহের প্রায় সবাই মুসলমান। আমরা যদি আমাদের এই প্রিয় জন্মভূমিতে রাসূল (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া পবিত্র আদর্শের বাস্তবায়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'তে পারতাম

---

২৪. বুখারী হা/৩৪৪৫; মিশকাত হা/৪৮৯৭।

২৫. আহমাদ হা/২৩৬৮০, সনদ হাসান; মিশকাত হা/৫৩৩৪।

এবং যাবতীয় শিরক ও বিদ‘আত থেকে দূরে থাকতে পারতাম ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র অনুসারী হ’তে পারতাম, তাহলেই তাঁর প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন সম্ভব হ’ত বলে আমরা মনে করি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

(এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য মাননীয় লেখকের ‘মীলাদ প্রসঙ্গ’ বইটি পড়ুন)।[২৬]

১৩. ইসরা ও মি‘রাজ

‘ইসরা’ অর্থ রাত্রিকালীন ভ্রমণ। ‘মি‘রাজ’ অর্থ ঊর্ধারোহণের বাহন। মক্কার মাসজিদুল হারাম থেকে ঈলিয়া বা যেরুযালেমের বায়তুল মুক্বাদ্দাস পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাত্রিকালীন সফরকে ‘ইসরা’ বলে এবং বায়তুল মুক্বাদ্দাস থেকে সপ্ত আসমান ভ্রমণ ও আল্লাহ্‌র দীদার লাভ পর্যন্ত ঘটনাকে ‘মি‘রাজ’ বলে। যেহেতু মি‘রাজের ঘটনাটিই মুখ্য, সেকারণ পুরা সফরটিই ‘মি‘রাজ’ নামে পরিচিত হয়েছে। সূরা বনু ইসরাঈলের ১ম আয়াতে ‘ইসরা’ এবং সূরা নাজমের ১৩ থেকে ১৮ পর্যন্ত ৬টি আয়াতে মি‘রাজের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত ২৬-এর অধিক ছাহাবী কর্তৃক বুখারী ও মুসলিম সহ প্রায় সকল হাদীছ গ্রন্থে ‘মুতাওয়াতির’ পর্যায়ে মি‘রাজের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। অতএব মি‘রাজ অকাট্যভাবে প্রমাণিত সত্য ঘটনা। ইসরা ও মি‘রাজ মাত্র একবার হয়েছিল এবং এটি হিজরতের এক বছর পূর্বে জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে ও সজ্ঞানে হয়েছিল, ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নের মাধ্যমে নয়। যদিও নবীদের স্বপ্ন সত্য হয়ে থাকে। স্বপ্নে হ’লে এটি কোন বড় বিষয় হ’ত না। সশরীরে ও জাগ্রত অবস্থায় হয়েছিল বলেই মক্কার লোকেরা এটাকে অবিশ্বাস করেছিল এবং সর্বত্র বদনাম রটনার সুযোগ পেয়েছিল। আর একারণেই বহু মুসলমান তাঁকে মিথ্যা নবী মনে করে ‘মুরতাদ’ হয়ে পুনরায় কুফরীতে ফিরে গিয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ ‘আব্‌দ’ বা বান্দা বলতে দেহ ও আত্মা মিলিতভাবে বুঝায়, শুধুমাত্র আত্মাকে নয়। তৃতীয়তঃ তাঁকে বোরাকে আরোহণ করতে হয়েছিল। আরোহণ করার জন্য দেহ প্রয়োজন। আত্মা কখনো আরোহণ করে না।

মি‘রাজের ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসে তো বটেই, বরং পুরা নবুঅতের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ব্যতীত কোন

---

২৬. ২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, জুলাই ১৯৯৯।

নবীই এই সৌভাগ্য লাভ করেননি। আর কোন উম্মতই এত বড় কঠিন ঈমানী সংকটে পতিত হয়নি, যতবড় সংকটে পতিত হয়েছিলেন প্রাথমিক যুগের মুমিনগণ। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, মি'রাজের ঘটনাবলীকে অবিশ্বাস করে একদল মুসলমান 'মুরতাদ' হয়ে যায় এবং তারা পরবর্তীতে আবু জাহলের সাথে বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে নিহত হয়। অন্যদিকে লোকেরা যখন গিয়ে আবুবকর (রাঃ)-কে এই ঘটনা শুনায়, তখন তিনি নির্দ্বিধায় বলে ওঠেন, এর চাইতে অলৌকিক কোন আসমানী খবর যদি মুহাম্মাদ বলেন, আমি তা অবশ্যই বিশ্বাস করব। এদিন থেকেই আবুবকর পরিচিত হ'লেন আবুবকর ছিদ্দীক্ব রূপে। ছিদ্দীক্ব অর্থ সত্যায়নকারী। শুধু তাই নয় তিনি বরিত হ'লেন উম্মতের সেরা ব্যক্তিরূপে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, মি'রাজের ঘটনা অবিশ্বাস করার কারণে দুর্বল ঈমানদারগণ মুরতাদ হয়ে গেল। পক্ষান্তরে সবল ঈমানদারগণের ঈমান আরও বর্ধিত হয়ে সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে গেল।

ছহীহ, হাসান সকল প্রকার রেওয়ায়াতের ঐক্যমতে মি'রাজের ঘটনাবলী সংক্ষেপে এই যে, একদা রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাসজিদুল হারামে ঘুমিয়ে ছিলেন। এমন সময় জিব্রীলের নেতৃত্বে কয়েকজন ফেরেশতা এসে তাঁকে উঠিয়ে যমযম কূয়ার পাশে নিয়ে গেল। সেখানে তারা তাঁর বুক চিরে ফেলে কলিজা বের করল। অতঃপর তা যমযম পানিতে ধুয়ে সেখানে ঈমান ও হিকমত পূর্ণ করে দিল। অতঃপর জিব্রীলের নির্দেশনামতে ধবধবে সাদা 'বোরাক্ব' নামীয় একটি পশুর পিঠে সওয়ার হয়ে মাসজিদুল হারাম থেকে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে পৌঁছে যান। সেখানে একটি পাথরে পশুটিকে বেঁধে রেখে তিনি মসজিদে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করেন। অতঃপর তাঁর নিকটে মদ ও দুধের পাত্র পেশ করা হয়। কিন্তু কেবল দুধ পান করেন। তখন জিব্রীল বলল, আপনি স্বভাবধর্ম প্রাপ্ত হয়েছেন। অতঃপর মি'রাজ বা ঊর্ধারোহণের বাহন আনা হয়, যা ছিল সিঁড়ির ন্যায়। অতঃপর ঐ বৈদ্যুতিক লিফটে চড়ে তিনি ঊর্ধারোহণ করেন। পথিমধ্যে প্রতি আসমানে অবস্থানরত বিশিষ্ট নবীদের সঙ্গে জিব্রীল তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেন। যেমন প্রথম আসমানে হযরত আদম (আঃ), দ্বিতীয় আসমানে ইয়াহইয়া ও ঈসা (আঃ), তৃতীয় আসমানে ইউসুফ (আঃ), চতুর্থ আসমানে ইদরীস (আঃ), পঞ্চম আসমানে হারূণ (আঃ), ষষ্ঠ আসমানে মূসা (আঃ) ও সপ্তম আসমানে ইবরাহীম (আঃ)। তার উপরে দিগন্ত বিস্তৃত 'সিদরাতুল

মুনতাহা' বা প্রান্তস্থিত কুলগাছ অবস্থিত, যা অতীব সুন্দর ও সুসজ্জিত। ফেরেশতাদের গমনাগমনের এটাই হ'ল শেষ সীমানা। এর উপরে আল্লাহ্র আরশ অবস্থিত। আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ সমূহ প্রথমে এখানে নাযিল করা হয়। তারপর এখান থেকে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণের মাধ্যমে দুনিয়াতে প্রেরিত হয়। অনুরূপভাবে বান্দাদের আমলনামা সমূহ প্রথমে এখানে নিয়ে আসা হয়। অতঃপর এখান থেকে আল্লাহ্র দরবারে পেশ করা হয়। ফেরেশতা বা নবী-রাসূলগণের কেউ এই স্থান অতিক্রম করতে পারেননি, শেষনবী (ছাঃ) ব্যতীত।

রাসূল (ছাঃ) সপ্তম আকাশে পৌঁছে জিব্রীলের সাথে বায়তুল মা'মূর পৌঁছেন। এখানে তাঁকে মদ, দুধ ও মধুর পাত্র পেশ করা হয়। তিনি দুধ গ্রহণ করেন। জিব্রীল বলল, এটাই স্বভাবধর্ম। আপনি ও আপনার উম্মত এর উপরে থাকবে। অতঃপর তিনি জান্নাত ও জাহান্নাম পরিদর্শন করেন। অতঃপর সিদরাতুল মুনতাহা বৃক্ষের নিকটে পৌঁছে গেলে জিব্রীল তাঁকে ছেড়ে যান ও তাঁর উপরে একটি মেঘ ছেয়ে যায়। তিনি সিজদায় পড়ে যান। এ সময় আল্লাহ তাঁর অতীব নিকটে এসে যান ও তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং উভয়ের মাঝে দূরত্ব দুই ধনুক বা দু'গজেরও কম হয়ে যায়। তখন আল্লাহপাক তাকে অহি করেন ও পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেন যা পঞ্চাশ ওয়াক্তের ফযীলতের সমান। অতঃপর মেঘমালা সরে গেলে জিবরীল ফিরে এসে তাঁকে নিয়ে দুনিয়ায় অবতরণ করেন এবং তিনি সমস্ত নবীদের সাথে নিয়ে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে দু'রাক'আত ছালাতে ইমামতি করেন। অতঃপর বোরাকে সওয়ার হয়ে পুনরায় মক্কায় ফিরে আসেন। পরদিন সকালে তিনি অবিশ্বাসী কুরায়েশদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বায়তুল মুক্বাদ্দাস সম্পর্কে তাদের মধ্যকার অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমস্ত প্রশ্নের সঠিকভাবে জবাব দেন। এতে তারা বিস্মিত হয়ে যায়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইতিপূর্বে কখনো বায়তুল মুক্বাদ্দাস সফর করেননি।[২৭]

হাফেয আবু নাঈমের একটি যঈফ বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পর্কে জানার জন্য আবু সুফিয়ানকে তার

২৭. বুখারী হা/৩৮৮৭; মুসলিম হা/১৬৪; মিশকাত হা/৫৮৬২-৬৭ 'মি'রাজ' অনুচ্ছেদ; আহমাদ হা/১২৫২৭; ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বনু ইসরাঈল ১ম আয়াত।

দরবারে ডেকে নেন, তখন আবু সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মিথ্যা নবী প্রমাণ করার জন্য সম্রাটের নিকটে ইসরার উপরোক্ত ঘটনা শুনান। সম্রাট তখন বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দাররক্ষীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি সকল দরজা ভালভাবে বন্ধ না করা পর্যন্ত কোনদিন ঘুমাতে যাইনা। কিন্তু ঐদিন সব দরজা বন্ধ করার পর মূল দরজাটি সকলে মিলে চেষ্টা করেও নাড়াতে পারিনি। মিস্ত্রীদের ডাকলে তারা পরীক্ষা করে বলে যে, দরজাটিকে উপর থেকে ভারী দেওয়ালে চেপে ধরে রেখেছে। সকাল ব্যতীত আমরা কিছুই করতে পারব না। সকালে গিয়ে দেখি দরজা স্বাভাবিক। সামনে একটি পাথর দেখলাম ছিদ্র করা। মনে হ'ল সেখানে কিছু বাধা ছিল। তখন আমি আমার সাথীদের বলি, নিশ্চয়ই রাতে কোন নবী এখানে এসেছিলেন, যার সম্মানে দরজা খোলা রাখা হয়েছিল। ইবনু কাছীর বলেন, ঈলিয়া বা যেরুযালেম হ'ল ইবরাহীম বংশীয় নবীদের খনি। সেকারণ সমস্ত নবীকে এখানে ডেকে এনে ছালাতে ইমামতির মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) হ'লেন সকল নবীর সরদার। কুরতুবী বলেন, আল্লাহ তার রাসূলকে আব্দ বা দাস বলে সম্বোধন করেছেন। তার মর্ম এই যে, এর চাইতে সম্মানিত কোন নাম বান্দার জন্য নেই। থাকলে নিশ্চয়ই সেই নামে রাসূলকে সম্মানিত করা হ'ত।

মি'রাজের শিক্ষা : মি'রাজের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হ'ল, আল্লাহ্র অনুগত দাস হওয়ার চেষ্টা করা। সর্বাধিক দাসত্বের মধ্যেই সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদা নিহিত। আর এজন্যেই আল্লাহ জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয়তঃ জগদ্বাসীর জন্য আল্লাহ্র দেওয়া সবচেয়ে বড় তোহফা হ'ল ছালাত। যা তিনি নিজ দরবারে ডেকে নিয়ে তাকে প্রদান করেছিলেন। কারণ ছালাতের মাধ্যমে মানুষের নৈতিক উন্নয়ন ঘটে। আর নৈতিক উন্নতিই হ'ল সকল উন্নতির মূল চাবিকাঠি। সেকারণ ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দাকে তার ছালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। ছালাতের হিসাব সুষ্ঠু হ'লে সকল হিসাব সুষ্ঠু হবে। নইলে সবকিছু বরবাদ হবে। অতএব জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্র দাসত্ব করা ও ছালাতের হেফাযত করাই হ'ল মি'রাজের মূল শিক্ষা। অন্যান্য ধর্মের লোকেদের ন্যায় মুসলমানেরাও যাতে ধর্মের নামে অহেতুক আনুষ্ঠানিকতায় বন্দী না হয়ে পড়ে, সেকারণ রাসূলের জন্মদিন, শবেক্বদর ইত্যাদির ন্যায় শবে মে'রাজের সঠিক তারিখকেও অজ্ঞাত রাখা হয়েছে। অতএব ২৭শে রজবকে

শবে মে'রাজ বলা বা পবিত্র মনে করে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করা সবকিছু বিদ'আতে পর্যবসিত হবে। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে এসবের কোন প্রমাণ নেই। আল্লাহ আমাদেরকে মি'রাজের মূল শিক্ষা অনুধাবনের তাওফীক দিন এবং যাবতীয় বিদ'আত থেকে দূরে থাকার শক্তি দিন- আমীন।[২৮]

১৪. উৎসের সন্ধানে

সকল মানুষ আদম ও হাওয়ার সন্তান। সেখান থেকে বংশ বিস্তৃত হয়ে পৃথিবী নামক এ ক্ষুদ্র গ্রহটি এখন মনুষ্যভারে জমজমাট। একই পিতা-মাতার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও তাদের পরস্পরে মিল নেই। সাধারণ মানুষের মধ্যে পরস্পরে কিছু মিল-ভালোবাসা থাকলেও নেতৃস্থানীয় লোকদের অধিকাংশের মধ্যে সাপে-নেউলে সম্পর্ক। তাদের পারস্পরিক লড়াইয়ে বিশ্ব আজ অশান্ত। অথচ বিশ্বশান্তি নির্ভর করে পারস্পরিক আস্থা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উপরে। মানব সমাজে পারস্পরিক বিভেদ ও অশান্তির মূল কারণ হিসাবে আমরা দু'টি বিষয়কে চিহ্নিত করতে পারি। ১- আক্বীদা ও আমলের বৈপরীত্য ২- পারস্পরিক হিংসা ও অহংকার। মানব সমাজে বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মীয় জাতিগোষ্ঠীর সৃষ্টি মূলতঃ বিশ্বাসের বৈপরীত্যের কারণেই হয়েছে। আদম (আঃ) থেকে নূহ (আঃ) পর্যন্ত সময়কালের মধ্যেই আদম সন্তানদের মধ্যে বিশ্বাসের সংঘাত শুরু হয়। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ও তাঁর বিধানকে ভুলে মানুষ প্রবৃত্তিপূজারী হয়ে পড়ে। ফলে সৃষ্টি হয় অসীলা পূজার শিরক। পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন শিরক হ'ল কবরপূজা ও মূর্তিপূজার শিরক। আদমপুত্র ক্বাবিলের বংশের জনৈক ব্যক্তি সর্বপ্রথম মৃত সৎলোকের মূর্তি তৈরী করে তার অসীলায় পরকালে মুক্তি কামনায় শিরক চালু করে। অতঃপর বুরদ বিন মিহলাঈলের শাসনকালে মূর্তিপূজার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। তখন নূহ (আঃ) প্রেরিত হন। কিন্তু তাঁকে লোকেরা প্রত্যাখ্যান করে। ফলে নূহ (আঃ)-এর অভিসম্পাতে ও আল্লাহ্র গযবে দুনিয়া গারত হয়ে যায়।

নূহ (আঃ)-এর কিশতীতে ওঠে বেঁচে যাওয়া নেককার সাথীদের বংশধরগণের মধ্যে পুনরায় দেখা দেয় আক্বীদার সংঘাত। যদিও তারা সকলেই ছিল নূহের

২৮. ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অক্টোবর ২০০২।

তিন ছেলে হাম, সাম ও ইয়াফিছ-এর বংশধর। বর্তমান পৃথিবীর অধিকাংশ এলাকা জুড়ে রয়েছে সাম-এর বংশধর সেমেটিক জাতির মানুষের বাস। কিন্তু তাদের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব। তারকাপূজারী ও মূর্তিপূজারীদের সঙ্গে ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিতর্ক পবিত্র কুরআনে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর সাথে নমরূদের বিরোধ এবং মূসা (আঃ)-এর সাথে ফেরাঊনের বিরোধ ছিল মূলতঃ বিশ্বাসজনিত। ইহূদীরা যে যীশু খ্রীষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা (?) করেছিল, তার কারণ এটা ছিল না যে, তিনি তাঁর ১০/১২ জন নিরীহ হাওয়ারীকে নিয়ে সম্রাট তুতইয়ানূস-এর রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে চেয়েছিলেন। বরং তাঁর মূল অপরাধ ছিল এই যে, তিনি ইহূদীদের বিকৃত আক্বীদা ও আমলের সংশোধন ও পরিমার্জন কামনা করেছিলেন। বিগত যুগে বহু দার্শনিক ও বিজ্ঞানী যে নৃশংসভাবে নিহত হয়েছেন, তারও প্রধান কারণ ছিল বিকৃত খৃষ্টীয় বিশ্বাসের জন্য তারা ছিলেন বাধা ও উপদ্রব স্বরূপ।

সবশেষে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সাথে মক্কার পৌত্তলিক ও মদীনার ইহূদী-নাছারাদের যে সংঘাত হয়, সেটাও ছিল মূলতঃ বিশ্বাসের সংঘাত। কেননা তাদের লালিত শিরকী আক্বীদার সঙ্গে সামান্য আপোষ করতে পারলেই তিনি মক্কার নেতৃত্বে খুব সহজেই আসীন হ'তে পারতেন। কিন্তু তিনি আপোষ না করাতেই তাদের হিংসা ও যুলুমের শিকার হন। যদিও আল্লাহ ও আখেরাতের উপরে বিশ্বাস তাদের মধ্যে সব সময় অটুট ছিল। মানুষ হিসাবে তারা মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহকে তাদের বংশের সেরা সন্তান হিসাবে মেনে নিয়েছিল। তাঁকে 'আল-আমীন' হিসাবে বিশেষিত করেছিল। কিন্তু বাপ-দাদা চৌদ্দ পুরুষের কুসংস্কারাচ্ছন্ন আক্বীদা-বিশ্বাসের উপরে যিদ করায় অহংকার বশে তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিরোধিতায় লিপ্ত হয়।

রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যামানার শেষ দিকে মাথা চাড়া দেয় আভ্যন্তরীণ আক্বীদা ও আমলের সংঘাত। ইহূদী-খ্রিষ্টান ও পৌত্তলিকদের লালিত বহু কুসংস্কার ইসলামের লেবাস পরে মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করে। সৃষ্টি হয় খারেজী, শী'আ, ক্বাদারিয়া, জাবরিয়া, মু'তাযিলা, মুর্জিয়া ইত্যাদি বিভ্রান্ত মতবাদ সমূহ। আরও পরে চতুর্থ শতাব্দী হিজরীতে সুন্নী দল ভেঙ্গে সৃষ্টি হয় হানাফী, মালেকী, শাফেঈ, হাম্বলী প্রভৃতি দল ও

তন্মধ্যকার অসংখ্য উপদল। আল্লাহ, রাসূল, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি বিষয়ে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাসগত মিল থাকলেও আক্বীদা ও আমলের বিস্তীর্ণ ময়দানে মৌলিক ও প্রশাখাগত অসংখ্য বিষয়ে তাদের পরস্পরের মধ্যে সৃষ্টি হয় দুস্তর প্রভেদ। যা আজও রয়েছে এবং দিন দিন প্রলম্বিত হচ্ছে।

নূহ (আঃ)-এর যুগে ফেলে আসা অসীলা পূজার শিরক বর্তমানে পীরপূজা ও কবরপূজার মাধ্যমে এবং মূর্তিপূজার শিরক কথিত শহীদ মিনার, স্মৃতিস্তম্ভ, ছবি ও চিত্র, ভাস্কর্য ইত্যাদিতে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদনের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন নামে ও বেনামে মুসলিম সমাজে ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পেতে চলেছে। ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশে আমর বিন লুহাই নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত নেতা প্রথম সিরিয়া থেকে 'হোবল' মূর্তি মক্কায় এনে স্থাপন করেন ও সকলকে তার অসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য তাকে পূজা করার আহ্বান জানান। তারপর থেকে কুরায়েশের সকল গোত্রের মধ্যে ক্রমে মূর্তিপূজা বিস্তার লাভ করে। যা রাসূল (ছাঃ)-এর আবির্ভাবকালে ৩৬০টিতে উপনীত হয়।

সেদিনের ৩৬০টির স্থলে এখন মুসলিম বিশ্বের ঘরে ঘরে, মাঠে-ময়দানে, রাস্তার ধারে, শহরে-বন্দরে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে লক্ষ লক্ষ শিরকী প্রতিমা নামে-বেনামে বিরাজ করছে। আল্লাহ্র প্রতি একক বিশ্বাস ও তাঁর প্রতি অটুট ভরসা বিভিন্ন অসীলা পূজার মাধ্যমে সকল যুগে যেভাবে ভঙ্গুর হয়েছে, এমনকি শিরকের বিরুদ্ধে আপোষহীন নবী ইবরাহীমের নিজ হাতে গড়া বায়তুল্লাহ শরীফে আল্লাহতে বিশ্বাসী লোকদের দ্বারা মূর্তিপূজার মাধ্যমে যেভাবে তাওহীদকে অপদস্থ করা হয়েছিল, একইভাবে আজ আল্লাহতে বিশ্বাসী মুসলমানদের হাতেই রকমারী শিরক ও বিদ'আতের মাধ্যমে আল্লাহ্র একচ্ছত্র তাওহীদ ও রাসূলের একচ্ছত্র রিসালাতকে অপদস্থ করার অপচেষ্টা চলছে। সেদিন যেভাবে আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের মত কিছু মুনাফিক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে ভিতর থেকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করেছিল। আজও তেমনি দুনিয়াবী স্বার্থদুষ্ট কিছু লোক ভিতর থেকে ইসলামের ক্ষতি সাধন করে চলেছে।

আজকের বিশ্বে সন্ত্রাস নির্মূলের বাহানায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের 'ক্রুসেড' ঘোষণার আস্ফালন, আফগানিস্তানের উপর বেহায়া আক্রমণ ও

ইরাকের বিরুদ্ধে হামলার সকল আয়োজন ও উন্মত্ততার বিশ্বস্ত সহযোগী কেবল খ্রিষ্টান, ইহূদী ও পৌত্তলিক অধ্যুষিত দেশগুলিই নয়, বরং মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রনেতা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবীরাও রয়েছেন। এমনকি 'রিস্ক' নিয়ে হক কথা বলার মত বুকের পাটা ধর্মীয় নেতাদেরও অধিকাংশের মধ্যে নেই।

ভারতবিজয়ী বীর সুলতান মাহমূদকে যখন সোমনাথ মন্দিরের পুরোহিতেরা তাদের হাতে গড়া মূর্তিগুলি ভাঙ্গার বিনিময়ে অঢেল সোনা-রূপা, হীরা-জহরত দিতে চেয়েছিল, তখন সুলতান দ্ব্যর্থহীনভাবে তাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন 'ম্যায় বুত শিকন হুঁ, বুত ফুরোশ নেহী হুঁ' 'আমি মূর্তি ধ্বংসকারী, মূর্তি বিক্রেতা নই'। তিনি তাঁর তাওহীদ বিশ্বাসকে অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করেননি। অথচ আজ সেই ভারতবর্ষের মুসলিম রাষ্ট্র নেতারা নিজেদের গরীব প্রজাদের রাজস্বের পয়সা দিয়ে নামে-বেনামে স্থানে-অস্থানে মূর্তি ও স্তম্ভ তৈরী করছে। আর সেখানে গিয়ে পবিত্র ফুল সমূহ ছিঁড়ে এনে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করছে। দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করছে। ওদিকে কবর ব্যবসায়ী ধর্মনেতারা মৃতব্যক্তির অসীলায় মুক্তি পাওয়ার ধোঁকা দিয়ে নযর-নিয়াযের পাহাড় গড়ছেন। অথচ তার মনের আয়নায় একবারও ভেসে ওঠে না সেই অভুক্ত মানুষগুলির কথা, যারা না খেয়ে না পরে প্রচণ্ড শীতে, গ্রীষ্মে ও বর্ষায় কাতর হয়ে অনতিদূরে অধোমুখে দাঁড়িয়ে আছে। ঐ শহীদ মিনার ও স্মৃতিসৌধের বা ঐ মৃত পীরের সমাধিসৌধের একখানা ইটের মূল্য দিলে ঐ অনাহারক্লিষ্ট প্রজাটির বেঁচে থাকার সংস্থান হ'ত। অথচ সবকিছুই চলছে রাজনীতির নামে। চলছে ধর্মের নামে। কে বলবে সাহস করে যে, এগুলি ধর্ম নয়, এগুলি আল্লাহ প্রেরিত দ্বীন নয়। এগুলি আমাদের বানানো মেকী রাজনীতি ও মেকী ইসলাম।

নীটশের মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে হিটলার ও মুসোলিনী লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে। কার্লমার্কসের মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে রাশিয়া ও চীনে প্রায় আড়াই কোটি মানুষের জীবন গেছে। পুঁজিবাদী মিত্রবাহিনীর হামলায় নাগাসাকি-হিরোশিমায় লাখো মানুষের রক্ত ঝরেছে। আজও যার ধ্বংসের রেশ চলছে। এইভাবে শক্তিবাদ, সমাজবাদ, পুঁজিবাদ, গণতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি মতবাদ ও বিশ্বাসের সংঘাতে যুগে যুগে

হাযার হাযার মানুষের জীবনাহুতি ঘটেছে। অথচ মানুষ যদি মানুষের সৃষ্ট মতবাদের পিছনে না ছুটে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ প্রেরিত দ্বীনের পথে দৃঢ় থাকত, তাহ'লে অশান্তি থেকে বিশ্ব মুক্তি পেত। নবীগণ সর্বদা সেই সত্য ও মুক্তির পথে মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন। যার সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ রূপ হ'ল ইসলাম। যা শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে মানবজাতি প্রাপ্ত হয়েছে। যা নির্ভেজালরূপে রক্ষিত আছে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মধ্যে। সেই নির্ভেজাল দ্বীনের বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানবজাতির ইহকাল ও পরকালের সার্বিক কল্যাণ ও মুক্তির লক্ষ্যে ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য জান-মাল, সময় ও শ্রম ব্যয় করার মত কেউ আছেন কি? আমরা এসেছিলাম জান্নাত থেকে। চলুন ফিরে চলি জান্নাতের দিকে। আসুন ঝাঁপিয়ে পড়ি সেই পবিত্র উৎসের সন্ধানে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন! আমীন![২৯]

১৫. কাদিয়ানী বিতর্ক শেষ করুন

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী 'বাইরের চাপ' এবং সফররত আমেরিকান কংগ্রেসম্যান জোসেফ ক্রাউলীকে নাখোশ করে হ'লেও সরকার কাদিয়ানীদের সকল প্রকাশনা, বিক্রয়, বিতরণ ও সংরক্ষণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে গত ৮'ই জানুয়ারী'০৪ এক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। ঘোষণাটি দ্বীনদার মহলে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। যদিও বিরোধী দলীয় নেত্রী* সহ ধর্মনিরপেক্ষ ও বাম মহল থেকে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এসেছে। ঘোষণাটিকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যুগান্তকারী বলা চলে এজন্য যে, পাকিস্তান আমল থেকে ঢাকায় আসন গেড়ে বসা এই ভ্রান্ত দলটির গায়ে এযাবত কেউ হাত দেয়ার সাহস করেনি। ইতিমধ্যে বহু মুসলমানকে এরা বিপথে নিয়ে গেছে। এ কাজে প্রধান হাতিয়ার হিসাবে তারা ব্যবহার করেছে তাদের অঢেল বিদেশী অর্থ ও চটকদার প্রকাশনা। আর সেফগার্ড হিসাবে ব্যবহার করেছে সরকারের বড় বড় রুই-কাতলাকে। পাকিস্তানের সৃষ্টিলগ্ন থেকে এযাবৎকাল কাদিয়ানীরা সর্বদা সরকারের মধ্যে বা কাছাকাছি থাকতে চেষ্টা করেছে। যাতে সরকারী প্রশাসন সর্বদা তাদের ব্যাপারে নমনীয় থাকে। 'কাফির' হওয়ার কারণে মক্কায়

২৯. ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জানুয়ারী ২০০৩। * আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা।

কাদিয়ানীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। সেকারণ ইসলামের নাম নিয়েই তারা মুসলমানদের প্রতারণা করে চলেছে।

কাদিয়ানীরা 'কাফির' কেন? অন্যদের থেকে মুসলমানদের মৌলিক পার্থক্য হ'ল আক্বীদার পার্থক্য। সে আক্বীদা হ'ল কালেমায়ে শাহাদত। যার প্রথমাংশ হ'ল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই' এবং দ্বিতীয় অংশ হ'ল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ 'মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল'। তিনি রাসূল মাত্র নন; বরং ১ লক্ষ ২৪ হাযার নবী-রাসূলের মধ্যে তিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল।[৩০] তাঁর মাধ্যমেই দ্বীন পূর্ণতা লাভ করেছে এবং ইসলাম আল্লাহ মনোনীত একমাত্র মানবধর্ম হিসাবে প্রেরিত হয়েছে *(মায়েদাহ ৫/৩)*। তিনিই সর্বশেষ রাসূল। তাঁর পরে আর কোন নবী আসবে না *(আহযাব ৩৩/৪০)*। তিনি বলেন, 'আমার পরে আমার উম্মতের মধ্যে ৩০ জন মিথ্যা নবীর আবির্ভাব ঘটবে। প্রত্যেকে নিজেকে আল্লাহ্র নবী বলে ধারণা করবে। অথচ আমিই শেষনবী। আমার পরে কোন নবী নেই'।[৩১] তিনি আরও বলেন, 'নবীদের তুলনা একটি সুন্দর পাকা দালানের ন্যায়, যাতে একটি ইটের জায়গা মাত্র খালি ছিল। আমিই সেই ইট এবং আমার মাধ্যমেই নবীদের সিলসিলা শেষ হয়ে গিয়েছে'।[৩২] তিনি বলেন, 'অন্যান্য নবীগণ এসেছিলেন স্ব স্ব গোত্র ও সম্প্রদায়ের জন্য। কিন্তু আমি প্রেরিত হয়েছি সমস্ত সৃষ্টিকুলের জন্য'।[৩৩] হাদীছে জিব্রীলে প্রশ্নোত্তর পর্বে 'ইসলাম কি?' এমন এক প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ইসলাম' হ'ল এই যে, তুমি সাক্ষ্য দিবে এ বিষয়ে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং সাক্ষ্য দিবে যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল'।[৩৪] অন্য হাদীছে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমাকে অন্যদের সঙ্গে লড়াইয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অতক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল...'।[৩৫]

---

৩০. আহযাব ৩৩/৪০; আহমাদ হা/২২৩৪২; মিশকাত হা/৫৭৩৭, ছহীহ।

৩১. আবুদাউদ হা/৪২৫২; মিশকাত হা/৫৪০৬ 'ফিৎনা সমূহ' অধ্যায়।

৩২. বুখারী হা/৩৫৩৫; মুসলিম হা/২২৮৬; মিশকাত হা/৫৭৪৫ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়।

৩৩. সাবা ৩৪/২৮; বুখারী হা/৩৩৫; মুসলিম হা/৫২১; মিশকাত হা/৫৭৪৭ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়।

৩৪. মুসলিম হা/৮; মিশকাত হা/২।

৩৫. বুখারী হা/৭২৮৪; মুসলিম হা/২২; মিশকাত হা/১২।

অন্য হাদীছে এসেছে, ‘যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করল। যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহ্র অবাধ্যতা করল। মুহাম্মাদ হ’লেন লোকদের মধ্যে (মুমিন ও কাফিরের) পার্থক্যকারী।[৩৬]

বলা বাহুল্য যে, কালেমায়ে শাহাদাতের প্রথমাংশে তাওহীদ তথা আল্লাহ্র একত্ববাদ এবং দ্বিতীয়াংশে রিসালাতে মুহাম্মাদী তথা খতমে নবুওয়াতের স্বীকৃতিদানের মাধ্যমেই একজন মানুষ ইসলামে দাখিল হ’তে পারে, নইলে নয়। তাঁকে শেষনবী হিসাবে বিশ্বাস করার উপরেই নির্ভর করে মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্য ও অগ্রগতি। নির্ভর করে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ দ্বীন হওয়া ও কুরআনের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব হওয়া। অতএব মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে শেষনবী মানতে অস্বীকারকারী কিংবা তাতে সন্দেহ পোষণকারী ব্যক্তি নিঃসন্দেহে কাফির ও জাহান্নামী।

কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, নবুঅতের বিপুল মর্যাদায় ঈর্ষান্বিত হয়ে দুনিয়াপূজারী কিছু ব্যক্তি যুগে যুগে নিজেদেরকে নবী হিসাবে দাবী করেছে। রাসূলের জীবন সায়াহ্নে ইয়ামনে আসওয়াদ আনাসী ও ইয়ামামাতে মুসায়লামা কাযযাব এবং রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরপরই নাজদে তুলায়হা আসাদী ও ইরাকে সাজা‘ নাম্নী জনৈকা মহিলা ‘নবী’ হবার দাবী করে। প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর (রাঃ) এসব ভণ্ডনবীদের সমূলে উৎখাত করেন। অতঃপর প্রায় তেরশো বছর পরে বর্তমান ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর যেলার বাটালা মহকুমাধীন ‘ক্বাদিয়ান’ নামক উপশহরে জন্মগ্রহণকারী মির্যা গোলাম আহমাদ ক্বাদিয়ানী (১৮৩৫-১৯০৮) ১৮৯১ সালের ২২শে জানুয়ারী নিজেকে ‘মসীহ ঈসা’ ও ১৮৯৪ সালের ১৭ই মার্চ ‘ইমাম মাহ্দী’ এবং ১৯০৮ সালের ৫ই মার্চ তারিখে নিজেকে ‘নবী’ হিসাবে ঘোষণা দেন। ১৮৮৯ সালের ২৩শে মার্চ তারিখে তার নিজ নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত দলের নাম রাখা হয় ‘আহমাদিয়া জামা‘আত’। বর্তমানে এরা বলছে, ‘আহমাদিয়া মুসলিম জামাত’। বিদেশে এই জামা‘আতের প্রধান ঘাঁটি হ’ল লণ্ডনে এবং ইসরাঈলের বন্দর নগরী হাইফাতে। ইসরাঈল রাষ্ট্রের জন্মের পূর্ব থেকেই তারা ঐ কেন্দ্র থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সেবা করত। বাংলাদেশে এদের মূল ঘাঁটি ঢাকার বখশীবাজারে

৩৬. বুখারী হা/৭২৮১; মিশকাত হা/১৪৪ ‘কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা’ অনুচ্ছেদ।

আলিয়া মাদরাসার পাশে। জানা যায়, ঢাকায় তাদের মোট ৭টি উপাসনালয় এবং সারা দেশে মোট ১৩০টি সেন্টার রয়েছে। তাদের বই ও পত্রিকা বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে প্রচার করা হয়। AM টিভি নামক স্যাটেলাইট চ্যানেলের মাধ্যমে তারা কুরআনের বিকৃত ব্যাখ্যা সারা দুনিয়ায় প্রচার করে।

ভারত উপমহাদেশের উপর চেপে বসা ইংরেজ দখলদারদের বিরুদ্ধে আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামের নেতৃত্বে পরিচালিত 'জিহাদ আন্দোলন' যখন সামাজিক রূপ লাভ করে, তখন বৃটিশ যুলুমশাহীর বিরুদ্ধে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক উত্থানকে অংকুরে বিনাশ করার জন্য কুচক্রী ইংরেজরা গোলাম আহমাদ ক্বাদিয়ানীকে তাদের দাবার ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করে। অতঃপর তার মাধ্যমে খতমে নবুওয়াতের আক্বীদায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে মুসলিম ঐক্যে ফাটল ধরানোর এবং তাদের দৃষ্টিকে আপোষে ঝগড়া লাগানোর দিকে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা চালায়। এজন্য তারা অর্থের বিনিময়ে অনেক মুসলিম বুদ্ধিজীবীকে কাজে লাগায়। বৃটিশের দালাল এই ভণ্ডনবী ঐ সময় ফৎওয়া প্রচার করে যে, 'ইংরেজ শাসন মুসলমানদের জন্য আসমানী রহমত স্বরূপ। ...অতএব তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হারাম'। তিনি বলেন, 'বৃটিশ হুকুমত আমার জন্য তরবারি স্বরূপ। ...আল্লাহ এই হুকুমতের সাহায্যে ও সমর্থনে ফেরেশতা নাযিল করেন'।

মুবাহালা ও ভণ্ডনবীর মৃত্যু : ১৩১০ হিজরীর ১০ই যুলক্বা'দা মোতাবেক ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে পূর্ব পাঞ্জাবের খ্যাতনামা আহলেহাদীছ আলেম মাওলানা আব্দুল হক গযনভী এই ভণ্ডনবীর বিরুদ্ধে 'মুবাহালার'-র ঘোষণা দেন। অন্যদিকে 'ফাতেহে ক্বাদিয়ান' 'শেরে পাঞ্জাব' 'অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স'-এর সেক্রেটারী মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১৮৬৮-১৯৪৮) প্রদত্ত চ্যালেঞ্জের পর চ্যালেঞ্জের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে ১৯০৭ সালের ১৫ই এপ্রিলে উক্ত ভণ্ডনবী বাধ্য হয়ে চ্যালেঞ্জ কবুল করে পাল্টা 'মুবাহালা'-র ঘোষণা দেয় এবং বলে যে, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার ও ছানাউল্লাহ্‌র মধ্যে ফায়ছালা করে দাও এবং তোমার দৃষ্টিতে প্রকৃত অশান্তি সৃষ্টিকারী ও মিথ্যুককে সত্যবাদীর জীবদ্দশাতেই দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নাও'।

দু'দু'জন খ্যাতনামা আহলেহাদীছ আলেমের সাথে মুবাহালার ফলশ্রুতি হ'ল এই যে, আল্লাহ পাক এই মিথ্যানবীকে সত্যবাদীদের জীবদ্দশাতেই ন্যাক্কারজনক মৃত্যু দান করেন এবং ১৯০৮ সালের ২৬শে মে সকাল ১০-টায় লাহোরে প্রচণ্ড কলেরায় যখন তার মৃত্যু হয়, তখন তার মুখ দিয়ে পায়খানা বের হচ্ছিল। অতঃপর দাফনের উদ্দেশ্যে কাদিয়ান নিয়ে যাবার পথে লাহোরের আহমাদিয়া বিল্ডিং থেকে রেল স্টেশন পর্যন্ত মির্যার দুর্গন্ধময় লাশের উপরে ইট-পাথর, ময়লা-আবর্জনা, বিষ্ঠা ও পায়খানা এমনভাবে বর্ষিত হয় যে, বিশ্ব ইতিহাসে কোন কাফিরের প্রতি এত লাঞ্ছনা ও অবমাননার কথা জানা যায় না। উল্লেখ্য যে, কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে দেউবন্দ সহ উপমহাদেশের অন্যান্য হানাফী ওলামায়ে কেরামের দৃঢ় ভূমিকা ছিল নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। বর্তমানেও দেশের হানাফী ও আহলেহাদীছ সকল ওলামায়ে কেরাম কাদিয়ানীদের 'কাফের' ঘোষণার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

দেশে দেশে কাদিয়ানী : ইহূদী-খ্রিষ্টান চক্রের লালিত-পালিত মির্যা কাদিয়ানী যে হাদীছে বর্ণিত ৩০ জন মিথ্যা নবীর অন্যতম ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেকারণ হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর কঠোর নীতির অনুসরণে এ যাবত পৃথিবীর অন্ততঃ ৪০টি মুসলিম দেশে এদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা হয়েছে। ১৯৭৪ সালে 'রাবেতা আলমে ইসলামী'র উদ্যোগে মক্কায় অনুষ্ঠিত ১৪৪টি রাষ্ট্র ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং ১৯৮৮ সালে ইরাকে অনুষ্ঠিত 'ওআইসি' শীর্ষ সম্মেলনে এদেরকে 'কাফির' ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশে ১৯৮৫ সালে এবং ১৯৯৩ সালে সুপ্রীম কোর্টের দু'টি মামলার রায়ে এদেরকে 'অমুসলিম' হিসাবে গণ্য করা হয়। ১৯৯৭ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারীতে ঢাকার সোবহানবাগ মসজিদে অনুষ্ঠিত বিরাট মুছল্লী সমাবেশে প্রেসিডেন্ট শাহাবুদ্দীনের উপস্থিতিতে মসজিদে নববীর সম্মানিত খতীব ড. আব্দুর রহমান আল-হুযায়ফী এদেরকে 'কাফির' ঘোষণা করে বলেন, এদেরকে যারা মুসলমান মনে করে তারাও 'কাফির'। এতদিন পরে বর্তমান জোট সরকার তাদের যাবতীয় বই ও প্রকাশনা নিষিদ্ধ করে এ বিষয়ে প্রথম সরকারী পদক্ষেপ রাখলেন। এজন্য আমরা সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। এক্ষণে দাবী জানাই শুধু বই নিষিদ্ধ করে নয়, এদেরকে অনতিবিলম্বে 'কাফির' ঘোষণা করে কাদিয়ানী বিতর্ক শেষ করুন। অমুসলিম সংখ্যালঘু হিসাবে অন্যদের

ন্যায় এরাও দেশে বসবাস করুক, আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু ইসলামের নাম নিয়ে প্রতারণা করলে এবং ইসলামের ও ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালালে এদেরকে মুসলমানেরা বরদাশত করবে না। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন![৩৭]

আহলেহাদীছ আন্দোলন

১৬. আহলেহাদীছ আন্দোলন

'আহ্ল' অর্থ অনুসারী, হাদীছ অর্থ বাণী। আল্লাহ্র বাণী ও রাসূলের বাণী উভয়কে 'হাদীছ' বলা হয়। 'আহলুল হাদীছ' বা আহলেহাদীছ অর্থ কুরআন ও হাদীছের অনুসারী। জীবনের সকল দিক ও বিভাগে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী ব্যক্তিকে 'আহলুল হাদীছ' বা 'আহলেহাদীছ' বলা হয়। আহলেহাদীছ হওয়ার জন্য আহলেহাদীছ পিতামাতার সন্তান হওয়া শর্ত নয়। বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারকে মেনে নেওয়াই হ'ল আহলেহাদীছ হওয়ার মৌলিক শর্ত। সংকীর্ণ দুনিয়াবী স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবার ভয়ে যদি কোন ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ মেনে চলা হয় ও কোন ক্ষেত্রে অমান্য করা হয় বা এড়িয়ে চলা হয়, তাহ'লে সেটি পূর্ণাঙ্গ আহলেহাদীছ হওয়ার পরিচায়ক নয়। ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম ও হাদীছপন্থী ওলামায়ে কেরাম সকলেই আহলুল হাদীছ ছিলেন, আজও আছেন, পরবর্তীতেও থাকবেন ইনশাআল্লাহ।

রাজনৈতিক বিভক্তি ও মাযহাবী দলবাজির কারণে কিছুসংখ্যক লোক বিগতযুগেও যেমন নিরপেক্ষভাবে ছহীহ হাদীছের অনুসরণ থেকে দূরে থেকেছে ও মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে, আজও তেমনি করে চলেছে। তারা বিগত যুগে ইসলামী বিধানের দ্বিতীয় উৎস হাদীছের মতনের মধ্যে বিভিন্ন শব্দ বা বর্ণ ঢুকিয়ে কিংবা সনদের মধ্যে দুর্বল রাবী থাকার কারণে হাদীছ যঈফ গণ্য হওয়ার অজুহাতে হাদীছ শাস্ত্রকে একদিকে যেমন জনগণের নিকটে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলার চেষ্টা করে, অন্যদিকে তেমনি জাল ও যঈফ হাদীছের উপরে ভিত্তি করে নিজেদের দুনিয়াবী স্বার্থ হাছিলের অপচেষ্টা চালায়। কিন্তু

---

৩৭. ৭ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা ফেব্রুয়ারী ২০০৪।

ইমাম মালেক, আহমাদ, বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য আহলুল হাদীছ বিদ্বানগণের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে কুচক্রীদের অপতৎপরতা নস্যাৎ হয়ে যায় এবং ছহীহ হাদীছ সমূহ বাছাই হয়ে সংকলিত আকারে জনসমক্ষে উপস্থাপিত হয়। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) সহ চার ইমাম তাই দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে গিয়েছেন, 'যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, জেনো সেটাই আমাদের মাযহাব'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, আমি তোমাদের নিকটে দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। তোমরা কখনোই বিভ্রান্ত হবে না যতদিন তোমরা ঐ দু'টি বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে। আর তা হ'ল : আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ'। দলবাজ ও স্বার্থবাদীরা সর্বদা মুসলিম উম্মাহকে ঐ দু'টি বস্তু থেকে পৃথক করতে চেয়েছে ও তাদের মনোযোগকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে। এই অপচেষ্টায় তারা অনেকখানি সফল হয়েছে দু'দল লোকের মাধ্যমে। এক- স্বার্থদুষ্ট রাজনীতিক বা সমাজ নেতাদের মাধ্যমে, দুই- সরলসিধা অথবা দুনিয়াদার আলেমদের মাধ্যমে। এই সকল আলেম একদিকে যেমন কুরআনের তাফসীরের নামে নিজ নিজ রায় ও কল্পনার আলোকে কুরআন ব্যাখ্যা করেন। অন্যদিকে তেমন স্ব স্ব মাযহাবী ফিক্বহ বা ফৎওয়ার বিরোধী ছহীহ হাদীছ সমূহকে সুকৌশলে এড়িয়ে গিয়ে নিজ নিজ দলীয় অবস্থানকে মযবুত করার অহেতুক কোশেশ করেন। কোন অবস্থাতেই নিজ দলীয় ফিক্বহের ফৎওয়া পরিত্যাগ করে নিরপেক্ষভাবে ছহীহ হাদীছের অনুসারী হ'তে তারা রাযী নন। এইসব তৎপরতার বাইরে গিয়ে এবং কোন নির্দিষ্ট বিদ্বানের অন্ধ অনুসারী মুক্বাল্লিদ না হয়ে ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিরপেক্ষ অনুসারী হওয়ার আহ্বান জানিয়ে হাদীছপন্থী বিদ্বানগণ ইসলামের প্রথম যুগ থেকে এযাবত দেশে দেশে যে দাওয়াত পরিচালনা করে আসছেন, সেটাই ইতিহাসে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' নামে পরিচিত।

পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি। এই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ও উক্ত নৈতিক ভিত্তির উপরে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হয়ে একজন প্রকৃত 'আহলেহাদীছ' আল্লাহ্র পথে স্বীয় জানমাল কুরবানী করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। তার সম্মুখে আল্লাহ্র

ভালবাসা ও রাসূলের আনুগত্য ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির নিঃশর্ত তাক্বলীদের পর্দা থাকে না। রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত পথে চলে সে কেবলই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও তার মদদ কামনা করে। 'হক' যার কাছ থেকেই পাওয়া যায়, তাকেই সে সম্মান করে ও 'হক' অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করে। সে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ 'অহি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে চূড়ান্ত সত্যের মানদণ্ড হিসাবে বিশ্বাস করে। মানুষের ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগত 'রায়' যদি উক্ত মহাসত্যের বিরোধী হয়, তাহ'লে সে তা নিঃসংকোচে পরিত্যাগ করে এবং অহি-র বিধানের নিকটে আত্মসমর্পণ করে। মানবিক জ্ঞানকে সে অহি-র ব্যাখ্যাকারী বলে মনে করে, বিরোধকারী হিসাবে নয়।

আহলেহাদীছদের এই নির্ভেজাল ও দৃঢ়চিত্ত ঈমান সুবিধাবাদী লোকদের হৃদয়ে চিরকাল কম্পন সৃষ্টি করেছে। তাই তারা ছলে-বলে-কৌশলে সর্বদা আহলেহাদীছ আন্দোলনকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করেছে। যুগে যুগে অসংখ্য তাবেঈ বিদ্বান, মুহাদ্দেছীনে কেরাম ও মুজতাহিদ আইম্মায়ে দ্বীন এইসব দুনিয়াদার পাশব শক্তির কুটকৌশলের শিকার হয়ে জীবন উৎসর্গ করেছেন। তবুও যুগে যুগে এ আন্দোলন চলেছে, এখনও চলছে, ক্বিয়ামত পর্যন্ত চলবে ইনশাআল্লাহ। এই আন্দোলন না থাকলে ইসলাম তার আদি রূপ হারিয়ে ফেলত। ইমাম আবুদাঊদ (রহঃ) তাই বলেছেন, আহলেহাদীছ জামা'আত যদি পৃথিবীতে না থাকত, তাহ'লে ইসলাম দুনিয়া থেকে মিটে যেত'।

দুর্ভাগ্য, বর্তমানে আহলেহাদীছ আন্দোলনের অগ্রগতি দেখে কিছু লোকের নতুন করে গাত্রদাহ শুরু হয়েছে। বিগত যুগের ন্যায় তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই মহান আন্দোলনের বিরোধিতা করে চলেছেন। বিশেষ করে ইসলামপন্থী বলে পরিচিত বিদ্বানদের গা-জ্বালা যেন একটু বেশী। তারা আহলেহাদীছ আন্দোলনকে কটাক্ষ ও তাচ্ছিল্য করে চলেছেন। তাদের পরিচালিত কয়েকটি মাসিক পত্রিকার লক্ষ্যই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের বিরুদ্ধে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলা। শরৎচন্দ্র যেমন মুসলমান ও বাঙ্গালীকে পৃথক জাতি হিসাবে গণ্য করে উপন্যাস লিখেছেন, এইসব ইসলামপন্থী বিদ্বানদের কেউ কেউ এখন 'মুসলমান' ও 'আহলেহাদীছ'কে পৃথক সম্প্রদায় হিসাবে আখ্যায়িত করছেন। এদের মূর্খতা দেখে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়। অথচ নিজেরা 'সুন্নী' হবার দাবীদার হয়েও চার মাযহাব মান্য করাকে 'ফরয'

বলেন। অথচ মানেন একটি মাযহাব। আবার তার মধ্যেও রয়েছে পীরপূজা ও তরীকা পূজার ভাগাভাগি। এইসব ফের্কাবন্দী ছেড়ে সকলকে ছহীহ হাদীছের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার মেনে নেবার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানায় যে আন্দোলন, সেই মহতী আহলেহাদীছ আন্দোলনকেই এঁরা বলেন 'লা-মাযহাবী' আন্দোলন। অথচ আসল ও আদি মাযহাব বা চলার পথ কেবল এঁদের কাছেই রয়েছে। বিরোধীদের এ হামলা ভিতর-বাহির সবদিক দিয়েই চলছে। সাংগঠনিক অগ্রগতি দুর্বল করার জন্য তারা যেমন অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা শুরু করেছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে দমন করার জন্য তেমনি আমাদের মারকাযসমূহে সরকারীভাবে তল্লাশী হয়েছে। সেই সাথে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র থেকেও অপপ্রচার শুরু হয়েছে। সম্প্রতি 'হিন্দুস্তান টাইমসে'র এক খবরে বাংলাদেশে ৪টি জঙ্গীবাদী সংগঠনের মধ্যে 'আহলেহাদীছ'-এর নামও এসেছে। অথচ এটা যে একেবারেই ভিত্তিহীন ও ডাহা মিথ্যা, সেটা কে-না জানে?

আমরা সকল বিষয়ে কেবল আল্লাহ্র উপরেই ভরসা করছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন![৩৮]

১৭. আন্দোলনই মুখ্য

ইসলামের প্রথম যুগে সৃষ্ট বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ ও ফের্কাবন্দীর বিরুদ্ধে ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযামের মাধ্যমে আহলেহাদীছ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। মূলতঃ ৩য় খলীফা হযরত ওছমান (রাঃ)-এর মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করেই উম্মত বিভক্ত হয়। তাদের মধ্যকার রাজনৈতিক বিভক্তি ও পারস্পরিক দ্বন্দ্ব জন্ম দেয় উছূলী বিতর্কের ও ফিক্বহী মতপার্থক্যের। যা পরবর্তীতে বিভিন্ন মাযহাবী নামে স্থায়ী সামাজিক রূপ ধারণ করে আজও বেঁচে আছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, আমার উম্মত ৭৩ ফের্কায় বিভক্ত হবে। তার মধ্যে ৭২ ফের্কাই জাহান্নামে যাবে একটি ফের্কা ব্যতীত। তারা হ'ল ঐ সকল ব্যক্তি, যারা আমার ও আমার ছাহাবীগণের আজকের দিনে অনুসৃত নীতি ও আদর্শের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে।[৩৯] তাবেঈ বিদ্বান ইবনুল মুবারক বলেন, প্রথমেই সৃষ্ট চারটি ভ্রান্ত

---

৩৮. ৫ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ২০০২।

৩৯. তিরমিযী হা/২৬৪১, সনদ হাসান; হাকেম হা/৪৪৪।

ফের্কা থেকে ৭২টি ফের্কার সূচনা হয়েছে। সেগুলি হ'ল : (১) **খারেজী :** কিতাবুল্লাহকে বাদ দিয়ে তৃতীয় পক্ষকে শালিশ মানার কারণে তাদের মতে আলী (রাঃ) ও মু'আবিয়া (রাঃ) উভয়ে কাফির। কবীরা গোনাহগার তাদের নিকটে মুসলমান কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী এবং তাদের রক্ত হালাল। তারা বিশ্বাস, স্বীকৃতি ও কর্ম তিনটিকেই ঈমানের মূল হিসাবে গণ্য করেন। ফলে (২) **শী'আ :** আলীই একমাত্র আইনসম্মত খলীফা। পূর্বের তিন খলীফাই ছিলেন যালিম ও কাফির। বরং মিক্বদাদ, আবু যর গিফারী ও সালমান ফারেসী ব্যতীত বাকী সকল ছাহাবী কাফির (৩) **মুর্জিয়া :** আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ) উভয়ে মুমিন। কবীরা গোনাহগার ব্যক্তির আমলের হিসাব ক্বিয়ামত পর্যন্ত প্রলম্বিত থাকবে। আমল ঈমানের অংশ নয় এবং আমল ঈমানের উপরে কোন প্রভাব ফেলে না। ঈমানের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। অতএব আবুবকর (রাঃ)-এর ঈমান ও অন্যদের ঈমান সমান। এরা 'শৈথিল্যবাদী' নামে পরিচিত। (৪) **ক্বাদারিয়া :** তাক্বদীর অস্বীকারকারী এই দলের মতে তাক্বদীর বলে কিছু নেই। মানুষ নিজেই তার অদৃষ্টের স্রষ্টা।

বলা বাহুল্য বাংলাদেশে উপরোক্ত ভ্রান্ত আক্বীদাসমূহ কমবেশী চালু রয়েছে। তন্মধ্যে শৈথিল্যবাদী মুর্জিয়া আক্বীদার লোক, যারা লাগামহীনভাবে গোনাহ করে ও ভাবে যে, আমাদের ঈমান ঠিক আছে, আমরা জান্নাত পাব, এই দলের লোক সংখ্যা বেশী। সেই সাথে চরমপন্থী খারেজী আক্বীদার লোক যারা কবীরা গোনাহগার মুসলমানদের কাফির বলে ও তাদের রক্ত হালাল মনে করে এবং সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করাকে প্রকৃত জিহাদ মনে করে- এদের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩৭ হিজরী থেকে শুরু হওয়া আক্বীদা ভাঙ্গনের এই স্রোত প্রতিরোধের জন্য ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযাম সর্বাত্মক আন্দোলন শুরু করেন। তাঁরা ঈমানের সঠিক ব্যাখ্যা এবং ঈমান ও আমলের পারস্পরিক সম্পর্ক পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেন। তাঁদের ব্যাখ্যার সার-সংক্ষেপ হ'ল নিম্নরূপ :

হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বিত নাম হ'ল ঈমান, যা সৎকর্মে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও গোনাহে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। বিশ্বাস ও স্বীকৃতিই হ'ল মূল এবং কর্ম হ'ল শাখা। কোন কবীরা গোনাহগার মুমিন ঈমান হ'তে খারিজ

নয়। সে তওবা না করে মারা গেলেও স্থায়ীভাবে জাহান্নামী নয়। গোনাহের কারণে ঐ ব্যক্তি পাপী বা 'ফাসিক্ব' হ'লেও ঈমানহীন কাফির নয়। তারা বলেন, চার খলীফা নিঃসন্দেহে মুমিন ও উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জায়েয নয়; বরং তাদের হেদায়াতের জন্য দো'আ করতে হবে। ভাল-মন্দ প্রত্যেক মুসলমানের পিছনে ছালাত আদায় করা জায়েয। তারা বলেন, মানুষের ভাল-মন্দ ভাগ্যলিপি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। তবে যেহেতু মানুষ তা জানে না, সেহেতু তাকে তাক্বদীরে বিশ্বাস রেখে সঠিক পথে তাদবীর করে যেতে হবে। তাদের এই ছহীহ আক্বীদা প্রচারের ফলে খারেজী ও শী'আদের চরমপন্থী আক্বীদার হামলা থেকে যেমন মানুষ রেহাই পায়, তেমনি মুর্জিয়াদের শৈথিল্যবাদী ঈমান-এর স্বেচ্ছাচারিতা হ'তে মানুষ সতর্ক হয়। অনুরূপভাবে ক্বাদারিয়াদের ভুল ব্যাখ্যার ফলে জীবনে চলার পথে ব্যর্থতার গ্লানিতে হতাশাগ্রস্ত মানুষ আত্মহত্যার পথ ছেড়ে পুনরায় নতুনভাবে জীবন গড়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে।

এভাবে বিদ'আতী আলেমদের থেকে উক্ত ছহীহ আক্বীদার অনুসারীদের নামীয় ও দলীয় স্বাতন্ত্র্য স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে। ইতিহাসে এঁরাই আহলুল হাদীছ, আহলুস সুন্নাহ, আহলুল আছার, আহলুল হক ইত্যাদি নামে পরিচিত। তবে ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) ও তাবেঈ বিদ্বান ইমাম শা'বী প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ী ছাহাবায়ে কেরামের জামা'আতকে ও তাঁদের উত্তরসুরীদেরকে 'আহলুল হাদীছ' বলা হয়। এই নামকরণের মাধ্যমে একটি বিষয় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, মুসলমানদের জন্য মূল অনুসরণীয় হ'ল কুরআন ও হাদীছ, অন্য কিছু নয়। ছাহাবায়ে কেরামের পরে যুগে যুগে যারা তাঁদেরই বুঝ অনুযায়ী কুরআন-হাদীছ বুঝবেন ও স্ব স্ব জীবনের সকল দিক ও বিভাগ গড়ে তুলতে সদা সচেষ্ট থাকবেন, কেবল তাঁরাই হবেন 'আহলেহাদীছ' এবং জাহান্নাম হ'তে মুক্তিপ্রাপ্ত দল। এখানে রক্ত, বর্ণ, ভাষা ও দুনিয়াবী পদমর্যাদার কোন মূল্য নেই।

বর্তমানে বাংলাদেশে পৃথিবীর সর্বাধিক সংখ্যক আহলেহাদীছের বসবাস। *ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ।* কিন্তু এই বিশাল সম্ভাবনাময় মানবসম্পদকে আমরা দেশে তাওহীদ ও সুন্নাহ্‌র পক্ষে সত্যিকারের জনশক্তি হিসাবে ব্যবহার করতে পেরেছি কি? নিশ্চিতভাবেই পারিনি। ফলে আহলেহাদীছ-এর অনেকে এখন

নির্দ্বিধায় বস্তুবাদী আন্দোলন করেন। এমনকি ইসলামের নামে শিরকী ও বিদ‘আতী দলসমূহে যোগ দিতেও দ্বিধা করেন না। এই দুঃখজনক পরিস্থিতি ক্রমেই ঘোরতর পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। আমরা দাওয়াত-এর চাইতে যেন দলাদলিকেই বেশী প্রাধান্য দিচ্ছি। এদেশের রাজনৈতিক ময়দান যেমন পরলোকগত নেতার ইমেজকে পুঁজি করে চলছে, বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকা যেভাবে ব্যক্তির চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, আহলেহাদীছ আন্দোলন নিঃসন্দেহে তার বিপরীত। এখানে ছহীহ আক্বীদা ও আমলের প্রচার ও প্রসার এবং সমাজ জীবনে তার বাস্তবায়ন প্রচেষ্টাই হ’ল মূল বিষয়। লক্ষ্য থাকে স্রেফ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। কিন্তু আমরা কি সে লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছি?

এক্ষণে আমাদের সিদ্ধান্তে আসতে হবে যে, আমরা আন্দোলনের জন্য সংগঠন করব, নাকি সংগঠনের জন্য আন্দোলন করব? যদি সিদ্ধান্ত দ্বিতীয়টি হয়, তবে সেটা হবে স্রেফ ফের্কা মাত্র। আমরা মনে করি ফের্কা নয়, আন্দোলনই মুখ্য। আমরা আহলেহাদীছকে একটি আপোষহীন জিহাদী আন্দোলন বলে বিশ্বাস করি। শিরক ও বিদ‘আতের মূলোৎপাটনে এবং সঠিক ইসলামের পথপ্রদর্শনে ছাহাবায়ে কেরামের রেখে যাওয়া এই পবিত্র আন্দোলনকেই আমরা আমাদের পরকালীন মুক্তির অসীলা হিসাবে বেছে নিয়েছি। এই লক্ষ্যে যারা একমত হবেন, আমরা তাঁদেরকে স্বাগত জানাই। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন![৪০]

১৮. আহলেহাদীছের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার

বর্তমানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু আত্মগর্বী, হিংসুক ও ঝগড়াটে ব্যক্তি সর্বত্র ‘আহলেহাদীছ’-এর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে চলেছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোর দেখিয়ে তারা আহলেহাদীছকে পিষে মারতে চান। আহলেহাদীছকে ‘বাতিল’ আখ্যায়িত করে তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করে অশালীন ভাষায় লিখিত বিভিন্ন লিফলেট ও বই-পুস্তিকা তারা বাজারে ছড়াচ্ছেন। বিভিন্ন ধর্মীয় মাহফিলে এখন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আহলেহাদীছকে টার্গেট করে বক্তব্য রাখা হচ্ছে ও জনগণকে ক্রমেই তাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা হচ্ছে। কোন কোন স্থানে তাদের মসজিদ ভেঙ্গে দেওয়া হচ্ছে। তাদেরকে মারপিট করা

---

৪০. ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, জুলাই ২০০৩।

হচ্ছে এবং মিথ্যা মামলায় হয়রানি করা হচ্ছে। কেউ নতুন আহলেহাদীছ হ'লে তার বিরুদ্ধে রীতিমত অত্যাচার ও সমাজিক বয়কট শুরু করা হচ্ছে। এমনকি আহলেহাদীছ পাঠাগারে আগুন লাগিয়ে কুরআন-হাদীছ সহ কিতাবপত্র পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। অথচ শত শত লোক খ্রিষ্টান হয়ে যাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে কোন বক্তব্য নেই। হাতে গণা কয়টি মাত্র ধর্মীয় বা ইসলামপন্থী পত্রিকার যেন বড় লক্ষ্য হয়েছে আহলেহাদীছের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা। আজকাল অনুরূপ একটি মাসিকের পক্ষ থেকে ঢাকা সহ বিভিন্ন শহরে দেওয়াল লিখন দেখা যাচ্ছে। যেখানে তাদের মতানুযায়ী ফৎওয়া সমূহ লিখে তারা প্রচার করছেন বহু অর্থ ব্যয় করে। যার অধিকাংশ বক্তব্য কুরআন ও ছহীহ হাদীছের স্পষ্ট বিরোধী। তাদের এইসব দেওয়াল লিখন পড়ে বহু লোক যেমন বিভ্রান্ত হচ্ছে, তেমনি আপোষে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আমরা অতীব দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এসব করে কেবল কিছু মানুষকে সাময়িকভাবে 'হক' থেকে দূরে রাখা যাবে, কিন্তু হক-এর দাওয়াতকে স্তব্ধ করা যাবে না। আল্লাহ্র পসন্দনীয় কোন না কোন বান্দার মাধ্যমে হক যাহির হয়ে যাবেই এবং তা কবুল করার জন্য তাঁরই নির্বাচিত বান্দারা ছুটে আসবেন চুম্বকের মত। কম থাক বেশী থাক ক্বিয়ামত পর্যন্ত এ দল থাকবেই। নিন্দুকদের নিন্দাবাদকে তারা পরোয়া করবে না। 'তারা সর্বদা হক-এর উপরে বিজয়ী থাকবে...'।[৪১] হাদীছে বিজয়ী বলতে আখেরাতে বিজয়ী বুঝানো হয়েছে। নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা (আঃ) কেউই দুনিয়াবী দিক দিয়ে বিজয়ী ছিলেন না। তথাপি তাঁরাই ছিলেন প্রকৃত বিজয়ী, হকপন্থী ও মানবতার আদর্শ পুরুষ।

উক্ত হকপন্থী ও মুক্তিপ্রাপ্ত দল কারা? এর জবাবে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর উস্তাদ আলী ইবনুল মাদীনী (রহঃ) বলেন, তারা হ'ল 'আহলুল হাদীছ জামা'আত'। চার ইমামের অন্যতম ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, 'তারা যদি আহলুল হাদীছ না হয়, তাহ'লে আমি জানিনা তারা কারা'? ইমাম আবুদাঊদ (রহঃ) বলেন, 'আহলুলহাদীছ জামা'আত যদি দুনিয়ায় না থাকত, তাহ'লে ইসলাম দুনিয়া থেকে মিটে যেত'। 'বড় পীর' বলে খ্যাত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) 'নাজী' দল হিসাবে আহলেসুন্নাত ওয়াল

৪১. মুসলিম হা/১৯২০; মিশকাত হা/৫৫০৭।

জামা‘আতের বর্ণনা দেওয়ার পর বলেন, ‘তাদের কোন নাম নেই একটি নাম ব্যতীত। সেটি হ’ল ‘আহলুল হাদীছ’। অতঃপর তিনি বলেন, বিদ‘আতীদের লক্ষণ হ’ল আহলেহাদীছদের গালি দেওয়া ও বিভিন্ন বাজে নামে তাদেরকে সম্বোধন করা। এগুলো সুন্নাতপন্থীদের বিরুদ্ধে তাদের দলীয় যিদ ও অন্ত র্জ্বালার বহিঃপ্রকাশ ভিন্ন কিছুই নয়’। ইবনু হাযম আন্দালুসী বলেন, আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা‘আত যাদেরকে আমরা হকপন্থী বলেছি, তারা হ’লেন, (১) ছাহাবা (২) তাবেঈন (৩) আহলুল হাদীছগণ (৪) ফক্বীহগণের মধ্যে যারা তাদের অনুসারী হয়েছেন যুগে যুগে আজকের দিন পর্যন্ত এবং (৫) প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ঐ সকল আম জনসাধারণ, যারা তাঁদের অনুসারী হয়েছেন’। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, শুধুমাত্র মুহাদ্দিছগণ নন, বরং তাঁদের নীতির অনুসারী আম জনসাধারণও ‘আহলুল হাদীছ’ নামে সকল যুগে কথিত হ’তেন এবং আজও হয়ে থাকেন।

দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ইসলাম এসেছিল আরব বণিক ও মুহাদ্দিছ ওলামায়ে দ্বীনের মাধ্যমে এবং তা রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই এসেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। ৬০১ হিজরী মোতাবেক ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বাংলাদেশে সামরিক বিজয়ের অনেক পূর্বে এদেশে ইসলাম এসেছিল, যা ছিল কুরআন ও হাদীছ ভিত্তিক মূল আরবীয় ইসলাম। যার প্রভাব ছিল মুসলমানদের সার্বিক জীবনে। আজও কোন কিছুর সন্ধান না পাওয়া গেলে বলা হয় ‘বিষয়টির হদিস মিলছে না’। এ থেকে অনুমান করা চলে যে, এদেশের মুসলিম সমাজ জীবনে এক সময় ছিল হাদীছের ব্যাপক প্রভাব। কিন্তু তুর্কী বিজয়ের ফলে মধ্য এশিয়া থেকে আগত সাধক-দরবেশদের মাধ্যমে ও রাজশক্তির ছত্রছায়ায় পরবর্তীতে বাংলাদেশে যে ইসলাম প্রচারিত হয়, তা ছিল মূল আরবীয় ইসলাম থেকে বহুলাংশে পৃথক।

ভারতগুরু শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী বলেন, ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বে কোন মুসলমান নির্দিষ্টভাবে কোন একজন ইমামের মাযহাবের তাক্বলীদের উপর সংঘবদ্ধ ছিল না’। তিনি দুঃখ করে বলেন, বর্তমান সময়ে বিশ্বের প্রায় সকল অঞ্চলে তুমি মুসলমানদের দেখবে যে, তারা বিগত কোন একজন মুজতাহিদের অনুসরণ করে থাকে। তারা মনে করে যে, একটি মাসআলাতেও যদি ঐ বিদ্বানের তাক্বলীদ হ’তে সে বেরিয়ে আসে, তাহ’লে

হয়তবা সে মুসলিম মিল্লাত হ'তে খারিজ হয়ে যাবে। ঐ বিদ্বান যেন একজন নবী, যাকে তার নিকটে প্রেরণ করা হয়েছে'। সুলায়মান নাদভী বলেন, 'আহলেহাদীছ'-এর নামে উপমহাদেশে যে আন্দোলন চলছে, বাস্তবে তা নূতন কোন বিষয় নয়। বরং পুরানো পদচিহ্নের অনুসরণ মাত্র'। তিনি বলেন, এ আন্দোলনের সবচেয়ে বড় ফলাফল এই যে, ইত্তেবায়ে নববীর যে জাযবা হারিয়ে গিয়েছিল, তা পুনরায় সৃষ্টি হয়েছে। জিহাদের যে আগুন ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, তা আবার জ্বলে উঠেছে'। আব্দুল মওদূদ বলেন, কালচক্রে বাঙ্গালী জেহাদীরা আহলেহাদীছ, লা-মাযহাবী, মওয়াহেদ, মুহম্মদী, গায়ের মুকাল্লিদ প্রভৃতি নামে চিহ্নিত হয়েছিল'। দরগাহ ও খানক্বাহ্র বিলাসী পীর-ফকীরেরা সেদিন বৃটিশ-ভারতকে 'দারুল ইসলাম' ফৎওয়া দিয়ে নিশ্চিন্তে ছিলেন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার তাই পরিষ্কারভাবে 'ওয়াহ্হাবী আন্দোলন'কে ব্রিটিশ রাজত্বে মুসলমানদের 'প্রথম মুক্তি সংগ্রাম' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। ভারতবর্ষের জিহাদ আন্দোলন মূলতঃ আহলেহাদীছগণের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিল এবং ওয়াহ্হাবী ও আহলেহাদীছকে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' অর্থে বুঝানো হ'ত। মাওলানা মুহাম্মাদ হোসায়েন বাটালভী (মৃঃ ১৯২০) নিরীহ আহলেহাদীছগণকে ইংরেজের জেল-যুলুমের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য নিজস্ব প্রচেষ্টায় 'ওয়াহ্হাবী ও আহলেহাদীছ এক নয়'- সেকথা ইংরেজ সরকারকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। একারণে সমস্ত আহলেহাদীছ জামা'আতকে ইংরেজের অনুগত প্রমাণ করার জন্য কোন কোন মহল থেকে ব্যর্থ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়, তা ঐতিহাসিকভাবে ভুল প্রমাণিত।

অতএব বালাকোট, বাঁশের কেল্লা, মুল্কা, সিত্তানা, পাঞ্জতার, আম্বেলা, চামারকান্দ, আস্তমাস্ত ও আন্দামানের রক্তাক্ত স্মৃতি সমূহ, জেল-যুলুম, ফাঁসি, সম্পত্তি বাযেয়াফ্ত, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও কালাপানির অবর্ণনীয় নির্যাতনে পোড়া নিখাদ তাওহীদবাদী বাংলাদেশের অন্যূন আড়াই কোটি আহলেহাদীছ সহ উপমহাদেশের বর্তমানে প্রায় ৬ কোটি আহলেহাদীছ জনগণ সেই জিহাদী উত্তরাধিকারের নাম। যেকোন মূল্যে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারকে অক্ষুণ্ন রাখার চিরন্তন শহীদী কাফেলার নাম। ইংরেজের কুফরী হুকুমত উৎখাতের পর ১৯৪৭ থেকে যা এখন সমাজ সংস্কারের জিহাদে রূপলাভ করেছে।

কেবল শিখ ও ইংরেজদের বিরুদ্ধেই আহলেহাদীছদের জিহাদ ছিল না, বরং শিরক ও বিদ‘আত মিশ্রিত প্রচলিত লৌকিক ইসলামকে পরিশুদ্ধ করে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মূল ইসলামের প্রচলন ঘটানোর জন্য কথা, কলম ও সাংগঠনিক জিহাদ ছিল আপোষহীন। যা তাদেরকে বিরোধীদের চক্ষুশূলে পরিণত করেছিল। আজও সেই বিদ্রূপবান ও অত্যাচার তাদেরকে প্রতিনিয়ত সহ্য করতে হচ্ছে। তাই আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে, আমরা সকল যুলুম বরদাশত করব, কিন্তু কোন অবস্থাতেই ‘হক’ ছাড়তে প্রস্তুত নই।

উল্লেখ্য যে, আহলেহাদীছের প্রকৃত পরিচয় তার নির্ভেজাল আক্বীদা, আমল ও ইখলাছের মধ্যে নিহিত। তার পিতৃ পরিচয়, বিদ্যা-বুদ্ধি ও সামাজিক পদমর্যাদার মধ্যে নয়। অতএব ‘হে অকল্যাণের নিশাচররা পিছিয়ে যাও! হে কল্যাণের অভিযাত্রীরা এগিয়ে চল’! জান্নাতের সুগন্ধি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। পরিশেষে দেশের বিবেকবান জনগণের নিকটে বিষয়গুলি ভেবে দেখার ও প্রশাসনকে নিরপেক্ষভাবে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন! আমীন![৪২]

১৯. তাবলীগী ইজতেমা

তাবলীগী ইজতেমা’৯৮ সবেমাত্র শেষ হ’ল (২৬ ও ২৭শে ফেব্রুয়ারী)। নওদাপাড়ার মাটি ধন্য হ’ল লক্ষ মুমিনের পদস্পর্শে। রাজশাহী মহানগরী প্রকম্পিত হ’ল গগনভেদী তাকবীর ধ্বনিতে। উচ্চকিত হ’ল অযুত কণ্ঠের প্রাণোৎসারিত দাবী **‘সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর’**। অহি-র বিধান অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ার আকুল আবেদন জানালেন নেতৃবৃন্দ। সেমতে প্রস্তাব পাস করলেন সকলে। মানুষের ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঢেলে সাজানোর উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে পূর্ব নির্ধারিত বিষয়াবলীর উপরে সারগর্ভ ভাষণ সমূহ পেশ করলেন দেশ ও বিদেশের খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম ও বিদ্বানমণ্ডলী। নিজেদের রচিত বিভিন্ন মাযহাব, তরীকা, ইজম ও মতবাদ ভুলে সকলকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী মহাজাতিতে পরিণত হওয়ার উদাত্ত আহ্বান

৪২. ৭ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা মে ২০০৪।

জানালেন নেতৃবৃন্দ। ধর্মহীন বৈষয়িকতা ও বৈষয়িকতাহীন ধর্ম কোনটাই যে মানবজীবনে প্রকৃত কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না, সেটা বুঝিয়ে দিলেন তাঁরা। ইসলাম আল্লাহ প্রেরিত 'দ্বীনে কামেল', যাতে মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগের অভ্রান্ত হেদায়াত মওজূদ রয়েছে। ইসলামের অনুসারীগণ তাদের সার্বিক জীবন সে অনুযায়ী গড়ে তুলবেন এটাই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র একান্ত দাবী। রাসূল (ছাঃ) কেবলমাত্র 'অহি'-র অনুসরণ করতেন ও তারই প্রচার করতেন। দীর্ঘ ২৩ বছরের নবুঅতী জীবনে তিনি অহি-র বিধানের বাস্তব রূপ দান করে গেছেন। তাঁর ইন্তেকালের পরে তাঁর উম্মতের ওলামা এবং সমাজ ও রাষ্ট্র নেতাদের উপরে অহি-র প্রচার ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। কিন্তু পেরেছি কি আমরা তা করতে? যদি না পারি, তবে সেটা হবে আমাদের ও আমাদের নেতৃবৃন্দের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা, বড় পরাজয়, বড় গ্লানি। কেননা জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার চাইতে বড় ব্যর্থতা মুমিনের জীবনে আর নেই।

'তাবলীগ' অর্থ পৌঁছে দেওয়া, প্রচার করা। ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ রূপে জাতির সম্মুখে পেশ করাই হ'ল তাবলীগের মূল উদ্দেশ্য। তাকে খণ্ডিত রূপে পৌঁছে দেওয়ার অর্থ প্রকৃত তাবলীগ নয়। অজানা অচেনা মুরব্বী ও বুযর্গদের নামে ভিত্তিহীন অলৌকিক কেরামতির গাল-গল্প, মাসায়েল বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ফাযায়েল-এর লোভ দেখানো, রাসূল (ছাঃ)-এর নামে মিথ্যা জাল ও যঈফ হাদীছের প্রচার, দ্বীনের নামে মুসলমানকে দুনিয়াবী জীবনের আলোচনা থেকে দূরে রাখা, অসংখ্য ফযীলতের জাল ফেলে বুদ্ধিমান লোকগুলিকে হতবুদ্ধি করে দেওয়া, 'চেল্লা'র নাম করে মাসের পর মাস মানুষকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা দেশের একটি সক্রিয় কর্মশক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে জাতীয় অর্থনীতিকে পঙ্গু করার হীন চক্রান্ত বাস্তবায়ন করা, জাল হাদীছ ও অপব্যাখ্যায় পূর্ণ একটি বিশেষ 'নেছাব'-এর জীবনভর পঠন-পাঠন ও সুকৌশলে কুরআন ও হাদীছের বিশুদ্ধ জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে দূরে সরিয়ে রাখার আত্মঘাতী ষড়যন্ত্র, ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের মত বৈষয়িক জীবনের দিক-নির্দেশনাহীন ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধহীন জিহাদ বিমুখ ধর্ম হিসাবে পেশ করার কুশলী প্রচারণা এবং তার পক্ষে ইসলাম বিরোধী দেশী ও বিদেশী শক্তিপুঞ্জের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতা, সবশেষে 'আখেরী মোনাজাতের' করুণ দৃশ্যের অবতারণা করে লাখো মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগানোর সূক্ষ্ম কৌশল কখনই প্রকৃত ইসলামের তাবলীগ নয়। বিদায় হজ্জে উপস্থিত লাখো মুসলিমকে নিয়ে যে

রাসূল (ছাঃ) 'আখেরী মোনাজাত' করলেন না, যে কাজ তাঁর জীবন সাথী খলীফাগণ করলেন না, সেই কাজ আমরা করছি বাংলাদেশের একটি বিশেষ স্থানে হজ্জের পরের মর্যাদা দিয়ে। যে কাজ রাসূল (ছাঃ) করেননি, খুলাফায়ে রাশেদীন করেননি, তা কখনোই 'দ্বীন' নয়। অতএব জান্নাত পেতে গেলে হুজুগ ছেড়ে ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জীবন পথের সন্ধান করতে হবে। সে পথেই দাওয়াত দিতে হবে। সেটাই হবে প্রকৃত তাবলীগ বা তাবলীগী ইজতেমা। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন! আমীন![৪৩]

শিক্ষা বিষয়ক

২০. ইল্‌ম ও আলেমের মর্যাদা

ইসলাম টিকে থাকে আলেমদের মাধ্যমে। আলেমগণ হ'লেন আল্লাহ প্রেরিত অহি-র ইলমের ধারক, বাহক ও প্রচারক। হকপন্থী আলেমদের মাধ্যমেই যুগ যুগ ধরে দ্বীন বেঁচে আছে ও আগামীতেও থাকবে। 'আল্লাহকে সত্যিকার অর্থে ভয় করেন আলেমগণ' *(ফাত্বির ৩৫/২৮)*। 'যারা আলেম ও যারা আলেম নয়, তারা কখনোই সমান নয়' *(যুমার ৩৯/৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি যে কুরআন শিক্ষা করে ও অন্যকে শিক্ষা দেয়'।[৪৪] তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি ইল্‌ম শিক্ষার জন্য রাস্তায় বের হয়, আল্লাহ তাকে জান্নাতের রাস্তাসমূহের মধ্যে একটি রাস্তা বের করে দেন। ফেরেশতারা ইল্‌ম অন্বেষণকারী ব্যক্তির সন্তুষ্টির জন্য তাদের পাখা সমূহ বিছিয়ে দেয়। আলেমের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করে আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবাই, এমনকি পানির মধ্যকার মাছগুলিও। একজন ইবাদতকারীর উপরে একজন আলেমের মর্যাদা পূর্ণিমা রাতে তারকারাজির উপরে চন্দ্রের মর্যাদার ন্যায়। আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী। নবীগণ কোন দীনার ও দিরহাম রেখে যাননি। তাঁরা রেখে গেছেন (আল্লাহ প্রেরিত অহি-র) ইল্‌ম। যে ব্যক্তি সেই ইল্‌ম অর্জন করেছে, সে ব্যক্তি যথেষ্ট অর্জন করেছে'।[৪৫] অন্যত্র তিনি বলেন, 'আবেদের উপরে আলেমের মর্যাদা তোমাদের উপরে আমার মর্যাদার ন্যায়'। অতঃপর

৪৩. ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৮।

৪৪. বুখারী হা/৫০২৭; মিশকাত হা/২১০৯।

৪৫. আহমাদ হা/২১৭৬৩; তিরমিযী হা/২৬৮২; মিশকাত হা/২১২, সনদ হাসান।

তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা মণ্ডলী এবং আসমান ও যমীনবাসী এমনকি গর্তের পিপীলিকা ও পানির মধ্যকার মাছ পর্যন্ত জনগণকে সুশিক্ষা দানকারী আলেমের জন্য দো‘আ করে থাকে’।[৪৬] তিনি বলেন, ‘যে ব্যক্তি ইল্ম শিক্ষার পথে অগ্রসর হয়, আল্লাহ তাকে জান্নাতের পথ প্রদর্শন করেন’।[৪৭] তিনি বলেন, ‘আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তাকে দ্বীনের বুঝ দান করেন’।[৪৮] অন্যত্র তিনি বলেন, ‘যে ব্যক্তি মানুষকে কল্যাণের পথ দেখায়, সে ব্যক্তি কল্যাণকারী ব্যক্তির সমপরিমাণ ছওয়াব পায়’।[৪৯] তিনি বলেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের মধ্য হ’তে ইল্মকে ছিনিয়ে নেবেন না। বরং তিনি ইল্ম উঠিয়ে নেবেন আলেম উঠিয়ে নেবার মাধ্যমে। ফলে এমন অবস্থা হবে যে, প্রকৃত আলেম আর কেউ থাকবে না। তখন লোকেরা জাহিল নেতাদের কাছে যাবে ও তাদের কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে। তখন তারা বিনা ইল্মে ফৎওয়া দিবে। ফলে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে ও অন্যকে পথভ্রষ্ট করবে’।[৫০] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যখন মানুষ মারা যায়, তখন তার সমস্ত আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তিনটি আমল ব্যতীত। ১- ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ ২- উপকারী ইল্ম ও ৩- সুসন্তান, যে তার জন্য দো‘আ করে’।[৫১] *তিনি আরও বলেন, মৃত্যুর পর ক্বিয়ামত পর্যন্ত বান্দার সাতটি আমল প্রবহমান থাকে। (১) দ্বীনী ইলম শিক্ষাদান (২) নদী-নালা প্রবাহিত করণ (৩) কূপ খনন (৪) খেজুর বৃক্ষ রোপণ (৫) মসজিদ নির্মাণ (৬) কুরআন বিতরণ (৭) এমন সন্তান, যে পিতার মৃত্যুর পর তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে’ (সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৯১৫)।*

আলেমদের মধ্যে স্তরভেদ রয়েছে। কেউ কুরআনের ইলমে পারদর্শী, কেউ হাদীছের ইলমে, কেউ উভয় ইলমে যোগ্য। যার মধ্যে কুরআন ও হাদীছের গভীর ইল্মের সাথে সাথে তাক্বওয়া, দূরদর্শিতা ও সূক্ষ্মদর্শিতার নে‘মত আল্লাহ পাক দান করেছেন, তিনিই সত্যিকার অর্থে ফক্বীহ, মুজতাহিদ ও মুফতী হওয়ার যোগ্যতা রাখেন। এই ধরনের হকপন্থী আলেমের সংখ্যা

---

৪৬. তিরমিযী হা/২৬৮৫; মিশকাত হা/২১৩, সনদ হাসান।
৪৭. বায়হাক্বী, শু‘আব হা/৫৭৫১; মিশকাত হা/২৫৫, সনদ ছহীহ।
৪৮. বুখারী হা/৭১; মুসলিম হা/১০৩৭; মিশকাত হা/২০০।
৪৯. মুসলিম হা/২৬৭৪; মিশকাত হা/১৫৮।
৫০. বুখারী হা/১০০; মুসলিম হা/২৬৭৩; মিশকাত হা/২০৬।
৫১. মুসলিম হা/১৬৩১; মিশকাত হা/২০৩।

চিরদিনই কম। যাদেরকে খুঁজে নিয়ে তাদের অনুসরণ করা জনগণের দায়িত্ব। বিশ্বের সকল প্রান্তে এ ধরনের স্বল্পসংখ্যক ক্ষণজন্মা ওলামায়ে কেরামের মাধ্যমেই দ্বীন যিন্দা রয়েছে। তারা কখনোই দ্বীনের অসম্মানকে বরদাশত করেননি। কোন অপশক্তির রক্তচক্ষুকে ভয় করেননি। যদিও আলেম নামধারী একদল কুচক্রী সর্বদা এঁদের বিরোধিতা করেছে এবং সকল প্রকার ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করেছে। চার ইমামের কেউই এদের হিংসা ও চক্রান্ত থেকে রেহাই পাননি। বিদ‘আতী ও দলবাজ আলেম ও রাষ্ট্রনায়কদের অত্যাচারে নির্যাতিত হয়েছেন ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হিঃ), হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হিঃ) প্রমুখ হাদীছপন্থী ওলামায়ে কেরাম।

পাক-ভারত উপমহাদেশে দিল্লীর অলিউল্লাহ পরিবার ও তাদের মুকুটমণি জিহাদী সন্তান শাহ ইসমাঈল (১৭৭৯-১৮৩১ খ্রিঃ)-এর অকুতোভয় লেখনী, বাগ্মিতা ও জিহাদী তৎপরতা সারা ভারতবর্ষকে আন্দোলিত করেছিল। দখলদার ইংরেজ ও তাদের এদেশীয় দালাল হিন্দু-মুসলমান জমিদার-নবাব-নাইটরা সর্বশক্তি নিয়ে হকপন্থী আলেমদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ঘুষ, চক্রান্ত, মিথ্যা অপবাদ, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদির মাধ্যমে এইসব সরল-সিধা দ্বীনদার মুজাহিদ ওলামায়ে কেরামকে নির্যাতিত ও নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল। বড় বড় বিলাসী পীরের সুরম্য প্রাসাদরাজি ও সমাধিসৌধ দেখা গেলেও বালাকোটের শহীদদের কবরের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী (১৭৮৬-১৮৩১ খৃ.) ও শাহ ইসমাঈলের লাশকে টুকরা টুকরা করে কাগান নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যাতে দুনিয়ার মানুষ তাদের কোন সন্ধান না পায়। তাদের সেদিনকার রক্ত আখরে লেখা শাহাদাতের সিঁড়ি বেয়েই আসে ছাদিকপুর পাটনার আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে শতবর্ষ ব্যাপী জিহাদ আন্দোলন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জেঁকে বসা অপশক্তি ছাড়াও ধর্মীয় ক্ষেত্রে জেঁকে বসা শিরক ও বিদ‘আতের শিখণ্ডীদের বিরুদ্ধেও ছিল তাঁদের জিহাদ। ফলে একদল নামধারী আলেম ছিল তাঁদের প্রধান গৃহশত্রু। এদের ফৎওয়ার শিকারে পরিণত হয়েছিলেন সেদিন এইসব হকপন্থী ওলামায়ে দ্বীন। লা-মাযহাবী, লা-দ্বীনী ইত্যাদি নামে সেদিন এঁদেরকে সমাজে কোণঠাসা করার চেষ্টা করা হয়েছিল। যাদের অবিরত জিহাদী তৎপরতায় অতিষ্ঠ হয়ে দখলদার ইংরেজ অবশেষে ভারত ছাড়তে বাধ্য হ’ল, সেই

জিহাদী আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামকে এখন ইংরেজের লাইসেন্সপ্রাপ্ত 'আহলেহাদীছ' নামের অধিকারী দল বলে কিছু সংখ্যক দুষ্টমতি আলেম আজও কালি-কলম খরচ করে চলেছেন। ধর্মের নামে মাযহাবী দলাদলি করে মুসলিম উম্মাহকে বিশেষ করে সুন্নী মুসলমানদেরকে অসংখ্য তরীকা ও মাযহাবে বিভক্ত করে যারা ফায়েদা লুটছেন। যারা স্ব স্ব মাযহাব ও তরীকা থেকে সামান্য বিচ্যুতিকে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাওয়ার শামিল মনে করেন, তাদের এই সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে গিয়ে মুসলিম উম্মাহকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী মহাজাতিতে পরিণত করার জন্য যে আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণকে সংগঠিত করার চেষ্টা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে, সেই মহান আন্দোলনের নামই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'। এই আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ওলামায়ে কেরাম চিরকাল হক-এর আওয়ায বুলন্দ করে গেছেন। আজও করে চলেছেন। ক্বিয়ামত অবধি এই দাওয়াত তারা দিয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। যে সকল হকপন্থী আলেম অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং দ্বীনে হক-এর পক্ষে সোচ্চার হবেন, আমরা সর্বদা তাঁদের পাশে থাকব। পূর্বকালের মুসলিম রাষ্ট্রনায়কদের ন্যায় আজও যদি কেউ কোন দ্বীনদার আলেমের অমর্যাদা করেন, তাহ'লে আমরা অবশ্যই তার প্রতিবাদ করি এবং আল্লাহপাকের নিকটে এর বিরুদ্ধে ফরিয়াদ জানাই। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন![৫২]

জাতীয় ইস্যু

২১. বিজয়ের মাস ও পার্বত্য চুক্তি

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে সেদিনের পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন বাংলাদেশ হিসাবে পৃথিবীর মানচিত্রে স্বতন্ত্র অবস্থান নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। রাজনৈতিক ও সামরিক বিজয়কেই সাধারণতঃ বিজয় হিসাবে দেখা হয়। কিন্তু মূল বিজয় সেখানেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং মানবতার স্বাধীন বিকাশের লক্ষ্যেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করা হয়। তার জন্য জান-মাল উৎসর্গ করা হয়। কিন্তু বিগত ২৬ বছর যাবৎ একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়েও আমরা কি উন্নত মানবতার স্বাধীন বিকাশে সক্ষম হয়েছি? পেরেছি কি

৫২. ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ২০০১।

একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে আমাদের জান-মাল ও ইয্যতের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে? পেরেছি কি বিদেশী চাপমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে নিজেদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখতে?

বিজয়ের এই আনন্দঘন মাসের ২ তারিখ মঙ্গলবারে আমরা আমাদের দেশের এক দশমাংশ পার্বত্য চট্টগ্রামকে ৩০ হাযার বাংলাদেশীর হত্যাকারী প্রতিবেশী দেশের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও লেলিয়ে দেওয়া 'শান্তি বাহিনী' নামক গুণ্ডাবাহিনীর হাতে সমর্পণ করেছি। সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্বত্য নাগরিকরা এ চুক্তি মেনে নেয়নি। তারা আজ বিজয়ের আনন্দে নয় বরং পরাজয়ের গ্লানিতে ও জান-মাল-ইয্যত হারানোর ভয়ে প্রতি মুহূর্তে শংকিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত। তাদের যুবক ছেলেরা মায়েদের কাছ থেকে দো'আ চেয়ে শেষ বিদায় নিচ্ছে তাদের স্বাধীন সত্তাকে অক্ষুন্ন রাখার লড়াইয়ের জন্য। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম নাগরিকের মতামতের বিরুদ্ধে গিয়ে কাশ্মীরের হিন্দু ডোগরা রাজা অন্যায়ভাবে কাশ্মীরকে ভারত ভুক্তির চুক্তিতে স্বাক্ষর করে কাশ্মীরের দুই তৃতীয়াংশকে ভারতের অধীনস্থ করে গেছে। এখন সেই রাজাও নেই ভারতের তৎকালীন নেতারাও নেই। কিন্তু আছে চুক্তির নোংরা ফসল হিসাবে স্থায়ী অশান্তি। কাশ্মীরী মুসলমানদের জান-মাল ও ইয্যত প্রতি মুহূর্তে লুটছে বিশ্বের তথাকথিত বৃহৎ গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের লেলিয়ে দেওয়া সেনাবাহিনী। সেখানে চলছে নিয়মিত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। আমাদেরও ভয় হয় পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ মাত্র আড়াই লাখ চাকমা নাগরিকের স্বার্থে সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঁচ লাখ মুসলমান ও আড়াই লাখ অন্য উপজাতিদের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে বর্তমান চুক্তির মাধ্যমে সেখানে কাশ্মীরের ন্যায় স্থায়ী রক্ত ঝরার ব্যবস্থা করা হ'ল কি-না। বর্তমান সরকার নির্দলীয় বা জাতীয় সরকার নয় বরং একটি দলীয় সরকার মাত্র। দলীয় রাজনীতির মারপ্যাঁচে তারা এখন দেশের এক তৃতীয়াংশ নাগরিকের সমর্থন নিয়ে সরকারে আছেন। তাই সরকারী দলের বাইরে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আবেগ অনুভূতি ও মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা জানালে সরকার বরং লাভবান হবে ও আগামীতে তারা অধিকাংশ জনগণের শ্রদ্ধা ও সমর্থন কুড়াতে সক্ষম হবে।

বিজয়ের এই মাসে আমরা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে দো'আ করি তিনি যেন আমাদের এই বিজয়ের আনন্দকে চিরকাল অক্ষুন্ন রাখেন এবং এই

বিজয়কে সত্যিকারের মানবতার বিজয়ে পরিণত করার জন্য আমাদেরকে তাওফীক দান করেন-আমীন![৫৩]

২২. বন্যায় বিপন্ন মানবতা

দেশের ৩৭টি যেলা বন্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে। হাযার হাযার মানুষ ও লক্ষ লক্ষ প্রাণী অসহনীয় কষ্টে ও অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশায় দিনাতিপাত করছে। ইতিমধ্যে পৌনে তিন শতাধিক মানুষ মারা গেছে। অন্যান্য প্রাণী ও গবাদিপশুর কোন হিসাব নেই। বন্যার পানি সরছে না। দুষিত পানি পান করে ব্যাপকহারে ডায়রিয়া ছড়িয়ে পড়েছে। পার্শ্ববর্তী দেশের পাহাড়ী ঢল, ফারাক্কার খোলা গেইটের উপচে পড়া পানির স্রোত ও সাথে আকাশ বন্যার ত্রিমুখী চাপে বাংলাদেশ ভূখণ্ডের আজ ত্রিশংকু অবস্থা। ...সর্বত্র সন্ত্রাস ও ব্যাপক চাঁদাবাজিতে অতিষ্ঠ জনগণ বন্যার্তদের জন্য সাহায্য চাওয়াকে কোনভাবে নিবে, সেটা আঁচ করেই হয়তবা কেউ ময়দানে নামার সাহস পাচ্ছে না। সরকারী সাহায্যের অবস্থা হ'ল 'খাজনার চাইতে বাজনা বেশী'। যা বাজেট রেডিও-তে শোনা যায়, তা আমলা ও ক্যাডারদের পার্সেন্টেজ বাদ দিয়ে বন্যার্তদের পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে কিছু তলানি থাকলেও থাকতে পারে। ফলে আল্লাহ ব্যতীত অসহায় বন্যার্তদের সত্যিকার অর্থে দেখার কেউ নেই। নদীমাতৃক বাংলাদেশ। ঝড়-বৃষ্টি-বন্যা এ দেশের সঙ্গী-সাথী। তার সাথে আছে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের অঘোষিত পানিযুদ্ধ। শুকনা মৌসুমে পদ্মার পান আটকে রেখে তারা আমাদেরকে শুকিয়ে মারে। আবার বর্ষা মৌসুমে পদ্মার বাড়তি পানি ছেড়ে দিয়ে আমাদেরকে ডুবিয়ে মারে। সেই সাথে রয়েছে আসামের পাহাড়ী ঢল। এরই মধ্যে ১২ কোটি মানুষকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। সকলেই বিষয়টি বুঝেন। আন্তর্জাতিক বিশ্বও বিষয়টি বুঝে। কিন্তু সবাই শক্তির পূজারী। গরীবের হক কথা শক্তিমানের হৃদয়কন্দরে আঘাত হানতে সক্ষম হয় না।

তাই আমাদেরকেই আমাদের ব্যবস্থা করতে হবে। অপরের করুণা ভিক্ষা নয়। আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে নিজেদের যা সম্পদ আছে, তাই নিয়ে বন্যা

---

৫৩. ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৭।

প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে হবে। যে সকল নৈতিক স্খলনের কারণে একটি জাতির উপরে আল্লাহ্র গযব নেমে আসে বলে হাদীছে উল্লেখিত হয়েছে, তার প্রায় সবগুলি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আমাদের সমাজে প্রকাশ পাচ্ছে। তাই বন্যা প্রতিরোধের চাইতে অনৈতিকতা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের প্রতি সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। সাথে সাথে সরকারের সকল প্রচার মাধ্যম এবং সকল ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনকে এ বিষয়ে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য তৎপর হ'তে হবে। সর্বোপরি নেতৃবৃন্দ ও দায়িত্বশীলগণকে ব্যক্তি জীবনে সৎ ও আমানতদার হিসাবে প্রমাণ করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন! আমীন![৫৪]

২৩. বন্যায় বিপর্যস্ত বাংলাদেশ

প্রায় আড়াই মাস যাবৎ স্থায়ী স্মরণকালের ভয়াবহতম সর্বগ্রাসী বন্যার ফলে বাংলাদেশের সার্বিক জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কোটি কোটি মানুষ হয়েছে দুর্গত ও দুর্দশাগ্রস্ত। অসংখ্য মানুষের জীবন ধারণের স্বাভাবিক ব্যবস্থা তছনছ হয়ে গেছে। বাসগৃহ ধ্বংস হয়েছে, জীবিকা বাধাগ্রস্ত হয়েছে, প্রায় অচল হয়ে পড়েছে জীবনের স্বাভাবিক গতি। পত্রিকান্তরে প্রকাশ কেবল সড়ক ও রেল যোগাযোগ খাতেই ক্ষতির পরিমাণ ২ হাযার ১শত কোটি টাকা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় ১৪ হাযার; যেগুলির সংস্কারের জন্য প্রয়োজন হবে ২১৬ কোটি টাকা। ফসলহানির পরিমাণ প্রায় ২০ লক্ষ টন। যার ফলে বর্তমান অর্থবছরে খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ ৪০ লক্ষ টনে দাঁড়াবে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

দীর্ঘস্থায়ী বন্যার কারণে রোগগ্রস্ত হয়েছে অসংখ্য মানুষ। মৃত্যুবরণ করেছে প্রায় সহস্রাধিক। আশ্রয় কেন্দ্র সমূহে ত্রাণ সামগ্রী ছিল অপ্রতুল। ফলে ক্ষুধার জ্বালায় মা তার আদরের দুলাল তিন দিনের শিশুপুত্রকে পর্যন্ত বিক্রি করে ক্ষুধা নিবারণে উদ্যত হয়েছিল। অপর মা একই কারণে তার দুই শিশু কন্যাকে নিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহুতি দিয়েছেন। জাতির এই চরম দুর্দিনেও এক শ্রেণীর এনজিও তাদের ঋণের কিস্তি পরিশোধে দুর্গতদের উপরে এমনকি

---

৫৪. ১ম বর্ষ, ১২তম সংখ্যা, আগষ্ট ১৯৯৮।

রিলিফের সামগ্রী বিক্রির জন্য চাপ প্রয়োগ করেছে। আর আত্মহত্যা করেছে জনৈক বোন। এটাই হ'ল দেশের রূঢ় বাস্তবতার কিছু ছিটেফোঁটা।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইতিপূর্বেও হয়েছে। কিন্তু এ বছরের ন্যায় ভয়াবহ ও এত প্রলম্বিত এবং এত মারাত্মক অবস্থার মুখোমুখি হ'তে হয়নি কখনো দেশবাসীকে। যদি প্রশ্ন করা হয় আমরা কেন বার বার প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হচ্ছি? আমাদের জীবনযাত্রা কেন বার বার ব্যহত হচ্ছে? যারা 'প্রকৃতির খেয়ালীপনাই এর জন্য দায়ী' বলেন, তারা নিজেদের হাতে সৃষ্ট সামাজিক অবক্ষয়কে পাশ কাটিয়ে যেতে চেষ্টা করেন, যা প্রকারান্তরে দায়িত্বহীনতার শামিল। অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য যে, মানুষের জ্ঞান ও বিবেক যখন অন্ধ হয়ে যায়, মানুষ যখন আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত নবী-রাসূলের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পাপ-পঙ্কিলতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পড়ে, মানুষের নৈতিকতাবোধ যখন একেবারে শূন্যের কোঠায় নেমে যায়, তখন ঐ জাতির উপরে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ নেমে আসে। ইতিপূর্বেও আল্লাহপাক বহু জাতিকে তাদের কৃতকর্মের ফলে সমূলে ধ্বংস করেছেন।

বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতি পূর্বের তুলনায় কোন অংশেই উন্নত নয়। বরং তার চাইতে অবনতিশীল। আড়াই বৎসরের শিশু কন্যা থেকে শুরু করে ৭০ বৎসরের বৃদ্ধাও এ দেশে নিরাপদ নয়। হত্যা, ধর্ষণ, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই এ দেশের নিত্যকার ঘটনা। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, ভিসিআর ও ডিশ এ্যান্টেনার নীল দংশন, অশ্লীল পত্র-পত্রিকা, টিভি-সিনেমার অশ্লীল ছবি প্রদর্শনই নৈতিক অবক্ষয়ের অন্যতম প্রধান কারণ। দেশের পেক্ষাগৃহ গুলোতে প্রতিনিয়ত ইংরেজী ছবির নামে রঙিন ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে। অথচ প্রশাসন এ ব্যাপারে নিশ্চুপ। যে দেশে সরকারের নাকের ডগায় প্রতিনিয়ত অশ্লীল ছবি প্রদর্শিত হয়, পুলিশের সামনে এমনকি পুলিশের দ্বারা আইন ও সমাজ বিরোধী কাজ হয়, যে দেশের নেতারা সন্ত্রাসীদের লালন করেন ও আশ্রয় দেন, সে দেশে সামাজিক উন্নতি আশা করা 'চোরকে চুরি করতে বলা আর মালিককে সজাগ থাকতে বলা'রই নামান্তর। কাজেই সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সংসদে গলা ফাটিয়ে বুলি আওড়ানোর কোন হেতুবাদ নেই। বরং সর্বাগ্রে নিজেরা সকল দুর্নীতি থেকে তওবা করে

শক্তভাবে বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করা আমাদের নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব। অতএব যার যা আছে সবকিছু নিয়ে দুর্দশাগ্রস্ত ভাইদের দুর্দশা লাঘবে এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

পরিশেষে পত্রিকার স্বার্থে সেপ্টেম্বর'৯৮ সংখ্যা বন্ধ রেখে অক্টোবর'৯৮ থেকে ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা শুরু হ'ল। বর্ষ শুরুতে আমরা আমাদের সকল লেখক-লেখিকা, গ্রাহক-অনুগ্রাহক, বিজ্ঞাপন দাতা ও এজেন্ট ভাই-বোনকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই এবং ভবিষ্যৎ পদযাত্রায় আল্লাহ্‌র তাওফীক কামনা করি- আমীন![৫৫]

২৪. ইসলামী শিক্ষার বিকাশ চাই

দেশে ইসলামী শিক্ষার সংকোচন নীতি প্রকাশ্যভাবেই চলছে। বিশ্বের প্রায় সকল দেশের সব ধরনের সরকারই যেন ইসলামকে ভীতির চোখে দেখে। এই ভীতির কারণ সম্ভবতঃ দু'টি। নৈতিক ও রাজনৈতিক। নৈতিক ভীতি এজন্য যে, ক্ষমতাসীন দল বা সরকার এবং সরকারী আমলাতন্ত্রের প্রধান একটি অংশ প্রায় সকল দেশেই নৈতিকতার বিচারে অত্যন্ত নীচু মানের হয়ে থাকেন। তারা ইসলামের উন্নত নৈতিকতাকে প্রশংসা করলেও তার বাস্তবায়ন কখনোই কামনা করেন না। বিশেষ করে ইসলামের ফৌজদারী আইনকে তারা দারুণ ভীতির চোখে দেখেন। দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনভাবে ইসলামী শিক্ষার বিকাশ ঘটলে মুসলিম উম্মাহ্‌র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটবে, যা বিশ্বের অমুসলিম সরকার ও রাষ্ট্রগুলির এবং তাদের সেবাদাস মুসলিম দেশসমূহের রাজনীতিক ও আমলাদের বড় অংশ মোটেই কামনা করেন না।

বৃটিশ আমল থেকেই উপমহাদেশে এ ষড়যন্ত্র চলে আসছে। কেবল জনগণের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য নামকাওয়াস্তে সরকারীভাবে প্রথম মাদরাসা শিক্ষা চালু করা হয়েছিল কলিকাতায় বৃটিশ আমলে ১৭৮০ সালে। যদিও তারা তাদের উপনিবেশ চিরস্থায়ী করার জন্য সে সময় অখণ্ড বাংলার ৮০ হাযার ছোট-বড় মাদরাসা কার্যতঃ বন্ধ করে দিয়েছিল। তারপর স্বাধীন পাকিস্তান

---

৫৫. ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৯৮।

হ'ল, স্বাধীন বাংলাদেশ হ'ল। কিন্তু ইসলামী শিক্ষার বিকাশ হয়নি। বরং ছলে-বলে-কৌশলে একে সর্বদা সংকুচিত করার চেষ্টা হয়েছে। যা এখন দৃষ্টিকটুভাবে প্রকাশ্যেই নযরে পড়ছে।

ইসলামী শিক্ষা মানুষের সার্বিক জীবন পরিচালনার জন্য সামগ্রিক উপাদান সমৃদ্ধ একটি সমন্বিত শিক্ষার নাম। ইংরেজ সরকার লর্ড মেকলের মাধ্যমে ১৯৩৬ সালে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাগতিক শিক্ষা থেকে পৃথক করে ধর্মীয় ও বৈষয়িক দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেন। এর মাধ্যমে তারা পরোক্ষভাবে ইসলামী শিক্ষাকে আধুনিক রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি বৈষয়িক ক্ষেত্রে অচল প্রমাণ করতে চাইলেন। পাখির একটি ডানা ভেঙ্গে দিলে তার যে অবস্থা হয়, ইসলামী শিক্ষাকে মাদরাসা শিক্ষার নামে নির্দিষ্ট একটি মাযহাবী ফিক্বহ, মানতেক ও হিকমতের মধ্যে বন্দী করে ইসলামকে বাস্তবে অনুরূপ পঙ্গু করে ফেলা হয়। 'মাদরাসা শিক্ষা' নামে ঐ অপূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষাই গত ৬৩ বছর যাবত চলে আসছে। বর্তমানে সেটুকুকেও সহ্য করতে না পেরে অবশেষে মাদরাসা সমূহ বন্ধ করে দেওয়ার বাস্তব প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে ২৫১টি মাদরাসার অনুদান বন্ধ হয়েছে। আরও কয়েক হাযার মাদরাসা বন্ধের প্রক্রিয়া চলেছে। শুধু মাদরাসা নয়, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে আজও 'আরবী' ও 'ইসলামী শিক্ষা' বিষয় খোলা হয়নি। যদিও তার নাম হ'ল বিশ্ববিদ্যালয়। অথচ প্রথম শ্রেণী থেকে স্নাতকোত্তর শ্রেণী পর্যন্ত সকল বিষয়ের সাথে ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা উচিত ছিল। কিন্তু কোন সরকারই সে উদ্যোগ নেয়নি। বরং সকলের কাছে যেন আরবী ও ইসলামী শিক্ষাই হ'ল সবচেয়ে অবহেলিত সাবজেক্ট। ফলে স্বাভাবিক জনরোষ ঠেকানোর জন্য রাজনৈতিক মোকাবিলার নামে 'মৌলবাদে'র জিগির তোলা হচ্ছে। অন্যদিকে শিক্ষাবোর্ড ও মন্ত্রণালয়ের কিছু আমলা ইসলামী শিক্ষা বিস্ত ারের বিরুদ্ধে সর্বদা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে।

শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশে ইসলামী শিক্ষার এই অবস্থা। অথচ শতকরা ৫০ ভাগ মুসলমানের দেশ মালয়েশিয়ায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষা সেদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার দু'টি প্রধান স্তম্ভ। সকল মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীর জন্য প্রাথমিক স্তর হ'তে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত 'ইসলাম শিক্ষা' এবং সকল

অমুসলিম ছাত্র-ছাত্রীর জন্য 'নৈতিক শিক্ষা' বাধ্যতামূলক। সে দেশের 'আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়' সারা বিশ্বে সুনাম কুড়িয়েছে। অথচ বাংলাদেশের একমাত্র সরকারী 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়'টি দিন দিন ধর্মহীনতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। মালয়েশিয়া ইসলামী শিক্ষা নিয়ে সম্মুখে এগিয়ে চলেছে। আর বাংলাদেশ ইসলামী শিক্ষা বাদ দিয়ে অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। নিরপেক্ষ চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই বলবেন যে, এদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ ও রাজনীতি-অর্থনীতির কোথাও কোন সুস্থতা ও উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না। সন্ত্রাস ও দুর্নীতি উপর থেকে নীচতলা পর্যন্ত সর্বত্র সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। লোনা পানি যেমন উর্বর মাটিকে বিনষ্ট করে দেয়, দুর্নীতির বিষাক্ত স্রোত তেমনি পুরা সমাজ দেহকে জ্বরাগ্রস্ত করে ফেলেছে। প্যারালাইসিসের রোগীর যেমন কোন অনুভূতি থাকে না, তেমনি দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজের উপর থেকে নীচু পর্যন্ত কারু যেন এখন আর কোন অনুভূতি নেই।

কেন নেই? কারণ একটাই। আমাদের মধ্যে দ্বীন নেই। ইসলামী সমাজ হ'ল ইলাহী দ্বীনভিত্তিক সমাজ। ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ ঠিক তার উল্টা। একারণে তারা ইসলামকে বরদাশত করতে পারে না। বর্তমানে সেই আদর্শিক সংঘাত প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে। এ সংঘাত রাজনীতি, অর্থনীতি, পরিবার ও সমাজের সর্বত্র ফুটে উঠছে। ইসলামী শিক্ষা সংকোচন তারই একটি অংশ মাত্র। অতএব সচেতন ব্যক্তি মাত্রকেই হুঁশিয়ার হ'তে হবে। নইলে তুরস্ক ও আলজেরিয়ার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি বাংলাদেশে হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়।

আমরা বিশ্বাস করি যে, ইসলামী শিক্ষার পূর্ণ বিকাশ সাধনের মধ্যেই বাংলাদেশের উন্নতি ও অগ্রগতি নিহিত। এমনকি এর মধ্যেই রয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার গ্যারান্টি। সরকার যদি ইসলামী শিক্ষার বিপরীতে অবস্থান নেয়, যা ইতিমধ্যেই অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেছে, তবে সেটা হবে একটা মারাত্মক ভুল। সরকার ও দেশবাসীর ভালভাবে জেনে রাখা আবশ্যক যে, প্রতিবেশী বা দূরদেশী কোন কাফির বা মুশরিক রাষ্ট্র বাংলাদেশ বা বাংলাদেশ সরকারের প্রকৃত বন্ধু নয়। আমাদের নিকটে আল্লাহ প্রেরিত মহান ইসলামের অমূল্য সম্পদ রয়েছে। মানবাধিকার, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা শিক্ষার জন্য আমাদেরকে অন্য কোন মোড়ল রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী থাকতে হবে

না। আমাদের জাতীয় সম্পদ আমাদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা খাতে তথা ইসলামী শিক্ষার পূর্ণ বিকাশের খাতে ব্যয় করতে হবে। মাদরাসা তথা ইসলামী শিক্ষার সংকোচন বন্ধ করতে হবে।

পরিশেষে আমরা মাদরাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার দ্বিমুখী ধারাকে সমন্বিত করে একক ইসলামী শিক্ষার পূর্ণ বিকাশ চাই। যে শিক্ষার বদৌলতে মুসলমান এক হাযার বছর যাবত বিশ্ববিজ্ঞানে নেতৃত্ব দিয়েছে, নেতৃত্ব দিয়েছে বিশ্ব রাজনীতিতে। সেই শিক্ষা ব্যবস্থা আবার ফিরিয়ে আনার জন্য আসুন সকলে নতুনভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন![৫৬]

২৫. বিপন্ন স্বাধীনতা

পানি চুক্তি ও পার্বত্য চুক্তির পর বর্তমানে প্রক্রিয়ারত করিডোর চুক্তি, সীমান্তে বিএসএফ-এর নিয়মিত হামলা, ফারাক্কা ও গোজলডোবা ব্যারেজ ও অন্যান্য বাঁধ সমূহের মাধ্যমে উজানে পানি শাসন, খরা ও বন্যা সৃষ্টি, অসম বাণিজ্য, প্রায় উন্মুক্ত চোরাচালান, অস্ত্র ও মাদক সরবরাহ, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, মুদ্রা পাচার, আদম পাচার, মেধা পাচার, দক্ষিণ তালপট্টি দখল, বেরুবাড়ী দখল, দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা সহ ছিট মহল সমস্যা, মুহুরীর চর দখল প্রক্রিয়া, সবশেষে গত ১৩ই আগস্ট'৯৯ রাতে রাজশাহী শহরে পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম পুলিশের কথিত দুঃসাহসিক গোপন অভিযান, সাথে সাথে ক্ষমতাসীন সরকারের উৎকট পরদেশ প্রীতি সবকিছু মিলিয়ে আজ এ প্রশ্ন আপনা থেকেই বেরিয়ে আসছে যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা কি সত্যিই বিপন্ন? নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্য যাই-ই থাকুক না কেন, আমরা একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক। স্বাধীনতা আছে বলেই আমরা স্বাধীনভাবে নিজেদের সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে পারছি। যদি মাটির স্বাধীনতা বিপন্ন হয়, তাহলে মাটির মানুষের স্বাধীনতা থাকবে কিভাবে? দুর্ভাগ্য এই যে, আমরা সাধারণ মানুষ নিজেদেরকে স্বাধীন ভাবি ও স্বাধীন মেযাজ নিয়ে চলাফেরা করি। কিন্তু যাদেরকে আমরা নির্বাচন করে সংসদে পাঠিয়ে দিই, তারা ওখানে গিয়ে বাস্তবে পরাধীন হয়ে যান। বিরোধী দলে থাকার সময় প্রচণ্ড দেশপ্রেমিক। ক্ষমতায় গেলেই হন পরদেশ তোষণকারী। এই ডিগবাজি খেলা চলছে প্রত্যেক সরকারের আমলে।

---

৫৬. ২য় বর্ষ, ১১তম সংখ্যা, আগস্ট ১৯৯৯।

অন্য দেশের পরোক্ষ শাসন-শোষণ ও চোখরাঙানীকে উপেক্ষা করে স্বাধীন নীতি-আদর্শ নিয়ে চলার মত শক্ত-সমর্থ ও সৎসাহসী সরকার এযাবত বাংলাদেশের ভাগ্যে জোটেনি। বরং যত দিন যাচ্ছে, তত যেন আমরা হতাশ হচ্ছি। গণতন্ত্রের নামে যে দলতান্ত্রিক রাজনীতি এদেশে চলছে, তাতে সৎ ও নিরপেক্ষ কোন লোক এদেশের শাসন ক্ষমতায় আসতে পারবে বলে মনে হয় না। যদি কেউ ভাগ্যক্রমে এসেও যান, তবে তিনি নিরপেক্ষ থাকতে পারেন না দলের কারণে। দলীয় শাসন কখনোই সুশাসন নয়। এরপরেও যদি সেই দলের নিকটে আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহিতার ভয় না থাকে, তবে তা হিংস্র বাঘের মত কেবল অন্য দলকে হামলা করতেই থাকে। হেন নোংরা কাজ নেই, যা তারা করতে পারে না। গত ২২শে আগস্ট'৯৯ বিরোধী দলীয় হরতালের দিন ঢাকায় একটি তরতাযা তরুণকে ফাঁকে পেয়ে হরতাল বিরোধী কয়েকজন ব্যক্তি চড়, কিল, ঘুষি মেরে ধরাশায়ী করল। বুকে-পিঠে-মুখে উপর্যুপরি লাথির আঘাতে ছেলেটি আর্ত চিৎকার করতে করতে একসময় যখন নিস্তেজ হয়ে পড়ল, তখন ঐ লোকগুলি অসহায় তরুণটির অমূল্য দু'টো চোখ তুলে নিয়ে হৈ হৈ করতে করতে চলে গেল। শত শত লোকের সামনে এই লোমহর্ষক কাণ্ড ঘটল। কিন্তু কিছুই করার নেই। ওরা যে দেশপ্রেমিক দলের লোক, স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি...। এর নাম যদি গণতন্ত্র হয়, তাহলে পশুতন্ত্র কাকে বলে আমরা জানি না। ধিক শত ধিক ঐ গণতন্ত্রের! যেখানে মানুষের জান-মাল ইযযতের কোন মূল্য নেই। যেখানে স্বাধীনভাবে মানুষ তার মত ও পথের বিকাশ ঘটাতে পারে না। যেখানে স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা নেই। নেই কোন নিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থা। আর তাই ঢাকা শহরে প্রাচীন ইসলামী পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পুনরায় চালু হ'তে যাচ্ছে বলে খবরে প্রকাশ। বলা বাহুল্য যে, পঞ্চায়েত আমলে ঢাকায় কোন খুন-ধর্ষণ, চুরি-ডাকাতি, চাঁদাবাজি, হাইজ্যাকিং ইত্যাদি ছিল না। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম হওয়ার পর এগুলো মহামারী আকারে রাজধানী সহ সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এক্ষণে আমাদের ভাবতে হচ্ছে, যে ব্যবস্থা দেশের জনগণের ঘুম হারাম করেছে। মা-বোনের ইযযত কেড়ে নিয়েছে। জান-মালের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ শাসন ও বিচার ব্যবস্থা নস্যাৎ করেছে। সেই অমানবিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য জনগণ কেন তাদের জান-মাল, সময়

ও শ্রম ব্যয় করবে? সত্যিকারের স্বাধীনতা সেটাই, যেখানে মানবতার বিকাশ ঘটে। পশুত্বের প্রসার ঘটানোর জন্য দেশ স্বাধীন হয়নি। বরং পশুত্ব পরাজিত হউক ও সর্বত্র মানবতার বিজয় ঘটুক- এটাই ছিল সকলের একান্ত কাম্য।

আমরা দেশের স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ দেখতে চাই। দেশের স্বাধীনতা কেবল তাদের হাতেই নিরাপদ হ'তে পারে, যারা দেশবাসীর আক্বীদা-আমল ও তাহযীব-তমদ্দুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যারা পার্শ্ববর্তী বা দূরবর্তী কোন অমুসলিম দেশের গৃহীত আদর্শকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসাবে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে চায়, তারা কখনোই স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি নয়। আজকের যুগ সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের যুগ। সাম্রাজ্যবাদীরা সর্বাগ্রে তাদের টার্গেটকৃত দেশের আক্বীদা-বিশ্বাসের উপর হামলা করে। এদেশের ইসলামী আক্বীদার বিরোধী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, সমাজতন্ত্র, খ্রিষ্টানী ধর্মনীতি, রাজনীতি ও অর্থনীতিকে যারা আপন মনে করে, তাদের হাতে এদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা কখনোই নিরাপদ নয়। অতএব কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে রক্ষার জন্য আমাদেরকে সর্বদা সচেতন থাকতে হবে। যেন কাশ্মীরের মত দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার শিকার আমাদের না হ'তে হয়।... আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন।[৫৭]

২৬. ভেসে গেল স্বপ্নসাধ!

মাসিক **আত-তাহরীক**-এর ৪র্থ বর্ষের প্রথম সম্পাদকীয় লিখতে হচ্ছে এমন এক সময় যখন আকস্মিক প্রলয়ংকরী বন্যায় দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৭টি যেলা বিশেষ করে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত যশোরের শার্শা উপযেলা ও 'বন্যামুক্ত এলাকা' বলে পরিচিত সাতক্ষীরা যেলা উজানের দেশ থেকে আসা অথৈ প্লাবনে ডুবে আছে। বন্যা ভাসিয়ে নিয়ে গেছে তাদের ভিটেমাটি, বাড়ী-ঘর ও মূল্যবান তৈজসপত্র, অতি আদরের গবাদিপশু এমনকি কোলের সন্তানটিকেও। ভেসে গেছে বাড়ির হাঁস-মুরগী, পুকুরের পোষা মাছ ও ঘেরের কোটি কোটি টাকার মৎস্য সম্পদ। একই গ্রামের একই মা-বাবার কাছ থেকে নিষ্ঠুর বন্যা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে ১৫, ৭ ও ৩ বছরের তিন তিনটি নাবালক সন্তানকে। বোবা হয়ে গেছে বাপ, বিলাপ করছে মা। কালকে যাদের সব ছিল, আজকে তারা নিঃস্ব বানভাসি। কাল যারা ভিক্ষা দিত, আজ তারা ভিক্ষাপ্রার্থী। কাল যাদের ঘরে

৫৭. ২য় বর্ষ, ১২তম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৯।

ছিল হাসি-কান্না ও আনন্দের কলরোল, আজ তাদের সেই সাজানো বাড়ি, গোছানো সংসারের চিহ্ন মাত্র নেই। হারিয়ে গেছে তাদের মুখের হাসি, হারিয়ে গেছে ভাষা, ভেসে গেছে তাদের সকল স্বপ্নসাধ। বিধ্বস্ত ঘর-বাড়ি, বিনষ্ট ফসলাদি, ক্ষুধার্ত গবাদিপশু ও দিশেহারা মানবতার আহাজারিতে ক্রমেই ভারী হয়ে উঠছে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের আকাশ-বাতাস।

কিন্তু কেন হঠাৎ এ বন্যা? কেউ বলছেন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কেউ বলছেন 'মা গঙ্গার ক্রোধ' কেউ বলছেন ভৌগলিক কারণেই এটা হয়েছে। অর্থাৎ উজানের দেশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বন্যা হয়েছে। সেকারণ বাংলাদেশেও বন্যা হয়েছে। এতে আর বিস্ময়ের কি আছে। যদি বলা হয়, তাহ'লে এতদঞ্চলে গত দু'শো বছরে এমন বন্যা হয়নি কেন? ভূগোলবিদগণ এ প্রশ্নের জবাব কি দিবেন জানিনা। তবে এবিষয়ে দলমত নির্বিশেষে সবাই একমত যে, আকস্মিক এ বন্যা উজান দেশ থেকে আসা বিপুল পানিরাশির ফল। গত ১৭ হ'তে ২১শে সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে একই সময়ে ব্যাপক বৃষ্টিপাত হয়। সে পানির তোড় সামাল দিতে না পেরে ফারাক্কা বাঁধের সকল গেইট খুলে দেওয়া হয়। নীচে পলিমাটি জমে যাওয়াতে ফারাক্কা বাঁধের মোট ১০৯টি স্লুইস গেইট-এর ৫২টি খোলা যায়নি। বাকী ৫৭টি গেইট দিয়ে অন্ততঃ ১৪ লাখ কিউসেক পানি একসাথে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়ায় চাপাই নবাবগঞ্জ, রাজশাহী, পাবনা, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি যেলা বন্যাকবলিত হয়। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, যদি ১০৯টি গেইটের সব ক'টি খুলে দেওয়া সম্ভব হ'ত, তাহ'লে ১৯৮৮ সালের মত ভয়াবহ বন্যায় ঢাকাসহ বাংলাদেশের ৩০টি যেলা বন্যাকবলিত হয়ে মহাবিপর্যয় ডেকে আনত। ফারাক্কার সকল গেইট একসঙ্গে খুলে দেওয়া সম্ভব না হওয়ায় বাধাগ্রস্ত ভীষণ স্রোত রুদ্র রোষে ফুঁসে উঠে গঙ্গার অন্যান্য শাখা-প্রশাখা যেমন ভাগীরথী ও তৎসংলগ্ন জলঙ্গী, মহানন্দা, সাপার, ভৈরব, চুন্নী, কোদলা, ধরলা, বেতনা, ইছামতি, সোনাই প্রভৃতি মরা ও আধামরা নদীর বাঁধভাঙ্গা পানি পশ্চিমবঙ্গের মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগনা প্রভৃতি যেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল ডুবিয়ে দেয় ও অন্ততঃ দেড় কোটি মানুষ সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমতাবস্থায় ১৮ই সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের ভাগীরথী, জলঙ্গী, মহানন্দা, ইছামতি ও ধরলা নদী ও পরবর্তীতে সোনাই নদীর বাঁধসমূহ কেটে দেওয়া হয়। ফলে প্রবল

স্রোতে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, মাগুরা, যশোর ও সাতক্ষীরার ভারত সীমান্তবর্তী এলাকাগুলি চোখের পলকে তলিয়ে যায়। তাই এ বন্যা প্রাকৃতিক নয়, বরং মনুষ্যসৃষ্ট বন্যা। যাদের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দ করার ক্ষমতা আমাদের নেই। বর্তমানে অন্য যেলাগুলিতে পানি যত কমছে, বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী যেলা সাতক্ষীরাতে পানি তত বাড়ছে। ফলে সমস্ত সাতক্ষীরা যেলা বর্তমানে বন্যায় তলিয়ে গেছে। নদী-নালা কম অথবা ভরাট এবং রাস্তা ও বাঁধের সংখ্যা বেশী হওয়ায় দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হ'তে যাচ্ছে। ফলে লাখ লাখ পানিবন্দী, ক্ষুধার্ত, অর্ধমৃত, আর্তমানবতার করুণ আহাজারিতে আকাশ-বাতাস ক্রমে ভারী হয়ে উঠছে।

মূলতঃ প্রথমে চাপাই নবাবগঞ্জ, রাজশাহী, পাবনা, সিরাজগঞ্জ এবং পরে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৭টি যেলাসহ মোট ১১টি যেলা এই ভয়াবহ প্লাবনের করাল গ্রাসে পতিত হয়েছে। প্রায় আড়াই কোটির বেশী মানুষ এই ভয়াবহ বন্যায় সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ও নিশ্চিহ্ন হয়েছে লাখ লাখ ঘরবাড়ি ও ফলনোন্মুখ সোনার ধান ও অন্যান্য ফসলাদি। মারা গেছে অসংখ্য গবাদি পশু, হাস-মুরগী ইত্যাদি। অনাহারে, সাপের কামড়ে, ডাকাতের হামলায় ও পানিতে ডুবে মারা গেছে অসংখ্য। যারা বেঁচে আছে বাঁধের টোলে, গাছের ডালে, রাস্তার মাচায় বা কলাগাছের ভেলায়, তারা রোগ ও ক্ষুধার যন্ত্রণায় আশ্রয়ের অভাবে অসহায়ভাবে মৃত্যুর প্রহর গুনছে। আসছে দুরন্ত শীত মৌসুম। মাঠে নেই ফসল, গোয়ালে নেই গরু-ছাগল, ডোবে নেই হাঁস-মুরগী, পুকুরে নেই মাছ, কি দিয়ে মানুষ জীবিকা নির্বাহ করবে...।

এক্ষণে প্রশ্ন : পশ্চিমবঙ্গের দেড় কোটি ও বাংলাদেশের আড়াই কোটি অন্যূন চার কোটি বনু আদমের উপরে কেন নেমে এল এই আকস্মিক মহাপ্লাবন? **এর একমাত্র জবাব : ফারাক্কা।** ফারাক্কা বাঁধের মাধ্যমে গঙ্গার স্বাভাবিক স্রোতধারাকে বাধাগ্রস্ত করার ফলশ্রুতিতে গঙ্গা ও তার শাখা নদী সমূহে পলিমাটি জমে গভীরতা হারিয়েছে। ফলে স্থলভাগের বৃষ্টিপাতের পানি এবং হিমালয়ের বরফগলা পানি ধারণের ক্ষমতা হারিয়ে সেখানে সর্বদা বন্যা প্রবণতা বিরাজ করছে। ফলে একটুতেই Over flow হয়ে পানি উপচে পড়ে

ও একদিকে বন্যা অন্যদিকে নদীভাঙ্গন চলে সমানে। সেই সঙ্গে এবারে যোগ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম কিনারে অবস্থিত বিহার ও উড়িষ্যা রাজ্যের বাঁধভাঙ্গা পানির স্রোত। ফলে ডুবছে মানুষ, ভাঙ্গছে ঘর-বাড়ি। বাজার-ঘাট, মসজিদ-মন্দির সবকিছু। এভাবে ফারাক্কার কারণে গঙ্গা-পদ্মা অববাহিকা অঞ্চলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে গ্রাম ও জনপদ। শুরু হয়েছে এক মহা মানব বিপর্যয়। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মানুষের আজ অভিন্ন সমস্যা হ'ল ফারাক্কা। অতএব গঙ্গা ও পদ্মার স্বাভাবিক স্রোতধারাকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। বাংলাদেশের মানুষ ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট নদী গবেষক কপিল ভট্টাচার্য ফারাক্কা বাঁধের ঘোর বিরোধী ছিলেন। যার জন্য তাকে ভারত সরকারের নানা প্রকার নিগ্রহের শিকার হ'তে হয়। এতদিনে তার কথাই সত্য প্রমাণিত হ'ল। প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এ ব-দ্বীপ এলাকায় প্রতিবছর বান-বর্ষা হয়েই থাকে। কিন্তু ফারাক্কার কারণে বন্যার এ ভয়াল রূপ প্রতিবছরই আঘাত হানবে বলে ধরে নেওয়া যায়।

উত্তরণের উপায় : ভারতের নেতাদের উদার হ'তে হবে। ভাটির দেশের মানুষ হিসাবে বাংলাদেশের মানুষকে মানুষ হিসাবে মূল্যায়ন করতে হবে। সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে তাদের বাঁচার স্বার্থে তাদের কেন্দ্রীয় সরকারের উপরে চাপ সৃষ্টি করে এই মরণ বাঁধ ফারাক্কা, গোজলডোবা, বরাক সহ ৫৪টি অভিন্ন নদীতে দেওয়া বাঁধগুলি গুঁড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। অতঃপর নদীসমূহের স্বাভাবিক স্রোতধারা থেকে ভারত ও বাংলাদেশ উভয়ের সহযোগিতায় 'পানি বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট' চালু করতে হবে। ফারাক্কা ব্যারেজ নির্মাণের বেশ কয়েক বছর পূর্বে জনৈক মার্কিন বিশেষজ্ঞ বলেছিলেন, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র দিয়ে প্রতি বছর প্রায় ১০০ কোটি একর ফিট পানি প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। এই পানিকে কাজে লাগিয়ে ভারত ও পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) উভয়েই লাভবান হ'তে পারে। কেবল মৌসুমী বৃষ্টিপাতের উপরে এখন যেভাবে তাদের নির্ভর করতে হয়, পদ্মার এই বিপুল পানিরাশির ব্যবহার তাদের সেই বৃষ্টি নির্ভরতাকে বিশেষভাবে কমিয়ে দিতে পারে। .. এই বিপুল পরিমাণ পানি দিয়ে প্রতিবছর প্রায় ৭ কোটি একর জমিতে পানি সেচ করা সম্ভব হবে'। এক্ষণে আমাদের প্রশ্ন : ভারতে কি কোন ঠাণ্ডা মাথার ও জনদরদী নেতা নেই? যাঁরা পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মানুষের প্রতি

সত্যিকারের দরদী হয়ে উপরোক্ত পানি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসতে পারেন?

পরিশেষে আমরা মনে করি, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বর্তমানে প্রলয়ংকরী বন্যা আমাদের অন্যায় কর্মের ফল হিসাবে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে নাযিলকৃত গযব স্বরূপ *(রূম ৩০/৪১)*। রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে কিছুসংখ্যক লোকের চরম বিলাসিতা ও পাপাচার এবং সীমাহীন দুর্নীতি ও সর্বগ্রাসী দুষ্কৃতির ফলে ভাল-মন্দ সকল পর্যায়ের মানুষ, পশু-পক্ষী ও প্রাণীকুল আজ আল্লাহ্র কঠিন গযবের শিকার হয়েছে। এমতাবস্থায় জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বন্যাদুর্গত সকল বনী আদমের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো ও এক মুঠো অন্ন হ'লেও তাদের সামনে তুলে ধরা এবং বন্যাপরবর্তী পুনর্বাসনে সহযোগিতা করা আমাদের সকলের নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব। আল্লাহ কবুল করলে আপনার-আমার দরদী মনের সামান্য দান আমাদের জাহান্নাম থেকে বাঁচার অসীলা হ'তে পারে। অতএব আসুন! আমাদের যার যা আছে, তাই নিয়ে বন্যাদুর্গত ভাই-বোনদের পাশে দাঁড়াই ও এর মাধ্যমে আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয় করি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন![৫৮]

২৭. ভাল আছি

জনৈক ভদ্রলোক ভাগিনার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ভগিনীর বাড়ীতে গিয়েছেন সান্ত্বনা দেবার জন্য। শোকার্ত লোকজনে ভরপুর বাড়ীর বাইরে বিষণ্ন ভগ্নিপতির সঙ্গে দেখা। যথারীতি সালাম বিনিময়ের পর অভ্যাসবশতঃ জিজ্ঞেস করলেন, ভাই কেমন আছেন? বোনাই জবাব দিলেন, ভালো আছি। যদিও ঘরে তখনও রয়েছে তার মৃত সন্তানের লাশ। প্রিয় পাঠক! আপনি যদি অনুরূপ জিজ্ঞেস করেন, তাহ'লে আমরাও বলব, ভাল আছি। কিন্তু আসলেই কি ভাল আছি? একবার কি তাকিয়ে দেখবেন আমাদের ঘরের মধ্যকার করুণ দশা! সভ্যতা-ভদ্রতা-মানবতা-ন্যায়বিচার সবকিছু মরে লাশ হয়ে আমাদের ঘরে পড়ে আছে। যা এখন দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে দেশে ও বিদেশে।

প্রথমেই দেখা যাক দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার দিকে। সেখানে চলছে সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্য। চলছে ঘুষ সন্ত্রাস, বখশিশ সন্ত্রাস, ভাউচার সন্ত্রাস,

---

৫৮. ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অক্টোবর ২০০০।

টেলিফোন সন্ত্রাস, টেণ্ডার সন্ত্রাস, ইনকাম ট্যাক্স সন্ত্রাস, অপহরণ ও মুক্তিপণ সন্ত্রাস এবং সর্বোপরি রয়েছে সশস্ত্র সন্ত্রাস। অতঃপর রয়েছে চাঁদাবাজি। নিজের জমিতে নিজের হালাল টাকায় বাড়ী করবেন, সেখানেও দিতে হবে মাস্তানী চাঁদা ও তাদের নেপথ্য নায়ক এলাকার নেতারূপী গডফাদারদের অদৃশ্য চাঁদা ও সেই সাথে রয়েছে সাদা-খাকী-ব্লু পোষাকীদের নিয়মিত মাসোহারা ও এককালীন চাঁদা। নইলে মিথ্যা মামলায় কারাগারে। যাবেন রাজনৈতিক ময়দানে? সেখানে মাস্তান ও সন্ত্রাসীদের কদর বেশী। কারণ লোভ ও ভয় দেখিয়ে ভোট আদায় করা এযুগের ট্রাডিশন। ফলে শান্তিপ্রিয় জনগণ ভোটের ব্যাপারে হতাশ। প্রিজাইডিং অফিসার টেবিলে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছেন এমন ছবি পত্রিকায় আসছে। অথচ পরে জানানো হচ্ছে ৭০/৮০ শতাংশ ভোটদাতা ভোট দিয়েছেন। অতএব বিষয়টি বুঝতেই পারছেন...। সবকিছুই 'ওপেন সিক্রেট'।

চলুন ব্যবসা ক্ষেত্রে। সেখানে দেখবেন অব্যাহত চাঁদাবাজি আর সন্ত্রাসের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য লাটে উঠেছে। ব্যবসায়ীরা অতিষ্ঠ হয়ে রাস্তায় মিছিলে নেমেছেন। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মালামালে দেশের বাজার সয়লাব। ফলে দেশের শিল্প-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য এখন বন্ধের পথে।

চলুন সমাজ জীবনে। মানীর মান সেখানে নেই। গল্পে পড়া হবু-গবুর রাজ্যের ন্যায় আমাদের সমাজেও যেন তেলে-ঘিয়ে সমান দর। ফলে যথার্থ মূল্যায়ন না হওয়ায় মেধা পাচার শুরু হয়ে গেছে। জ্ঞানী-গুণী মেধাবী যারা, তারা দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন এবং আর যাতে দেশে না ফিরতে হয়, সেই চেষ্টা করেন। সংসারের মায়া ছেড়ে বিদেশে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দু'পয়সা রোযগার করে যেমনি কেউ বাড়ী ফেরেন, অমনি চাঁদাবাজ অথবা সন্ত্রাসীর খপ্পরে পড়ে সবকিছু এমনকি জীবনটাও তার খোওয়াতে হয়। দেশের বিমানবন্দর থেকেই হয়তবা সবকিছু লোপাট হয়ে যেতে পারে, এমন সম্ভাবনা এখন ক্রমেই প্রকট হচ্ছে।

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা! হায় শিক্ষা ব্যবস্থা! যদি তোমার সঙ্গে যুক্ত না থাকতাম, তাহ'লেই ভাল থাকতাম। নকল করতে না দিলে শিক্ষক ও ম্যাজিস্ট্রেটদের ছাত্র ও অভিভাবকদের হাতে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হ'তে হয়। তবুও মাধ্যমিক -উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্ররা যতটুকু শিখে আসে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে তারা

সেটুকুও হারায়। যদিও শেষ পর্যায়ে অনার্স ও মাস্টার্স কমপক্ষে সেকেণ্ড ক্লাস নিয়ে প্রায় সবাই পার হয়ে যায়। ভাইভাতে কেবল এ্যাটেণ্ড করলেই ছাত্রকে ৫০% মার্ক দিতে হয়। এটাই এখন ট্রাডিশন, এটাই নাকি কনভেনশন।

চলুন দ্বীনের বাজারে। সেখানে দেখবেন দ্বীনী শিক্ষায় বেদ্বীনী প্রবেশ করেছে। সরকারী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডে অফিসার-কর্মকর্তা যারা আছেন, তাদের নামে শোনা যায় কচকচে নোটের রমরমা বাতেনী ব্যবসা। ঘুষ হারাম তাই তারা বখশিশ নেন। দ্বীনী শিক্ষার উন্নতি তাদের লক্ষ্য নয়। বরং লক্ষ্য অন্য কিছু। দেশের কলীজা বলে অভিহিত সচিবালয় পর্যন্ত একই রোগে আক্রান্ত। সেখানকার দরজার চৌকাঠ পর্যন্ত নাকি পয়সা না পেলে কথা বলে না। প্রবাদ আছে, 'মাছের মাথায় আগে পচন ধরে'। এখন তাই-ই হচ্ছে।

বাক স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বিচারক ও বিচার প্রাপ্তির স্বাধীনতা- এসবই সংবিধানের কথা। বাস্তবতা বড়ই করুণ। গণতন্ত্রের নামে সরকারী ও বিরোধী দলীয় সমাজ ব্যবস্থার যুপকাষ্ঠে সমাজ জীবন বিপর্যস্ত। ভাল-মন্দ সবকিছুই এখন দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়। শাসন বিভাগের অধীনস্থ বিচার বিভাগ লাঠির ভয়ে আতংকিত। ফলে নির্দলীয় শিক্ষক, সাংবাদিক ও বিচারকগণ এদেশের অসহায় প্রাণী। যারা মার খান, কিন্তু মার দিতে জানেন না। বিবেকের দংশনে তারা জর্জরিত হন, কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারেন না।

সবচেয়ে নাজুক অবস্থা ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের। ইসলাম এদেশের স্বাধীনতার ও স্বাধীনতা টিকে থাকার মূল চেতনা। ইসলাম বা ইসলামী চেতনা মুছে দিতে পারলেই দেশের সীমানা মুছে দেওয়া ও উভয় বাংলা এক হয়ে যাওয়া সহজ হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যারা দূরে বসে কলকাঠি নাড়ছেন, তারা ঠিকই টার্গেট করেছেন ও সে লক্ষ্য হাছিলের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও এনজিও-দের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সে কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করে চলেছেন। Offence is the best defence 'আক্রমণ হ'ল সবচেয়ে বড় আত্মরক্ষা' এই থিয়োরীর আলোকে গোয়েবল্সীয় কায়দায় দেশের নিরাপোষ ইসলামী চেতনা সম্পন্ন দেশপ্রেমিকদের 'স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি' বলে তার স্বরে চিৎকার দিয়ে তাদেরকে হামলার টার্গেট বানানো হচ্ছে। অন্যেরা দেশ বিক্রি করার ষড়যন্ত্র

প্রকাশ্যভাবে করলেও সেটা দোষের নয়। পবিত্র কুরআনের (সূরা তীন-এর) প্যারোডী রচনাকারীরা, কুরআনকে ডাস্টবিনে নিক্ষেপকারীরা, কুরআন-বিকৃতির দাবীদাররা, দেশের অভ্যন্তরে পৃথক ‘বঙ্গভূমি’ নামে হিন্দুরাষ্ট্র, ‘জুমল্যাণ্ড’ নামে পৃথক খ্রিষ্টান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবীদাররা বুক ফুলিয়ে রাজধানীতে মিছিল করছে। তারা সবাই দেশপ্রেমিক। আর দেশদ্রোহী কেবল তারাই যারা ওদের রাষ্ট্রবিরোধী চক্রজাল ছিন্ন করে ও ওদের মুখোশ উন্মোচন করে বক্তব্য রাখে ও কলম ধরে। ইসলামপন্থীরা নাকি দেশকে আবার পাকিস্তান বানাবে। অথচ একটা কচি শিশুও বুঝে যে, আড়াই হাযার মাইল দূরের একটা দেশের সঙ্গে মিলে যাওয়া আর কখনোই সম্ভব নয়। বরং ২৩ গুণ বড় ও তিন দিক দিয়ে বেষ্টনকারী দেশটির বিশাল মুখগহ্বরে নিমেষে হারিয়ে যাওয়াই সম্ভব। দুর্মুখরা বলে যে, নেতারা যা বলেন তার উল্টাটাই বুঝতে হয়। কেননা এদেশে অন্ধ ছেলের নাম ‘পদ্মলোচন’, আর ঘোলা পানির একটা নদীর নাম ‘কপোতাক্ষ’।

ঈদ চলে গেল। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৮ লাখ বন্যাদুর্গত বানভাসি ভাই-বোনদের ভাগ্যে কি ঈদ হয়েছে? দেড় লাখ বানভাসি আজও ঘরে ফিরতে পারেনি। রাস্তার ধারে পলিথিনের নীচে কোনরকমে মাথা গুঁজে পড়ে আছে। শেষ আশ্রয় নিজের ঘরটুকু হারিয়ে আজ তারা রাস্তার অধিবাসী। অথচ দু’দিন আগে তাদের সব ছিল। তাদের ও আরো যারা রাস্তার ও বস্তির বাসিন্দা, সেই সব অসহায় ভাই-বোনদের ভাষাহীন বোবা-কান্না কে শুনবে? কনকনে শীতে ঠকঠক করে কাঁপা ঐ হাড্ডিসার রোগজর্জর মানুষগুলির পাংশু মুখের দিকে মনের চোখ দিয়ে একবার তাকিয়ে দেখুন, আর জিজ্ঞেস করুন! আপনারা কেমন আছেন? হয়তবা অভ্যাস বশে তারাও বলবে, ভাল আছি। কিন্তু আসলেই কি তারা ভাল আছেন? জবাব দেবার দায়িত্ব যাদের তারা কুম্ভকর্ণ। তাই বুকফাটা আকুতি ছাড়া আর কিছুই করার নেই। তবুও বলি আমরা ভাল আছি। আগামী বছর আরো ভাল থাকার আশা রাখি। আল্লাহ্‌র রহমত থেকে মুমিন কখনোই নিরাশ হয় না। সোনালী ভবিষ্যতের আশায় তাই বুক বাঁধলাম। আল্লাহ তুমি আমাদের সহায় হও- আমীন![৫৯]

৫৯. ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জানুয়ারী ২০০১।

২৮. ভালোবাসি

সঊদী আরবের ত্বায়েফ প্রবাসী **আত-তাহরীক**-এর জনৈক পাঠক আমাদের বিগত সম্পাদকীয় 'ভালো আছি' পড়ে প্রভাবিত হয়ে 'ভালোবাসি' নামে আরেকটি সম্পাদকীয় উপহার দেওয়ার দাবী জানিয়ে পত্র লিখেছেন। হজ্জ ও কুরবানী তথা বিশ্ব মুসলিম মহাসম্মেলন ও আল্লাহ্র জন্য জীবন উৎসর্গ করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণের মহান ব্রত পালন শেষে আমরা কি ভালোবাসি, সেকথা আজ বন্ধু পাঠককে জানিয়ে দিতে চাই।

আমরা ভালোবাসি এমন একটি মানব সমাজ, যেখানে মানুষ আল্লাহ্র গোলামীতে পরস্পরে ভাই হ'য়ে বসবাস করবে। যেখানে মানবতা বিকশিত ও সমুন্নত হবে এবং পশুত্ব দমিত ও শৃংখলিত হবে। **আমরা ভালোবাসি** আল্লাহভীরু এমন কিছু মানুষকে, যারা অনুরূপ কিছু মানুষকে খুঁজে বের করে আল্লাহ্র বিধানে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলে। অতঃপর অন্য মানুষকে অনুরূপভাবে গড়ে তুলতে সদা সচেষ্ট থাকে। **আমরা ভালোবাসি** এমন একটি জামা'আত বা সংগঠনকে, যারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্র বিধান বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরস্পরে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় দৃঢ়তার সাথে কাজ করে যায়। **আমরা ভালোবাসি** এমন একটি সমাজকে, যেখানে মানুষ মানুষের ব্যথায় ব্যথিত হবে। অপরের মানবাধিকার রক্ষায় এগিয়ে যাবে। এমনকি যেকোন প্রাণীর অধিকার রক্ষায় দরদী মন নিয়ে সচেতন থাকবে। যেখানে দলের নামে, ধর্মের নামে, মাযহাব ও তরীকার নামে, রাজনীতির নামে, ভাষা ও আঞ্চলিকতার নামে, রক্ত ও বর্ণের কারণে মানুষে মানুষে বিভেদ ও হানাহানি থাকবে না। থাকবে না পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, হিংসা ও বিদ্বেষ। থাকবে না ছোট-বড় ভেদাভেদ। যেখানে সাদা-কালো, ধনী-গরীব সকল মানুষের অধিকার সমান থাকবে কেবল 'তাক্বওয়া' ব্যতীত। যারা আল্লাহ্র বিরোধিতায় ত্বাগূতের সাথে কোনরূপ আপোষ করবে না।

আমরা ভালোবাসি আমাদের মাটিকে, আমাদের দেশকে, দেশের মানচিত্রকে। এই মাটিতে আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই তার পিছনে আল্লাহ পাকের কোন কল্যাণ উদ্দেশ্য রয়েছে। এই মাটি ও মানুষের প্রতি তাই আমাদের রয়েছে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য। দেশবাসীর নৈতিক ও বৈষয়িক

উন্নয়ন এবং দেশের প্রতি ইঞ্চি মাটির স্বাধীনতা রক্ষা করা আমাদের মানবিক ও নাগরিক দায়িত্ব। বঙ্গোপসাগরের কোলঘেঁষা সবুজ-শ্যামলিমায় ভরা, অফুরন্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি, নদীবিধৌত আজকের বাংলাদেশ পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। তাই এদেশের বাসিন্দা হ'তে পেরে আমরা 'ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধে' প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। **আমরা তাই ভালোবাসি** সেই সামাজিক জীবনকে, যেখানে ন্যায়নীতি বিজয়ী হবে ও দুর্নীতি পরাজিত হবে। যেখানে মযলূম সাহায্যপ্রাপ্ত হবে ও যালিম ধিকৃত ও বিতাড়িত হবে। যেখানে মা-বোনেরা সম্মানিত হবেন, সুশিক্ষিতা হবেন ও মার্জিতা হবেন। যেখানে প্রতিটি মানব শিশু নির্ভয়ে নির্বিঘ্নে বর্ধিত ও সুশিক্ষা প্রাপ্ত হবে। যে শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে আখেরাতে মুক্তির লক্ষ্যে দুনিয়ার যথাযথ ব্যবহার। যে শিক্ষা মানুষকে ধর্মীয় ও বৈষয়িক উভয় জ্ঞানে পারদর্শী করে। যে শিক্ষা মানুষকে তার সৃষ্টিকর্তার প্রতি আনুগত্যশীল করে তোলে ও সৃষ্টির সেবায় উদ্বুদ্ধ করে। **আমরা ভালোবাসি** এমন এক রাষ্ট্রব্যবস্থা, যা আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের অধীনে তাঁর প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বিধান পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী পরিচালিত হবে। আমরা চাই আজকে সাংগঠনিকভাবে প্রতিষ্ঠিত 'ইমারতে শারঈ' আগামী দিনে 'ইমারতে মুল্কী' হিসাবে বাস্তবতা লাভ করুক! বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ একটি আদর্শ ও কল্যাণ রাষ্ট্র হিসাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াক! আল্লাহ আমাদের এই প্রার্থনা কবুল করুন-আমীন!

আমরা ভালোবাসি এমন একটি সমাজ, যেখানে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। যেখানে হালাল উপার্জনের সকল পথ খোলা থাকবে ও সেদিকে মানুষকে উৎসাহিত করা হবে এবং হারাম উপার্জনের সকল পথ বন্ধ থাকবে ও সেদিক থেকে মানুষকে বিরত রাখা হবে। যে সমাজে পুঁজির তারল্য থাকবে। মনিব শ্রমিককে ঠকাবে না। শ্রমিক তার কাজে ফাঁকি দিবে না। সকলের পকেটে পয়সা থাকবে, মুখে হাসি থাকবে। যে সমাজে যাকাত নেওয়ার মত লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। কোন ফকীর-মিসকীনের দেখা মিলবে না। গাছতলা ও পাঁচতলার বৈষম্য থাকবে না। অর্থের জন্য মানুষ মানুষকে খুন করবে না। চাঁদাবাজি করবে না, সন্ত্রাস করবে না। দেশের মায়া ছেড়ে মানুষ স্রেফ অর্থোপার্জনের জন্য বিদেশে পাড়ি জমাবে না। যেখানে থাকবে না সূদ-ঘুষ, জুয়া-লটারী ইত্যাদির মাধ্যমে পুঁজিবাদী শোষণের

প্রতারণাপূর্ণ অর্থব্যবস্থা। থাকবে না পীর-মুরীদী আর কবরপূজার ব্যবসা ফেঁদে ধর্মের নামে ভক্তের পকেট ছাফ করার ধোঁকাবাজিপূর্ণ ব্যবস্থা। থাকবে না সমাজতন্ত্র ও কম্যুনিজম-এর দাবী অনুযায়ী 'হাতের পাঁচ আঙ্গুল সমান করার' অবাস্তব রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা। যেখানে থাকবেনা গণতন্ত্রও ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে আল্লাহ্‌র আইনকে বিতাড়নের আত্মঘাতী কুফরী ব্যবস্থা।

আমরা ভালোবাসি এমন একটি রাজনৈতিক সমাজ, যেখানে প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বের পিছনে সমস্ত জাতি সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ থাকবে। যেখানে একদিকে থাকবে কঠোরভাবে আইনের শাসন। অন্যদিকে থাকবে 'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন' নীতির যথার্থ বাস্তবায়ন। যেখানে সরকারী ও বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা থাকবে না। থাকবে না দলীয়করণের উৎকট নোংরামি।

আমরা ভালোবাসি এমন একটি বিচার ব্যবস্থা, যেখানে আল্লাহ্‌র আইনের যথার্থ বাস্তবায়ন হবে। ইলাহী আইনের নিরপেক্ষ প্রয়োগে আল্লাহ্‌র বান্দারা ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ লাভে ধন্য হবে। মানুষের রচিত আইনে মানুষের জেল-যুলুম ও ফাঁসি হবে না। বরং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র আইনকেই সে মাথা পেতে গ্রহণ করবে। পরকালীন মুক্তির স্বার্থে ও জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে বাঁচার ঈমানী তাকীদে অপরাধী আদালতে এসে দৃঢ়ভাবে অকপটে তার অপরাধ স্বীকার করবে ও 'আমাকে পবিত্র করুন' বলে হাসিমুখে আল্লাহ নির্ধারিত অতিবড় কঠিন শাস্তিও মাথা পেতে নিবে মা'এয আল-আসলামীর মত, গামেদী মহিলার মত।

সর্বোপরি **আমরা ভালোবাসি** শিরক ও বিদ'আতমুক্ত এমন একটি ইসলামী সমাজ, যেখানে সর্বত্র তাওহীদে ইবাদত বিজয়ী থাকবে ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র পাবন্দী থাকবে। যেখানে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব এবং তাঁর প্রেরিত অহি-র বিধান সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার লাভ করবে। সকল মানুষ শান্তি, নিরাপত্তা ও কল্যাণ লাভে ধন্য হবে। আমরা সেই সমাজকে মনেপ্রাণে ভালোবাসি ও সেই সমাজের প্রতিষ্ঠা কামনা করি। আল্লাহ আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করুন-আমীন![৬০]

৬০. ৪র্থ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মার্চ ২০০১।

২৯. স্বাধীনতা রক্ষার শপথ

দেশের স্বাধীনতার উপরে হামলা হয়েছে। গত ১৮ই এপ্রিল'০১ কুড়িগ্রাম রৌমারী সীমান্তে এ হামলা চালিয়েছে বৃহৎ প্রতিবেশী ভারত। এযাবতকালের এই ভয়াবহ সংঘর্ষে হানাদার পক্ষ স্বাভাবিকভাবেই চরম মার খেয়েছে। ৩জন বিডিআর ও ৪০জন বিএসএফ নিহত হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৬টি লাশ ফেলে তারা পালিয়ে গেছে। ১১ জন বিডিআর-এর কাছে ব্লাকক্যাট সহ ৩০০ জন বিএসএফ-এর হেরে যাওয়া ও পালিয়ে যাওয়ার লজ্জায় তারা এখন মরিয়া হয়ে উঠেছে। তাই চরম প্রতিশোধ ও সর্বাত্মক হামলা আসন্ন, একথা ধরে নেওয়া যায়।

গত ৩০ বছর ধরেই ভারত নিয়মিতভাবে সীমান্ত হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। তাতে সবসময় মরেছে ও মার খেয়েছে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যগণ ও সীমান্তে বসবাসকারী জনগণ। দখল করে রেখেছে তারা সিলেটের পাদুয়া-প্রতাপপুর গ্রাম ও মুহুরীর চর সহ ১০ হাযার একরের ঊর্ধ্বে বাংলাদেশী ভূমি। ৫১টি ছিট মহলের চার লক্ষাধিক বাংলাদেশী তাদের হাতে কার্যতঃ বন্দী জীবন যাপন করছে। ১৯৭৪ সালে মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি মোতাবেক বেরুবাড়ী তারা ঠিকই নিয়েছে। কিন্তু বিনিময়ে দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা পুরোপুরি আজও আমাদের দেয়নি। আমাদের সাগর সীমানার মধ্যে জেগে ওঠা দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ তারা জবরদখল করে রেখেছে। গত সোয়া চার বছরে ৩০০০ বার তারা সীমান্ত লংঘন করেছে। ৩০০ বার গুলী বর্ষণ করেছে। হত্যা করেছে ৪৭ জন বিডিআর সহ ১৪৭ জন গ্রামবাসীকে। আহত করেছে কতজনকে তার হিসাব নেই। কত গ্রাম ও বাড়ী-ঘর জ্বালিয়েছে, গরু-বাছুর ও সহায়-সম্পদ লুট করেছে তার ইয়ত্তা নেই। এছাড়াও ফারাক্কা সহ ৫৪টি অভিন্ন নদীর উজানে বাঁধ দিয়ে তারা বাংলাদেশকে শুকিয়ে মারতে চেয়েছে। গত বছরের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের মওসুমে তাদের সঞ্চিত পানি বাংলাদেশে ঠেলে দিয়ে কৃত্রিম বন্যা সৃষ্টি করে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলকে তারা ডুবিয়ে মেরেছে। চোরাচালানীর মাধ্যমে ও অসম বাণিজ্যের মাধ্যমে দেশের সম্পদ ও শিল্প-বাণিজ্য নিঃশেষ করে দিচ্ছে। দেশের অর্থকরী ফসল পাট, মাছ ও বস্ত্র খাত তাদের দখলে নিয়েছে। দেশের মাটির নীচের লুক্কায়িত বিপুল সম্ভাবনার উৎস

তৈল ও গ্যাস সম্পদ সহ দেশের সম্ভাবনাময় সকল সেক্টরে তাদের পরোক্ষ দখলদারিত্ব স্পষ্ট। ইলেকশন মৌসুমে দেদারসে অস্ত্র চোরাচালানের মাধ্যমে দেশের রাজনীতিকে দুর্বৃত্তায়ন করার অপতৎপরতা মোটেই গোপন নয়। তারা জানে যে, বাংলাদেশের স্বাধীনচেতা মানুষ ও সশস্ত্র বাহিনী এক মুহূর্তের জন্যও ভারতের গোলামী মেনে নেবে না। তাই বিকল্প পথ হিসাবে এদেশে সব সময় তাদের বশংবদ একটি পুতুল সরকারকে তারা দেখতে চায়। যাদের হাত দিয়ে তাদের আগ্রাসী থাবা বিস্তারের কাজ সহজে সম্পন্ন করা যায়। অতঃপর সুযোগ-সুবিধামত সিকিমের ন্যায় একদিন পুরা দেশটাকেই হযম করা সম্ভব হবে। সেই টার্গেট নিয়েই তারা পূর্বপরিকল্পিত ভাবে এবার সীমান্ত হামলা চালিয়েছে বলে পর্যবেক্ষক মহল ধারণা করছেন। এর মাধ্যমে তারা দেখাতে চেয়েছিল যে, বাংলাদেশের বর্তমান সরকার মোটেই ভারতপন্থী নয়। বরং নিঃসন্দেহে ভারত বিরোধী। তা না হ'লে এই বন্ধু সরকারের আমলে ভারত কেন সীমান্তে হামলা চালাতে যাবে? এজন্য অজুহাত হিসাবে তারা বিডিআর কর্তৃক সিলেটের জাফলং-এর নিকটবর্তী বাংলাদেশী গ্রাম পাদুয়া ভারতীয় দখলমুক্ত করার ১৫ই এপ্রিলের অভিযানকে সামনে এনেছে। বাংলাদেশী ভূখণ্ডে রাস্তা বানিয়ে তারা বিডিআরকে অভিযান পরিচালনায় বাধ্য করেছে। অতএব হে ভারত বিরোধী জনগণ! তোমরা আগামী ইলেকশনে স্বাধীনতার পক্ষ শক্তি (?) এই ভারত বিরোধী দলটিকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় বসাও। তাদের হিসাব ঠিকই ছিল। কিন্তু আল্লাহ্র হিসাব ছিল আলাদা। তাই মারটা একটু বেশীই হয়ে গেল। ফলে ভারতের এখন মুখরক্ষার পালা।

আমাদের সরকারের পক্ষ হ'তে এই ভারতীয় হামলার বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রতিবাদ হ'ল না। এমনকি জাতীয় সংসদের যরূরী বৈঠক ডেকে এর বিরুদ্ধে একটা নিন্দা প্রস্তাবও নেওয়া হ'ল না। যেখানে আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী ভারতেরই ক্ষমা চাওয়ার কথা। সেখানে আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পর প্রধানমন্ত্রীকে ৩০ মিনিট ধরে টেলিফোনে 'দুঃখ প্রকাশ' করতে হ'ল, তদন্তের আশ্বাস দিতে হ'ল। বিডিআরগণ কেন পাল্টা হামলা চালালো এজন্য তাদের কোর্ট মার্শালে বিচার করার দাবীও নাকি উঠানো হয়েছে। সরকার নাকি কিছুই জানেন না। এটা নাকি বিডিআরের নিজস্ব হঠকারিতা...। অথচ আমাদের প্রধানমন্ত্রীর 'দুঃখ প্রকাশে'র ২৪ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে শাসক বিজেপির

মিত্র দলগুলো বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প ব্যক্ত করেছে। সেদেশের পার্লামেন্টে গত ২৩শে এপ্রিল সোমবার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে 'যুদ্ধ ঘোষণা' এবং ঢাকায় বিডিআর-এর হেড কোয়ার্টার বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া, নিহত ১৬ জন বিএসএফ-এর বদলে ৩২ জন বিডিআর সদস্য হত্যার সুফারিশ করা হয়েছে। ভারতীয় পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী যশোবন্ত সিং রৌমারীর ঘটনাকে বিডিআরের 'ক্রিমিনাল এডভেঞ্চারিজম' বা দুর্বৃত্তসুলভ হঠকারিতা বলে আখ্যায়িত করেছেন। সিলেট সীমান্তের বিএসএফ সদস্যগণ তাদের নিহত প্রতি একজন বিএসএফ-এর বদলে ৪০ হাযার বাংলাদেশী হত্যার হুমকি দিয়েছে বলে পত্রিকান্তরে প্রকাশ। আমাদের সীমান্তের প্রায় ৫০০ মিটার ভিতরে ঢুকে তারা অতর্কিত হামলা করল। আমাদের মাটিতেই তাদের লাশ পাওয়া গেল। তারা আমাদের তিনজন বিডিআরকে হত্যা করল। ৪০টি গ্রামে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করল। এরপরেও তারা নির্দোষ।

আমাদের বিডিআর নির্ভীকচিত্তে তাদের উপরে অর্পিত পবিত্র দায়িত্ব পালন করেছে। আমরা তাদেরকে স্বাগত জানাই এবং আল্লাহ্‌র নিকটে তাদের ঈমানী চেতনা বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করি। কিন্তু হায়! দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যাদেরকে জাতীয় বীরের সম্মানে ভূষিত করা উচিত ছিল, তারাই এখন জাতীয় 'দুর্বৃত্তে' পরিণত হ'ল। ৩০ বছর পরে পুনর্দখলকৃত পাদুয়া গ্রামের ২৩০ একর ভূমি থেকে ১৯শে এপ্রিল তারিখে সরকারী হুকুমে তাদেরকে নীরবে মাথা নীচু করে চলে আসতে হ'ল।

এমতাবস্থায় দেশবাসীর করণীয় কি হবে? যখন আমাদের কেউ থাকবে না, তখন আল্লাহ ছাড়া আমাদের প্রকৃত বন্ধু কেউ নেই। আর আল্লাহ্‌র সাহায্য পেতে গেলে চাই দৃঢ় ঈমান। ইবরাহীমী ঈমানের তেজে নমরূদী হুতাশন যেমন ফুলবাগে পরিণত হয়েছিল, আমাদের ঈমানী শক্তির সম্মুখে তেমনি হানাদারদের গুলী ও বোমার আগুন নিভে যেতে পারে। বদরের ময়দানে যদি ফেরেশতা নামতে পারে, তাহ'লে বাংলাদেশের মাটিতে পুনরায় ফেরেশতা নেমে আসতে পারে, আল্লাহ্‌র হুকুম হ'লে। তাই আসুন! নতুন করে স্বাধীনতা রক্ষার শপথ নিন। ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হৌন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন![৬১]

---

৬১. ৪র্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, মে ২০০১।

৩০. তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গ

দলীয় শাসনে পিষ্ট মানুষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অপেক্ষায় দিন গুণছিল। অবশেষে গত ১৫ই জুলাই'০১ বাদ মাগরিব তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি জনাব লতিফুর রহমান ও দশজন উপদেষ্টার শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাস্তবে এসেছে। ১৯৯১ ও ১৯৯৬-এর পরে এটি হ'ল তৃতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার। প্রথম তত্ত্বাবধায়ক বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান ছিলেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমাদ। মানুষ হাফ ছেড়ে বেঁচেছে। অনেকে শোকরানা ছালাত আদায় করেছে। অনেকে আনন্দ মিছিল করেছে। দলীয় শাসন যে কত হিংস্র, কত নোংরা ও কত অমানবিক হ'তে পারে, গত দু'দুটি দলীয় সরকার তা বাংলাদেশের মানুষকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে। প্রথম সরকারে কিছুটা রাখঢাক থাকলেও দ্বিতীয় সরকারে এসবের কোন বালাই ছিল না। রাষ্ট্র ও সমাজের এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর ছিল না, যা দলটির হিংস্র থাবা থেকে মুক্ত থাকতে পেরেছে। ফলে প্রথম সরকারের আমলে বাংলাদেশ বিশ্বের ৪ নম্বর দুর্নীতিগ্রস্থ দেশে পরিণত হয়। অতঃপর দ্বিতীয় সরকারের আমলে ১ নম্বর দুর্নীতিগ্রস্থ দেশ হিসাবে চিহ্নিত হয়। আর সেকারণেই অত্যাচার-নির্যাতন ও সন্ত্রাসে নিষ্পিষ্ট সাধারণ মানুষ এ সরকারের পতন এবং নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আগমনের গভীর অপেক্ষায় ছিল।

এক্ষণে প্রশ্ন আসে : দলীয় সরকার ভাল, না নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার ভাল? জবাব নিশ্চয়ই এটা যে, নির্দলীয়-নিরপেক্ষ সরকার ভাল। অথচ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ মাত্র ৯০ দিন বা তিন মাস। তারপরেই আবার যেতে হবে পুনরায় আরেকটি দলীয় সরকারের অন্ধকার গলিতে। আমরা কেন তাহ'লে ভাল থেকে মন্দের দিকে ধাবিত হ'তে যাচ্ছি? আমরা কি দেশের জ্ঞানী-গুণী-যোগ্য ও দক্ষ ব্যক্তিদের নিয়ে স্থায়ীভাবে একটি নির্দলীয়-নিরপেক্ষ সরকার ব্যবস্থা কায়েম করতে পারি না? সুশাসন যদি উদ্দেশ্য হয়, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন যদি নীতি হয়, সমৃদ্ধিশালী ও শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠা যদি কাম্য হয়, তাহ'লে দলীয় সরকার ব্যবস্থার ন্যায় অশিষ্ট শাসন ব্যবস্থা আমরা কোন কারণে প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছি? অথচ আল্লাহ বলেন, 'কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা

ন্যায়বিচার কর, যা আল্লাহভীতির অধিকতর নিকটবর্তী... *(মায়েদাহ ৫/৮)*। এটা কে না জানে যে, দলীয় শাসন কখনোই নিরপেক্ষ প্রশাসন উপহার দিতে পারেনা, যদি না তারা আল্লাহভীরু হয়। তারা কখনো নিরপেক্ষ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। অথচ জ্বলন্ত আগুনের প্রতি উড়ন্ত পতঙ্গের ন্যায় তথাকথিত গণতান্ত্রিক বহুদলীয় নির্বাচন ব্যবস্থার দিকে আমরা ছুটে চলেছি। আর এটা সকলেই জানেন যে, পৃথিবীর কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা নেই।

সরকার পদ্ধতি গণতন্ত্রায়ণের নামে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী গ্রহণের সময় দেশের দু'টি প্রধান রাজনৈতিক দল প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রিক স্বৈরাচারী পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থাকে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার বলে অভিহিত করে। প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতাহীন একটি প্রতীকী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার বিষয়ে দু'টি দলই অভিন্ন মত পোষণ করে। যেকারণে সরকার ব্যবস্থায় কোনরূপ Check and balance-এর বিধান রাখা সম্ভব হয়নি। ফলে পরবর্তী দুই মেয়াদের দুই প্রধানমন্ত্রী ভিত্তিক দু'টি দলীয় স্বৈরাচারী শাসনে অতিষ্ঠ জনগণকে শান্ত করার জন্য উভয় দলই অন্ততঃ নির্বাচনের সময় নির্দলীয়-নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান পাশে একমত হয়।

ত্রয়োদশ সংশোধনীতে বর্ণিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্য এই যে, এই সরকারে একমাত্র প্রেসিডেন্ট ব্যতীত আর কেউ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নন (যদিও প্রেসিডেন্ট মূলতঃ সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন)। জনগণের সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসাবে প্রেসিডেন্টের কাছেই প্রধান উপদেষ্টাসহ সকল উপদেষ্টা দায়ী থাকেন এবং জওয়াবদিহী করতে বাধ্য থাকেন। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ও নিরংকুশ ক্ষমতা এ সময়ে মূলতঃ এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। সংবিধানের Sole Custodian হিসাবে প্রেসিডেন্ট হন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা বিধানের একক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাই কোন ক্ষমতাহীন সরকার নয়। বরং নির্বাচিত সরকারের ন্যায় এটিও একটি যথোচিত ক্ষমতা সম্পন্ন সরকার। এই সরকারকে বরং প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির সরকার বলা যেতে পারে।

উপরে বর্ণিত দু'টি পদ্ধতির সরকারের সাথে ইসলামী ইমারত ও শূরা পদ্ধতির সরকারের পার্থক্য এই যে,

(১) জনগণের মধ্যকার সদগুণাবলী সম্পন্ন নির্বাচক মণ্ডলী কর্তৃক দেশের ‘আমীর’ নির্বাচিত হন। ইসলামী ইমারত পদ্ধতিতে দেশের বিচার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকে। আদালতে দোষী বা অযোগ্য সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত ‘আমীর’ আজীবন স্বপদে বহাল থাকেন। তিনি সদগুণাবলী সম্পন্ন, যোগ্য ও দক্ষ একটি ‘পরামর্শ সভা’ নিয়োগ দেন। যাকে ‘মজলিসে শূরা’ বলা হয়। তাদের পরামর্শক্রমে তিনি রাষ্ট্রের সর্বস্তরে যোগ্য ও দক্ষ প্রশাসক মণ্ডলী নিয়োগ করেন। আমীর সকল ক্ষেত্রে শূরার পরামর্শ নিয়ে কাজ করেন। তবে ক্ষেত্র বিশেষে তাঁর জন্য বিশেষ ক্ষমতা নির্ধারিত থাকে। আমেরিকা যাকে Veto power বা ভেটো ক্ষমতা বলে থাকে। রাষ্ট্রে কোনরূপ সরকারী বা বিরোধী দলের অস্তিত্ব থাকে না। দুর্নীতি বা অযোগ্যতা প্রমাণিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেকোন সময়ে মন্ত্রী, শূরা বা সংসদ সদস্য কিংবা যেকোন পর্যায়ের কর্মকর্তা বরখাস্ত হ’তে পারেন।

২. ইসলামী সরকারে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হন আল্লাহ। তাই আল্লাহ্র আইনের অনুকূলেই দেশের সকল আইন ও সংবিধান রচিত হয়। আমীর রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ যিম্মাদার হ’লেও তাকে আল্লাহ ও জনগণের নিকটে জবাবদিহী করতে বাধ্য থাকতে হয়। সাধারণ আসামীর মত আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। অনুরূপভাবে রাষ্ট্রের সর্বস্তরের কর্মকর্তাকে আল্লাহ ও আমীর বা তাঁর প্রতিনিধির নিকটে জবাবদিহী করতে হয়। এভাবে আল্লাহ ও আদালতভীতি রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বস্তরে একটি জওয়াবদিহিতার আতংক সৃষ্টি করে। যা সুষ্ঠু প্রশাসন পরিচালনায় চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করে। দু’চার বছর অন্তর মেয়াদভিত্তিক নেতৃত্ব নির্বাচনের ব্যবস্থা না থাকায় সমাজে গ্রুপিং ও নেতৃত্বের কোন্দল সৃষ্টির সুযোগ থাকে না। ফলে সমাজে শান্তি, শৃংখলা ও অগ্রগতি সুনিশ্চিত হয়।

পক্ষান্তরে দলীয় সরকার ব্যবস্থায় দলীয় স্বার্থ বড় হ’য়ে দেখা দেয়। জনস্বার্থ গৌণ হয়। প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি ইসলামী ইমারত পদ্ধতির কাছাকাছি হ’লেও সেখানে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে প্রেসিডেন্টের হাতে। যা তাকে স্বেচ্ছাচারী করে এবং যা ইসলামী ইমারতের আদর্শ বিরোধী। বহুদলীয় গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা ইসলামী সরকার ব্যবস্থার বিপরীত একটি জগাখিচুড়ী সরকার ব্যবস্থা। বরং বলা চলে যে, এটি একটি অর্থ, অস্ত্র ও সন্ত্রাস নির্ভর দুর্নীতিগ্রস্থ

সরকার ব্যবস্থা মাত্র। যার জন্য জান-মাল, সময় ও শ্রম ব্যয় করার পিছনে কোন ইসলামী তাকীদ নেই। এর বিপরীতে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা অনেকাংশে একটি ভাল ব্যবস্থা। যদিও সেখানে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব নেই। নিরপেক্ষভাবে ও শক্ত হাতে প্রশাসন চালানোই এ সরকারের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। কেননা নিরপেক্ষতা কোন পক্ষকেই সন্তুষ্ট করতে পারে না। আল্লাহ আমাদের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তি দান করুন। আমীন![৬২]

বিঃদ্রঃ 'এই সাথে পাঠ করুন মাননীয় লেখকের 'ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন' শীর্ষক বইটি। -সম্পাদক।

৩১. জাতীয় সংসদ নির্বাচন

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচলিত ধারায় দেশে কি সৎ ও যোগ্য নেতারা নির্বাচিত হয়ে সংসদে আসতে পারবেন? আর এলেও তিনি কি সৎ ও যোগ্য থাকতে পারবেন? বর্তমান নেতৃত্ব নির্বাচন পদ্ধতিতে সেটা আদৌ সম্ভব কি-না ভেবে দেখার বিষয়। কারণ : (১) এখানে প্রার্থী হওয়ার মাধ্যমে নেতৃত্ব চেয়ে নিতে হয়। সৎ ও যোগ্য লোকেরা কখনোই নেতৃত্ব চেয়ে নেন না (২) এখানে সাধারণতঃ দলভিত্তিক প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়া হয় ও তাকে নির্বাচনের জন্য সত্য-মিথ্যা ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়। ফলে অন্য দলের কিংবা নিরপেক্ষ কোন সৎ ও যোগ্য ব্যক্তি নেতা নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন (৩) প্রচলিত নির্বাচন প্রথায় অর্থ, অস্ত্র ও দলীয় ক্যাডার বা সন্ত্রাসী লালন করা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এক প্রকার অপরিহার্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। অথচ সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিগণ কখনো এসবের ধারে-কাছে যান না (৪) প্রচলিত নির্বাচন ব্যবস্থায় নির্বাচক ও নির্বাচিতদের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট গুণাবলী ও যোগ্যতা নির্ধারিত নেই। ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে যেকোন নাগরিক নেতা হবার জন্য ভোটে দাঁড়াতে পারেন বা ভোট দিতে পারেন। ফলে সন্ত্রাসের গডফাদার বলে খ্যাত এবং নৈতিকতা বিবর্জিত ব্যক্তিদের জন্য এ সিস্টেমে এম.পি বা মন্ত্রী হওয়াটা খুবই সাধারণ ব্যাপার (৫) বর্তমানকালে জাতীয় সংসদ সদস্যগণ জাতির খাদেম হন না, বরং জাতির শোষক হিসাবে গণ্য হন। ফলে মন্ত্রী-এম.পিগণ বর্তমানে

---

৬২. ৪র্থ বর্ষ, ১১তম সংখ্যা, আগস্ট ২০০১।

জনগণের কাছ থেকে কোনরূপ সম্মান বা শ্রদ্ধা কুড়াতে সক্ষম হন না। কারণ নির্বাচনের সময় যে অঢেল অর্থের ছড়াছড়ি দেখা যায়। এমনকি মনোনয়ন পাওয়ার জন্য দলীয় ফাণ্ডে বা দলীয় নেতাদেরকে যে কোটি কোটি টাকার গোপন ও প্রকাশ্য চাঁদা দিয়ে নমিনেশন খরিদ করার প্রতিযোগিতা হয়, তাতে টাকার মালিকেরাই কেবল এম.পি হওয়ার সুযোগ পান। এম.পি হওয়ার পরে তারা তাদের বিনিয়োগকৃত অর্থের বহু গুণ উসূল করে নেবেন, এটা ধরে নেওয়া যায়। অন্যদিকে মনোনয়ন লাভে ব্যর্থ নেতৃত্ব প্রয়াসীদেরকে রাষ্ট্রের অন্য কোন পদ বা কন্ট্রাক্টরী বাগিয়ে দেওয়ার ওয়াদা দিয়ে দলীয় হাইকম্যাণ্ড তাদেরকে আশ্বস্ত করে থাকেন। এমতাবস্থায় সৎ, যোগ্য ও আদর্শ সচেতন লোকেরা কোন হিসাবেই আসেন না (৬) বর্তমান নির্বাচন ব্যবস্থায় মেধাসম্পন্ন এম.পি-রাও নেতা বা নেত্রীর চাটুকারে পরিণত হ'তে বাধ্য হন। দলনেতার বিরোধিতা করলে সংবিধানের ৭০ ধারা অনুযায়ী ফ্লোর ক্রসিংয়ের আইনের বলে তাকে সংসদ সদস্য পদ হারাতে হয়। এই দুনিয়াবী লাভ ও সুযোগ-সুবিধা হারানোর ঝুঁকি কেউ নিতে চান না। ফলে জাতীয় সংসদ মূলতঃ নিজ দলীয় নেতা-নেত্রীদের প্রশংসা ও অপর দলের কুৎসা গাওয়ার কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৯৯৯ সালে প্রদত্ত জনৈক অর্থনীতিবিদের হিসাব মতে 'বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে প্রতি মিনিটে খরচ হয় ১৫ হাযার টাকা। এক মিনিটে একজন সদস্য ১৬০টি শব্দ উচ্চারণ করতে পারেন। ফলে তার প্রতি শব্দে ১০০ টাকা করে খরচ হয়'। অতএব এই মূল্যবান সময় ও মুহূর্তগুলি পরচর্চা ও খিস্তি-খেউড় গেয়ে শেষ করা ও জাতীয় সম্পদের অপচয় করা দ্বীনদার ও জ্ঞানী লোকদের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয় (৭) দলের নেতাদের কিংবা দেশের বিভিন্ন এলাকাকে খুশী করার জন্য মন্ত্রী-উপমন্ত্রীর সংখ্যা বাড়ানো হয়। এই সব পদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপ্রয়োজনীয় প্রমাণিত হয়। অথচ ৩৩০ জন এম.পি ও ৭৩ জন মন্ত্রী-উপমন্ত্রীর বদলে মাত্র ১০ জন উপদেষ্টা নিয়ে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিগত যেকোন দলীয় সরকারের চেয়ে অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে দেশ চালিয়ে যাচ্ছেন। মাত্র দেড় মাসেই তাঁরা জনগণের প্রশংসা কুড়াতে সক্ষম হয়েছেন (৮) পাঁচ বছর অন্তর অন্তর নেতা নির্বাচন বা পরিবর্তনের কারণে অভিজ্ঞ ও দক্ষ কোন মন্ত্রী বা শাসক সৃষ্টি হ'তে পারেন

না। ফলে জাতীয় সংসদ অদক্ষ, আনাড়ী ও দুষ্টু লোকদের আড্ডাখানায় পরিণত হয় (৯) জনমতের কোন স্থিরতা না থাকায় জাতীয় সংসদে ভিন্ন ভিন্ন মতের সমাগম ঘটে। ফলে জনকল্যাণের ও দেশ পরিচালনার স্থায়ী কোন নীতি ও ভিত্তি রচনা করা সম্ভব হয় না (১০) 'গণতন্ত্রে মাথা গণনা করা হয় মাত্র। কিন্তু মাথার মধ্যে কি আছে, তা যাচাই করা হয় না'। ফলে এখানে সৎ ও যোগ্য লোকদের মূল্যায়ন ও ক্ষমতায়ন প্রায় অসম্ভব বিষয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটা আরও বেশী বাস্তবতার দাবী রাখে (১১) পাঁচ বছর অন্তর অন্ত র এম.পি নির্বাচনের এই মরণ খেলায় হাযার হাযার কোটি টাকার অপচয়ের ফলে দেশে যেমন মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়, তেমনি শত শত লোকের জীবন হানি, গাড়ী-বাড়ী ভাংচুর ও মূল্যবান সম্পদরাজি ধ্বংস হওয়ায় জাতীয় ক্ষতি ও সামাজিক অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী হয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে নেতৃত্ব নির্বাচন করা 'ফরযে কেফায়াহ', যেমন জানাযার ছালাত। অর্থাৎ উম্মতের দায়িত্বশীল কিছু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি যখন পূর্বতন নেতার পরে সৎ ও যোগ্য কাউকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করেন, তখন সকলের পক্ষ থেকে উক্ত 'ফরয' আদায় হয়ে যায় এবং সকলকে তা মেনে নেওয়া বাধ্যতামূলক হয়। এটা ছালাত ও যাকাতের ন্যায় 'ফরযে আয়েন' নয় যে, উম্মতের প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক নারী-পুরুষকে এব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করতেই হবে। এই ফরয হক আদায়ের কঠিন যিম্মাদারী ইসলাম গুণী-নির্গুণ, সৎ-অসৎ, যোগ্য-অযোগ্য নির্বিশেষে সকলের উপরে ন্যস্ত করেনি। বরং এ দায়িত্বের প্রধান হকদার হ'লেন পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সৎ ও যোগ্য জাতীয় নেতৃবৃন্দ। দ্বিতীয়তঃ নেতা নির্বাচন বলতে দেশের আমীর বা প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বুঝাবে, প্রচলিত এম.পি নির্বাচন নয়। আমীর বা প্রেসিডেন্ট হবেন দেশ পরিচালনার সর্বোচ্চ যিম্মাদার। তিনি সৎ ও যোগ্য লোক বাছাই করে একটি মজলিসে শূরা বা পরামর্শ সভা মনোনয়ন দিবেন এবং তাদের সাথে পরামর্শক্রমে তিনি দেশ পরিচালনা করবেন। অতএব কে পার্লামেন্ট সদস্য হবে, সেটা বাছাই ও মনোনয়নের দায়িত্ব প্রেসিডেন্টের। জনগণ কাউকে এম.পি নির্বাচন করে প্রেসিডেন্টের উপরে চাপিয়ে দিতে পারে না। সেটা

করলে প্রেসিডেন্ট ও শূরার মধ্যে সংঘর্ষ লেগেই থাকবে। দেশের উন্নতি ব্যাহত হবে। এমনকি দেশ ধ্বংস হবে।

তাই আমরা মনে করি প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর মেয়াদ ভিত্তিক এম.পি নির্বাচনের রক্তাক্ত খেলা বন্ধ করা উচিত। দেশ সেবার নামে দেশ শোষণের বর্তমান অপরাজনীতি বন্ধ করা হউক। নীতি ও আদর্শহীন অসৎ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আইন প্রয়োগ করা হউক। দল ও প্রার্থীভিত্তিক প্রচলিত নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা বাতিল করে দেশের প্রধান বিচারপতির মাধ্যমে নেতৃবৃন্দের পরামর্শক্রমে সৎ ও যোগ্য, দক্ষ ও নিরপেক্ষ, ইসলামী জ্ঞান সম্পন্ন একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করা হউক। যিনি পসন্দমত দক্ষ ও যোগ্য লোকদের নিয়ে মজলিসে শূরা বা পার্লামেন্ট গঠন করবেন ও তাঁদের পরামর্শ মোতাবেক দেশ পরিচালনা করবেন।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের উপরোক্ত প্রস্তাব অবাস্তব ও অসম্ভব বিবেচিত হ'লেও আমরা মনে করি জাতির মুক্তি এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে। আল্লাহ আমাদের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তি দান করুন। আমীন![৬৩]

৩২. শেষ হ'ল পালাবদল

পত্রিকান্তরের হিসাব মতে সরকারীভাবে ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ের বাইরে সাড়ে ঊনিশ শত প্রার্থীর অন্যূন দশ হাযার কোটি টাকা ব্যয়ের মধ্য দিয়ে দেশের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পালাবদল শেষ হ'ল গত পহেলা অক্টোবর ২০০১ সোমবারে। সরকারী দল আওয়ামী লীগের বদলে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে এখন বি.এন.পি-র নেতৃত্বাধীন চার দলীয় ঐক্যজোট। ইতিমধ্যেই দু'দল থেকে ৬০ সদস্যের বিশাল এক মন্ত্রী বহর শপথ গ্রহণ করেছেন। আরও ডজন দুয়েক মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী ও মন্ত্রীর মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নাম অপেক্ষমানদের তালিকায় রয়েছে, যা সত্বর ঘোষণা করা হবে। গড়ে সরকারী জোটের প্রতি তিন জন সংসদ সদস্যের বিপরীতে একজন মন্ত্রী হচ্ছেন। ফলে পুরা প্রশাসনকেই প্রায় ব্যস্ত থাকতে হবে মন্ত্রীদের প্রটোকল দিতে ও তাদের সেবাযত্ন করতে। ২৯৮টি আসনের মধ্যে ২১৫টি আসনে

৬৩. ৪র্থ বর্ষ, ১২তম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০১।

জোটের অকল্পনীয় বিজয়কে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের কেউ বলেছেন, বিগত সরকারের ব্যাপক দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ গণরায়। কেউ বলেছেন এটা জোটগতভাবে ঐক্যবদ্ধ নির্বাচনের সুফল। কেননা সীট কম পেলেও আওয়ামী লীগের ভোটার সংখ্যা গতবারের শতকরা ৩৭.৪৪ থেকে বেড়ে এবারে ৪১% হয়েছে। যদিও এর মধ্যে ৫০ লাখ ভুয়া ভোট যোগ আছে বলে অভিযোগ রয়েছে। আরও রয়েছে ভারত থেকে আগত মৌসুমী ভোটারদের বিরাট একটি সংখ্যা। দেশী-বিদেশী সকল মহলই এবারের নির্বাচনকে সর্বাধিক সুষ্ঠু-সুন্দর ও অবাধ নির্বাচন বলে অভিহিত করেছেন। এরপরেও বিজয়ী জোট, পরাজিত দল ও স্বতন্ত্রদের পক্ষ থেকে রয়েছে নির্বাচনে ব্যাপক সন্ত্রাস ও ভোট ছিনতাইয়ের অভিযোগ। আওয়ামী নেত্রী মনের দুঃখে ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে ৩০০ আসনেই পুনঃ নির্বাচনের দাবী জানিয়েছেন। গতবারে আওয়ামী লীগ এরশাদ ও জামায়াতের সমর্থন পেয়েছিল। এবার না পাওয়াতেই তারা হেরেছে বলে নেত্রী মনে করেন। বিশ্লেষকগণ আওয়ামী সরকারের ভরাডুবির জন্য প্রধানতঃ পাঁচটি কারণ নির্দেশ করেছেন। (১) ব্যাপক সন্ত্রাস (২) লাগামহীন দুর্নীতি (৩) নির্লজ্জ পরিবারতন্ত্র (৪) ইসলাম ও ইসলামী প্রতিষ্ঠান সমূহের উপরে হস্তক্ষেপ ও ইসলামপন্থীদেরকে ঢালাওভাবে মৌলবাদী ও তালেবান বলে তাচ্ছিল্যকরণ এবং (৫) উৎকট ভারতপ্রীতি। বর্তমানে ক্ষমতাসীন জোট সরকার এগুলির কোন একটির প্রতি ঝুঁকে পড়লে তাদের পরিণতিও বিগত সরকারের মত হবে, একথা মনে রেখেই সম্মুখে এগোতে হবে।

উভয় দলের নেত্রী ৫ বছর করে দেশ শাসন করেছেন। 'শিষ'নেত্রী তাঁর শাসনামলে দেশকে বিশ্বের ৪নং দুর্নীতিগ্রস্ত দেশে পরিণত করেছিলেন। 'নৌকা'নেত্রী ক্ষমতায় এসে দেশকে ৪নং থেকে ১নং দুর্নীতিগ্রস্ত দেশে উন্নীত করলেন। মানুষ এক নম্বরের হাত থেকে বাঁচার জন্য চার নম্বরকে বেছে নিয়েছে মন্দের ভাল হিসাবে। দু'দলই ইতিপূর্বে নির্বাচনী ওয়াদা ভঙ্গ করেছেন। দুর্নীতি বন্ধের বদলে তা বৃদ্ধি করেছেন। কেউ কালাকানূন বাতিল করেননি। বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে পৃথক ও স্বাধীন করেননি। দেশের শিক্ষা ও অর্থ ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটাননি। ইসলামের পক্ষে কোন কাজ করেননি।

বর্তমান নির্বাচন ব্যবস্থা যে এক বিশাল ব্যয়বহুল প্রহসন এবং হত্যা, লুণ্ঠন, সন্ত্রাস ও সামাজিক অশান্তি সৃষ্টির সূতিকাগার, তা বুঝতে কারু বাকী নেই। কিন্তু এটা ছাড়া নেতৃত্ব নির্বাচনের বিকল্প কোন সুন্দর পথ জনগণের সামনে এখন খোলা নেই। তাই আমরা পাশ্চাত্যের চালু করা দল ও প্রার্থীভিত্তিক নেতৃত্ব নির্বাচন প্রথাকেই আধুনিক ও চূড়ান্ত ব্যবস্থা বলে ধারণা করেছি। অথচ এটা কখনোই চূড়ান্ত নয়। চূড়ান্ত সত্য লুকিয়ে আছে কুরআন ও হাদীছের মধ্যে। আছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের প্রদর্শিত পথে ইমারত ও শূরাভিত্তিক শাসন ব্যবস্থার মধ্যে। কিন্তু সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে চলেছি আমরা ইহূদী-খ্রিষ্টান ও মুশরিকদের আবিষ্কৃত ও গৃহীত প্রচলিত শেরেকী গণতন্ত্রের পিচ্ছিল পথে। যেখানে সার্বভৌমত্বের মালিকানা আল্লাহ্র হাতে নয়, বরং জনগণের নামে নেতা-নেত্রীর হাতে। যেখানে অধিকাংশের রায়ই চূড়ান্ত। তাই সেখানে সবধরনের আইন রচিত হয় এবং হারাম-হালাল সবকিছু নির্ণীত হয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মতি-মর্যির উপরে। আল্লাহ্র আইনকে এখানে বান্দার ইচ্ছার গোলামে পরিণত করা হয়। এ পদ্ধতির বিরুদ্ধে অবশ্যই মুমিনদের দাওয়াত ও জিহাদ-এর কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

জোটের নির্বাচনী ইশতেহারে দেশে কুরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থী কোন আইন করা হবে না বলে ওয়াদা করা হয়েছিল। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী আইন করবেন সেকথা বলেননি। তাছাড়া যেসব ইসলাম বিরোধী আইন দেশে চালু রয়েছে, সেগুলো বাতিল করবেন, সেকথাও তারা বলেননি। তাহ'লে কি ধরে নেব যে, দেশে সূদভিত্তিক অর্থনীতি বহাল থাকবে? পুঁজিবাদের এই প্রধান হাতিয়ারকে উৎখাত করতে না পারলে দেশ থেকে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব কখনোই দূর হবে না, একথা ডান-বাম সকল দল স্বীকার করলেও বাস্তবে কেউ এটার উৎখাত চান না কেবল পুঁজিপতিদের স্বার্থে। যে কারণে দেশের সকল পুঁজি পাকিস্তান আমলের ২২ পরিবারের বদলে আজকে ১৫৬ পরিবারের হাতে কুক্ষিগত হয়ে রয়েছে। জোট সরকারকে অবশ্যই এই পুঁজি দানবদের বিরুদ্ধে আপোষহীন হতে হবে। নইলে দুর্নীতি ও দারিদ্র্য বিমোচনের দাবী ফাঁকা বুলিতে পরিণত হবে। সেই সাথে দেশের বিচার ব্যবস্থাকে প্রশাসন বিভাগ থেকে পৃথক ও স্বাধীন করে দিতে হবে। সেখানে পাশ্চাত্য পদ্ধতির সংস্কার নয়, বরং ইসলামী পদ্ধতির সংস্কার আনতে হবে। দেশের

শিক্ষাব্যবস্থাকে অবশ্যই তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের ভিত্তিতে ঢেলে সাজাতে হবে। যে শিক্ষা মানুষকে আল্লাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে দেয়, যে শিক্ষা মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন না ঘটিয়ে কেবল বস্তুগত উন্নয়নের পথ দেখায়, সে শিক্ষায় কেবল মানুষরূপী শয়তান তৈরী হয়। যা কখনো দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ দেয় না।

কলিকাতার আনন্দবাজারী গ্রুপ নছীহত খয়রাত করেছেন যেন দেশে 'শরীয়তী শাসন' কায়েম করা না হয়। অথচ এটাই বাস্তব যে, শরী'আতী শাসনই কেবল মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে মানবতার সর্বাধিক কল্যাণ করে থাকে। আমরা মনে করি স্বাধীন বাংলাদেশে এবারই প্রথম সুযোগ এসেছে সংবিধান সংশোধনের। অতএব এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পৃথিবীর এই তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রটিকে 'ইসলামী খেলাফত' রাষ্ট্র ঘোষণা করুন। দেশের সকল আইনকে ইসলামী বিধানের অনুকূলে সংশোধন করুন। ইতিহাস চিরকাল আপনাদের মনে রাখবে। পরকালে আপনারা ভাল থাকবেন। ইহকালে দেশের সকল নেককার মানুষের দো'আ পাবেন, পাবেন সকলের প্রাণঢালা শুভেচ্ছা। আমরা জোট সরকারের নতুন যাত্রাকে অভিনন্দন জানাই। আল্লাহ তাদেরকে সত্যিকারের জনকল্যাণের স্বার্থে কাজ করার তাওফীক দান করুন -আমীন![৬৪]

৩৩. বিব্রত সরকার বিব্রত দেশবাসী

দুই-তৃতীয়াংশের অধিক সংসদ সদস্যের সমর্থনে ধন্য দেশের ইতিহাসে সর্বাধিক শক্তিশালী গণতান্ত্রিক সরকার বিগত ৭ মাসে তাদের প্রধান দু'টি ওয়াদা পূরণে ব্যর্থ হয়ে এখন চরম বিব্রতকর অবস্থায় পতিত হয়েছে। তাদের প্রধান দু'টি অঙ্গীকার ছিল সন্ত্রাস দমন ও দুর্নীতির উচ্ছেদ। কিন্তু ক্ষমতায় আরোহণের মধুচন্দ্রিমার ঘোর কাটতে না কাটতেই জনগণের মাঝে হতাশা দেখা দিয়েছে। ক্রমেই ক্ষোভ দানা বাঁধছে সকল মহলে। এমনকি জোট সরকারের নেতৃবৃন্দের মধ্যেও ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে। বিব্রত বোধ করছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। এক্ষণে প্রশ্ন : অসহায় জনগণ তাহ'লে যাবে কোথায়? তাদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশের একমাত্র কার্যকর মাধ্যম ভোটাধিকার

---

৬৪. ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অক্টোবর ২০০১।

তারা প্রয়োগ করেছে গত ১লা অক্টোবর'০১। নীরব এক ব্যালট বিপ্লবের মাধ্যমে তারা বড় আশা নিয়ে বর্তমান জোট সরকারকে ক্ষমতায় আসতে সহায়তা করেছিল। ৫ বছরের মধ্যে তাদের আর ভদ্রভাবে কিছুই করার নেই। কিন্তু হতাশায় বিদ্ধ হ'লে ও দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে মানুষ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যা খুশী তাই করতে চেষ্টা করে। সমাজের অধিকাংশ লোক যখন অনুরূপ অবস্থায় উপনীত হবে, তখন সৃষ্টি হবে গণ অভ্যুত্থান। ফলে তখন সংখ্যাগুরু সরকার হৌক বা জোট সরকার হৌক কোন সরকারই আর টিকে থাকতে পারবে না। এর নযীর বাংলাদেশেই রয়েছে। অতএব সরকারে ও প্রশাসনে যারা আছেন, তাদের আলস্যে দিন কাটাবার অবকাশ নেই। তাদের অবশ্যই সমস্যার গভীরে যেতে হবে এবং শক্ত হাতে পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে। দেশের বর্তমান অবস্থাকে ১৯৭২-৭৫ সালের অরাজক অবস্থার সাথে অনেকে তুলনা করেছেন। তখন শেখ মুজিব প্রায় ১০০% জনসমর্থন নিয়ে সরকারী ক্ষমতায় আসীন ছিলেন। সেই সাথে ছিল তার বিশাল ব্যক্তিত্ব, আন্তর্জাতিক পরিচিতি ও একচ্ছত্র শাসনের নিরংকুশ দলীয় ম্যাণ্ডেট। বর্তমান জোট সরকার সেদিক দিয়ে তুলনীয় না হ'লেও দুই-তৃতীয়াংশের অধিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় বিরোধী দলকে বাদ দিয়েই সংবিধান সংশোধনের মত নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী। বর্তমান যুগে কোন গণতান্ত্রিক দেশে এই ধরনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করাটাও কম ভাগ্যের ব্যাপার নয়। সরকার উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে দেশকে ইচ্ছামত পরিচালনা করতে পারে। অতএব বিরোধী দলকে তোয়াজ করার পিছনে সময় ব্যয় না করেও সন্ত্রাস ও দুর্নীতি দমনে তাঁদের কোন বাধা থাকার কথা নয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে উল্টা। সন্ত্রাস বেড়ে চলেছে বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত। সরকার পরিবর্তনের পরপরই চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা কিছুদিন ঘাপটি মেরে ছিল। অথবা পার্শ্ববর্তী দেশে নিরাপদ আশ্রয়ে বিলাসভ্রমণে সময় কাটিয়েছিল। ইতিমধ্যেই তারা সবকিছু ম্যানেজ করে নিয়ে পুরোদমে তাদের অপকীর্তি শুরু করে দিয়েছে। রাজধানীর রাজপথে প্রকাশ্য দিনমানে কীলিং স্কোয়াড নিয়মিতভাবে মানুষ খুন করে চলেছে। বিগত সরকারের আমলে দেশে প্রতিদিন ১১ জন করে খুন হ'ত বলে একটি হিসাবে বলা হয়েছিল। বর্তমানে তেমন অবস্থায় উপনীত হ'তে চলেছে বলে বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা।

ঢাকা এখন মৃত্যুপুরী। কিছুই আঁচ করার আগে সন্ত্রাসীর ব্রাশফায়ার যেকোন সময় নিরীহ মানুষের বক্ষ ঝাঝরা করে দেবে। স্কুলগামী সন্তান হাসতে হাসতে বাড়ী ফিরবে কি-না সেই আশংকায় বাপ-মায়ের আরাম হারাম হয়ে যায়। বন্ধুর হাতে বন্ধু খুন হওয়াটা এখন খুনের সহজ পদ্ধতি হিসাবে গণ্য হয়েছে। ৭ম শ্রেণীর বাচ্চা ছেলে শিহাবকে খুন করে টুকরা টুকরা করেছে তারই সমবয়সী বন্ধুরা অত্যন্ত ধীর মস্তিষ্কে। আশুলিয়ায় নৌকা ভ্রমণে ডেকে এনে হত্যা করে পানিতে ছুঁড়ে ফেলেছে বা গাযীপুর চিড়িয়াখানায় বেড়াতে এনে হত্যা করে ফেলে রেখে গেছে যারা, তারা সবাই সমবয়সী এবং ছোট থেকেই বিশ্বস্ত বন্ধু।

গত ৯ই মে ঢাকায় রাস্তার ধারে দাঁড়ানো পিতার কোলে থাকা বিশ মাসের কচি মেয়ে নওশীন সন্ত্রাসীর এলোপাতাড়ি গুলিতে নিহত হয়েছে। ১০ই মে শুক্রবার বেলা ১১-টায় মীরপুরের নবনির্বাচিত ওয়ার্ড কমিশনার তরুণ যুবক ছায়েদুর রহমান নিউটন নিহত হয়েছেন। রাজধানী সহ সারা দেশের বিবেকমান মানুষ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। আরও বিস্মিত হয়ে গেছে সবাই কাঁটা ঘায়ে নূনের ছিটার মত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যে। তিনি নওশীনের পিতাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেছেন, ছবর করুন। আল্লাহ্র মাল আল্লায় নিয়ে গ্যাছে। গুলিটা ভুলক্রমে বাচ্চার গায়ে লেগেছে'। এ সত্য কথাটি যে সন্তানহারা পিতার জন্য কত নির্মম তা কে না জানে? এতে সন্ত্রাসকে আরও উস্কে দেবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হবেন সন্ত্রাসীদের আযরাঈল স্বরূপ। আর তিনি যদি এভাবে ওয়ায শুনাতে থাকেন, তাহ'লে ওদের টুটি চেপে ধরবে কে? পিতার কোলে শিশু নওশীন হত্যা ফোরাত নদীর তীরে হোসায়েন কোলে শিশু আছগার হত্যার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দেশ কি তবে কারবালা হ'তে চলেছে?

এছাড়াও ডবল মার্ডার, ট্রিপল মার্ডার, এইট মার্ডার, ধর্ষণ, গণধর্ষণ, অপহরণ, পত্র লিখে বা টেলিফোনে হুমকি দিয়ে চাঁদা আদায়, গৃহ নির্মাণ চাঁদা, ব্যবসা করার চাঁদা, জমি কেনার চাঁদা ইত্যাকার সন্ত্রাসী চাঁদাবাজির সাথে যোগ হয়েছে ফাইল চেপে রেখে বা আইনের ভয় দেখিয়ে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাঁদাবাজি, ঘুষ ও দুর্নীতির অবাধ প্রতিযোগিতা। সরকারী প্রশাসনযন্ত্র এখন শোষণযন্ত্রে পরিণত হয়েছে। সরকারী অফিসে ঘুষ ছাড়া কোন কাজ হয়, একথা হলফ করে বলা যাবে না। সর্বোচ্চ পদাধিকারী ও মহা

সম্মানের আসনে উপবিষ্ট মন্ত্রীদের ব্যাপারেও নানা কথা শোনা যায়। দেশের গুণীজনদের চাইতে দলীয় ক্যাডার ছোকরাদের দেখলে তাদের মুখে বিরল হাসি ফুটে ওঠে। ইলেকশনের পূর্বে দেওয়া শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার সেই গরম গরম বক্তৃতা সচিবালয়ের এসি কক্ষে হিমশীতল হয়ে হারিয়ে গেছে। দেশ যেন চলছে নিতান্তই ভাগ্যের জোরে হাতে গণা কিছু সৎ মন্ত্রী, আমলা, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের ত্যাগে ও সাহসিকতায়। যদিও এসব লোকদের কোন মূল্যায়ন সমাজে ও প্রশাসনে তেমন নেই বললেই চলে।

সন্ত্রাস ও দুর্নীতির এই ব্যাপক উত্থান ও অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে যাবার পিছনে পর্যবেক্ষক মহল কয়েকটি কারণ চিহ্নিত করেছেন। (১) সরকারের ভিতরে গোষ্ঠীকেন্দ্রিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রবণতা (২) মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদের মধ্যে সমন্বয়হীনতা। যেহেতু দু'জন বাদে সবাই একদলীয়, সেহেতু এমনটি হওয়া প্রত্যাশিত ছিল না (৩) প্রশাসনের সর্বত্র রাজনৈতিক ও মেধাগত যোগ্যতা বিবেচনা না করে অর্থের বিনিময়ে নিয়োগ-বদলীর ঘটনা। বলা চলে যে, এর মধ্যেই পতনের বীজ লুক্কায়িত রয়েছে। কারণ ঘুষ টাইমবোমার চাইতে ধ্বংসকারী (৪) সুবিধাবাদীদের বেপরোয়া তৎপরতা। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে মন্ত্রণালয়ে তদ্বিরকারীদের টিকিটি দেখা যেত না। এখন তদ্বিরের অত্যাচারে মন্ত্রী, এমপি ও সচিবদের জীবন ওষ্ঠাগত। এতেই বুঝা যায় দেশে আইনের শাসনের নামে এখন দলনেতাদের শাসন চলছে। যা সুবিধাভোগীদেরকে উৎসাহিত করবে (৫) অনেকেই বর্তমান অবস্থার জন্য চিহ্নিত মহলের সুপরিকল্পিত অপতৎপরতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। বিষয়টি একেবারেই 'ওপেন সিক্রেট'। প্রশাসন ও সরকারী দলের নীতি নির্ধারকগণ তাদেরকে জানেন ও তাদের অপতৎপরতা ও কূটকৌশল সম্পর্কে পূর্ব থেকেই অবহিত। তবুও তাদেরকে এ সুযোগ তারা কেন দিচ্ছেন এটাই জনগণের প্রশ্ন (৬) সরকার সমর্থক নিবেদিতপ্রাণ পেশাজীবিদের প্রতি অবজ্ঞা ও নীতি-নির্ধারকদের গণ্ডিবদ্ধ কোটারী চিন্তা-ভাবনা (৭) ক্ষমতাসীন দলের প্রায় সর্বস্তরে অধিকাংশের মধ্যে রাতারাতি বিত্ত-বৈভবের মালিক হওয়ার প্রবল উচ্চাশা (৮) অপরিপক্কদের হাতে যরূরী ও গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ফাইল সমূহ আটকে পড়ায় সিদ্ধান্ত দানে বিলম্ব হওয়া প্রভৃতি।

এ বিষয়ে আমাদের পরামর্শসমূহ নিম্নরূপ :

(১) ৬০ সদস্যের বিশাল মন্ত্রীসভার আকৃতি ছোট করুন এবং দলের হৌক বা দলের বাইরের হৌক সত্যিকারের দেশপ্রেমিক, আল্লাহভীরু ও যোগ্য লোকগুলিকে বাছাই করে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে দ্রুত নিয়োগ দান করুন (২) ঘুষ, বখশিস ও পার্সেন্টেজ খাওয়ার বিরুদ্ধে স্তর নির্বিশেষে সকলের প্রতি কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করুন (৩) একক ইসলামী শিক্ষা ও স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা চালু করুন (৪) সর্বোপরি দেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য কঠোর ও দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে এগিয়ে চলুন। মনে রাখতে হবে, চিরকাল এই জোট সরকার ক্ষমতায় থাকবে না। অতএব বর্তমানের এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে যদি তারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, তাহ'লে তারা যেমন জনগণের নিঃস্বার্থ দো'আ পাবেন, তেমনি আল্লাহ্র রহমত লাভে ধন্য হবেন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন![৬৫]

৩৪. জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণ করুন

ড্রাইভার গাড়ী স্টার্ট দেওয়ার পূর্বেই তার লক্ষ্য নির্ধারণ করে নেয়। অতঃপর গিয়ারে দেওয়ার সাথে সাথে লক্ষ্যপথে এগিয়ে চলতে থাকে। লক্ষ্য নির্ধারণ না করে গাড়ী ছাড়লে এক্সিডেন্ট অবশ্যম্ভাবী। গাড়ী চালকের এই ভূমিকার সাথে রাষ্ট্র চালকের তুলনা করা চলে। ব্যক্তি হৌক বা দল হৌক চালকের ভূমিকায় যিনি বা যাঁরা থাকবেন, তাদেরকে প্রথমে লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার সময় তার নেগেটিভ কারণ ছিল হিন্দুদের অত্যাচার থেকে মুসলমানদের বাঁচানো। আর পজেটিভ কারণ ছিল ইসলামী বিধান অনুযায়ী শাসিত একটি মডেল ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু পাকিস্তান লাভ করার পর ড্রাইভারের সীটে বসা ব্যক্তিগণ তাদের ঘোষিত লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হ'লেন এবং 'ইসলাম' তাদের একটি পলিটিক্যাল স্ট্যান্ট হয়ে দাঁড়ালো মাত্র। কথায় কথায় ইসলামের দোহাই দিলেও ইসলামের উল্লেখযোগ্য কোন বিধান তাঁরা রাষ্ট্রীয়ভাবে চালু করেননি। লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হওয়ায় পাকিস্তানের চলমান গাড়ী মাত্র ২৪ বছরের মাথায় এক্সিডেন্ট করে ভেঙ্গে দু'টুকরো

৬৫. ৫ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, জুন ২০০২।

হয়ে গেল। অথচ তাদের নেতারাই একসময় গর্ব করে বলতেন, 'পাকিস্তান টিকে থাকার জন্যই এসেছে'। এর উপরে জনগণের আবেগ সৃষ্টি করার জন্য বলতেন, 'পাকিস্তান ইসলামের নামে সৃষ্ট। এর রক্ষক স্বয়ং আল্লাহ'। এই নিখাদ সত্যগুলির পিছনে লুকিয়ে ছিল নেতাদের স্বার্থপরতা, দায়িত্বহীনতা, বিলাসিতা ও লক্ষ্যহীন মানসিকতা। তবুও বলব, পাকিস্তানীদের একটি ঘোষিত লক্ষ্য ছিল, 'ইসলাম'। যা জনগণের মুখে মুখে ফিরতো। ১৯৬৫ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর ঐতিহাসিক পাক-ভারত যুদ্ধের প্রাক্কালে আইয়ূব খানের ইসলামী আবেগপূর্ণ গুরুগম্ভীর রেডিও ভাষণ যারা স্বকর্ণে শুনেছিলেন, মনে হয় আজও তাদের কানে সে ভাষণের ঝংকার ধ্বনি শুনতে পাবেন। তাদের প্রাণে সে ভাষণের আবেগ অনুভব করবেন। সমস্ত দেশ সে ভাষণের সাথে একাট্টা হয়ে গিয়েছিল। ঐ ছোট বেলায় আমরা তরুণ ছেলেদের মাঠে জড়ো করে লেফট-রাইট করেছি। ভারতীয় যুদ্ধ বিমান উড়তে দেখলেই আকাশে তীর-গুলতিতে ঢিল ছুঁড়ে মেরেছি। অর্থাৎ রাষ্ট্রনেতার সাথে প্রজা সাধারণের হৃদয়ের আবেগ একাকার হয়ে সেদিন যে মহাশক্তির উত্থান ঘটেছিল, তার কাছে পরাজয় ঘটেছিল বিশাল ভারতের সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর। আমরা নির্দ্বিধায় বলব, সেই বিপদের দিনে পাকিস্তানের জাতীয় ঐক্যের একমাত্র সেতুবন্ধন ছিল 'ইসলাম'। একে অস্বীকারকারী ব্যক্তি দিবসে সূর্য না দেখা চামচিকা ছাড়া কিছুই নয়। আজকের ন্যায় তখনও এদেশে হিন্দুরা বসবাস করত। তাদের দেশপ্রেম মোটেই কম ছিল না। মুসলমান প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভাই-ভাই হিসাবে তারা একত্রে সামাজিক জীবন যাপন করত। দাদা-কাকা, পিসি-মাসী ইত্যাদি স্নেহমাখা আহ্বান এখনো কানে শুনতে পাই। হিন্দু-মুসলিম দুই প্রতিবেশী কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে কাউকে কখনো বাদ দিত বলে জানতাম না। একে অপরের বিপদে সর্বদা এগিয়ে যেত। 'পাকিস্তানী' বলে গর্ব করতে সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে কখনো সংকোচ দেখিনি। অবশ্য স্বার্থপর দুষ্টমতি লোকদের কথা স্বতন্ত্র।

পক্ষান্তরে আজকে যদি বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দকে জিজ্ঞেস করি, বাংলাদেশের জাতীয় লক্ষ্য কি? এদেশের জাতীয় ঐক্যের মানদণ্ড কি? তখন মুজিবপন্থীরা বলবেন, 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ'; জিয়াপন্থীরা বলবেন 'জাতীয়তাবাদ';

ইসলামপন্থীরা বলবেন 'ইসলাম'। যারা কোন পন্থী নয়, তারা বলবেন চাই দু'মুঠো ভাত। ফলে সরকার আসছে আর যাচ্ছে, দেশের কোন উন্নতি নেই। জনগণের মধ্যে জাতীয় ঐক্য নেই। নেই কোন জাতীয় ভিত্তিক রাজনৈতিক লক্ষ্য। যখন যে দল ক্ষমতায় আসে, তখন সে দল তার নিজের মত করে শিক্ষা ও প্রশাসন ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে চায়। কিন্তু বিরোধী দলের তোপের মুখে পড়ে সে দলটি সাফল্য ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে তার পাঁচ বছর সময়সীমা অতিবাহিত করে। পরবর্তী সরকার এসে একইভাবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পথ চলে। এভাবে একটি দেশ জাতীয়ভাবে পঙ্গু হয়ে যায়। বাংলাদেশের অবস্থাও তাই।

বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতায় আসলে দেশপ্রেমিক জনগণ আশায় বুক বেঁধেছিল। এখনো যে তারা সম্পূর্ণ হতাশ হয়েছে, তা নয়। কিন্তু আশানুরূপ কিছু না পেয়ে অনেকে মুষড়ে পড়েছেন। আমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হবো না। বরং সরকার ও প্রশাসনে যারা আছেন, তাদের সুমতি ও হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করব।

আমরা বলব, জোট সরকারকে সবার আগে জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। তাঁরা কোন্ মত-পথের উপরে দেশ পরিচালনা করবেন, সে বিষয়ে আগে নিজেরা পরিষ্কার হ'তে হবে। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে Anti-Indian ও Pro-Indian দু'টি ধারা এ দেশে কাজ করে। বর্তমান জোট সরকার ১ম ধারার সমর্থকদের এবং বিগত সরকারের যুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে আবেগ সঞ্জাত। বলা চলে এগুলি কোন আদর্শিক সমর্থন নয়। বরং এক প্রকার নেগেটিভ সমর্থন। আর নেগেটিভ সমর্থন মূলতঃ স্থায়ী কোন সমর্থন নয়। যা মস্তিষ্কে আঘাত করলেও হৃদয়ে রেখাপাত করে না।

বিদ্যমান সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধি নয়, দল প্রতিনিধিরা সংসদে প্রবেশ করেন। যাদের অধিকাংশ সংসদকে ব্যবহার করেন তাদের ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থে। যারা জাতীয় সংসদের বৈঠকে যোগদানের চাইতে ও সংসদীয় কার্যক্রমকে প্রাণবন্ত করার চাইতে সচিবালয়ে তদ্বিরের কাজেই সময় ব্যয় করেন বেশী। ভোটে নির্বাচিত হওয়ার অহংকারে তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করেন। ভোটাররা যেন তাদের পাঁচ বছর লুটপাটের লাইসেন্স দিয়েছে। সরকারী ও বিরোধী দল পরস্পরের বিরোধী হওয়ায় দুই দলের ঝগড়ার ক্ষেত্র হিসাবে জাতীয় সংসদকে ব্যবহার করা হয়। অতএব এটা নিশ্চিত যে,

দলতন্ত্রের দ্বারা কখনোই জাতীয় ঐক্য সম্ভব নয়। জাতীয় সংসদে বসে ঠাণ্ডা মাথায় কোন বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়াও বর্তমান পদ্ধতিতে সম্ভব নয়। 'বহু সত্যে'র ধারণা (Plurality of truth) মানব সমাজে বিশৃংখলা বৈ ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় না। কেননা মানব রচিত কোন বিধান আত্মকেন্দ্রিক সংকীর্ণতার কারণে কখনোই সার্বজনীনতায় রূপ নিতে পারে না। একমাত্র আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধানের মধ্যেই সার্বজনীন সত্য পাওয়া সম্ভব। কিন্তু কোন দলই তাকে উদারভাবে গ্রহণ করতে পারছে না, স্ব স্ব ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থ এবং সীমাহীন লালসা চরিতার্থের পথে বাধা সৃষ্টি হবার আশংকায়। আমরা মনে করি বাংলাদেশের জাতীয় সংহতি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথই হ'ল ইসলাম। এজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন ইসলামের ব্যাপক ও উদার Concept ভিত্তিক একটি কল্যাণমুখী রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং সেই লক্ষ্যে সর্বাগ্রে শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো। নিঃসন্দেহে সেই শিক্ষাব্যবস্থা হ'তে হবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে। প্রগতির নামে কোন বিজাতীয় মতবাদ কিংবা ইসলামের নামে কোন মাযহাবী বা মারেফতী সংকীর্ণতাবাদ সেখানে চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। বর্তমানের সরকারী ও বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক সমাজ ব্যবস্থার অন্ধ গলিপথ থেকে বেরিয়ে জনগণকে ইসলামের উদার ও আলোকোজ্জ্বল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। ইসলামী খেলাফতের স্বর্ণোজ্জ্বল দিনগুলি ফিরিয়ে আনতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হ'লে ইনশাআল্লাহ আমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ প্রাপ্ত হব। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন![৬৬]

৩৫. ইসলামী খেলাফত : জাতির নিকটে আমাদের প্রস্তাব

খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে খুলাফায়ে রাশেদীনের স্বর্ণযুগ শেষ হওয়ার পর থেকে মন্দের ভাল হিসাবে হ'লেও উমাইয়া, স্পেনীয়, আব্বাসীয়, ফাতেমীয় এবং ওছমানীয়দের ইসলামী খেলাফত বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত বহাল ছিল। তুরস্কের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী নেতা কামাল পাশার নেতৃত্বে যার পতন ঘটে। এভাবে ১৯২৪ সালে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নকদের হাতে ওছমানীয় খেলাফতের পতনের পর ভারতীয় উপমহাদেশে খেলাফত

---

৬৬. ৫ম বর্ষ, ১১তম সংখ্যা আগষ্ট ২০০২।

পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু হয়। এতে মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ চেতনার ব্যাপক উন্মেষ ঘটে। যা পরবর্তীতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় সুস্পষ্টভাবে বারি সিঞ্চন করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সেখানে স্বাধীন ও বাধাহীন পরিবেশে ইসলামী খেলাফত বা ইসলামী হুকুমত কায়েম হবার বুকভরা স্বপ্ন দেখেছিল পাকিস্তানী জনগণ। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানহীন ও দুনিয়াসর্বস্ব চতুর নেতাদের ধূর্তামির নীচে সরল-সিধা সাধারণ জনগণের পবিত্র আকাংখা সমূহ একে একে পিষ্ট হ'তে থাকে এবং এক পর্যায়ে তা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ঘোষিত লক্ষ্যের সাথে বেঈমানী করার ফল হাতেনাতে পেয়েছেন নেতৃবৃন্দ। দেশটি দু'টুকরো হয়েছে। মূল নেতারা মর্মান্তিকভাবে বিদায় হয়ে গেছেন চিরতরে।

আজ স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একই ভূখণ্ডে একই ভাব-ভাষার ও একই আবহাওয়াগত পরিবেশে এত ঘনবসতিসম্পন্ন বিপুল সংখ্যায় মুসলমানের বাস পৃথিবীর কোন দেশে নেই। আমাদের সাধারণ ঐক্যের একটিই মাত্র আদর্শিক সেতুবন্ধন হ'ল 'ইসলাম'। এই বরকতময় ও পবিত্র বন্ধনকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আমরা ইচ্ছা করলে সকল মানুষের জন্য কল্যাণকর একটি প্রশাসন উপহার দিতে পারি। কেননা এটা সকল জ্ঞানী ব্যক্তি স্বীকার করে থাকেন যে, ইসলাম একটি বিশ্বজনীন জীবনাদর্শের নাম, যা আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে বিশ্ব মানবতার কল্যাণের জন্য প্রেরিত হয়েছে। যার মধ্যে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক বিধি-বিধানসমূহের মৌলিক ও চিরস্থায়ী হেদায়াত সমূহ পেশ করা হয়েছে। ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত না হ'লে মানুষ ইসলামের কল্যাণ বিধান সমূহের সুফল হ'তে বঞ্চিত হয়। যা ব্যাপক সামাজিক বিপর্যয়ের কারণ হয়। আমরা যার বাস্তব শিকারে পরিণত হয়েছি।

'খেলাফত' অর্থ প্রতিনিধিত্ব। ইসলামী খেলাফত হ'ল : আল্লাহ্‌র যমীনে আল্লাহ্‌র বান্দাদের উপরে আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থার নাম। খেলাফতের আমীর আল্লাহ্‌র বিধান সমূহকে আল্লাহ্‌র বান্দাদের উপরে প্রয়োগ করে থাকেন আল্লাহ্‌র বান্দাদের সম্মতিক্রমে। যা খেলাফতের অধীনে বসবাসরত মুসলিম-অমুসলিম সকল নাগরিকের জন্য হয়ে থাকে সমভাবে কল্যাণকর।

ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠায় প্রধান বাধাগুলি চিরকাল ছিল একই। তারা হ'লেন : ধর্মনেতা, সমাজনেতা, রাজনৈতিক নেতা ও অর্থনৈতিক নেতাগণ।

আজও এ সকল বাধা বিদ্যমান আছে। তবুও একটি সহজ পন্থা আমরা বর্তমান জোট সরকারের নিকটে পেশ করতে পারি। সেটি এই যে, তারা সকলে একমত হয়ে বাংলাদেশে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। এ বিষয়ে তারা 'গণভোট' নিতে পারেন। ইনশাআল্লাহ গণভোটে তারা জয়ী হবেন।

অতঃপর ইসলামী সংবিধান রচনার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করবেন। সেই কমিটিতে 'আহলেহাদীছ' 'হানাফী' সকলের প্রতিনিধি থাকবেন। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য তফসিলী জাতির প্রতিনিধিও গ্রহণ করা যেতে পারে। বিশেষজ্ঞদের প্রণীত এ সংবিধানের কপি তারা প্রকাশ করবেন ও তার উপরে জনগণের লিখিত পরামর্শসমূহ আহ্বান করবেন। অতঃপর সুনির্দিষ্টভাবে প্রণীত ইসলামী সংবিধান জাতীয় সংসদে পেশ করবেন ও সেখানে পাশ হবার পর তা বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করবেন। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে তাদের বেশীর বেশী এক বৎসর সময় লাগবে।

উল্লেখ্য যে, এই কাজ অনেকটা এগিয়ে রেখেছেন মরহূম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান 'ধর্মনিরপেক্ষতা'-কে সংবিধান থেকে বাদ দেওয়ার মাধ্যমে। আরও এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট এরশাদ ইসলামকে 'রাষ্ট্রধর্ম' ঘোষণার মাধ্যমে। তাছাড়া এবারের জাতীয় নির্বাচনে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সহ সকল দলই 'ইসলামের পরিপন্থী কোন আইন করবেন না' বলে জাতির নিকটে ওয়াদা দিয়েছিলেন। অতএব এই অনুকূল পরিবেশে জাতীয় সংসদে দুই তৃতীয়াংশের অধিক আসনের অধিকারী জোট সরকারের জন্য 'ইসলামী খেলাফত' প্রতিষ্ঠার প্রয়াসই হবে তাদের সবচাইতে বড় ও স্মরণীয় কীর্তি। এর মাধ্যমে তারা শুধু বাংলাদেশের নয়, বিশ্বের তাবৎ মুসলিম উম্মাহ্র দো'আ পাবেন। এটি ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মুসলিম দেশে একটি 'মডেল' হিসাবে গৃহীত হ'তে পারে। পরবর্তীতে 'ইসলামী সম্মেলন সংস্থা'র সদস্য দেশ সমূহের মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে একটি বৃহত্তর 'ইসলামী খেলাফত' প্রতিষ্ঠিত হবার পথ সুগম হ'তে পারে। এর ফলে আল্লাহ্র রহমতে মুসলমানদের হারানো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি আবারো ফিরে আসতে পারে। ইসলাম সহজেই বিশ্বশক্তি হিসাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে।

ইসলামী শাসনের কল্যাণ স্পর্শে জগৎ সংসার ধন্য হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন- আমীন![৬৭]

৩৬. হে আল্লাহ! সৎ ও সাহসী নেতা দাও

আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ সংস্থা ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনালের সাম্প্রতিক (৭.৯.২০০৩ইং) রিপোর্ট অনুযায়ী পরপর তিন বছর বাংলাদেশ দুর্নীতিতে বিশ্বে ১নং হিসাবে হ্যাট্রিক করেছে। যা সারা বিশ্বে আমাদের ভাবমূর্তিকে ভূমিতে লুটিয়ে দিয়েছে। বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত দুর্নীতি ও সন্ত্রাস বর্তমানে দেশব্যাপী ছেয়ে গেছে। লোমহর্ষক খবর পড়তে পড়তে এখন আর কোন কিছুই লোমহর্ষক বলে মনে হয় না। গত রামাযানে 'ক্লীনহার্ট অপারেশন' চালু থাকার ফলে যেখানে মানুষ নিশ্চিন্তে বাজার-ঘাট করেছে ও নিশ্চিন্তে নিজ ঘরে ঘুমাতে ও ইবাদত করতে পেরেছে, এবছরের রামাযানে সেখানে একই পরিবারের ৪ জনকে ও অন্যস্থানে ১১ জনকে স্ব স্ব গৃহে জীবন্ত পুড়িয়ে কয়লা বানানো হয়েছে এবং অন্যত্র ঘুমন্ত অবস্থায় ৫ জনকে জবাই করে হত্যা করা হয়েছে। সর্বোচ্চ অপরাধের হিসাবের সাথে অন্যান্য অপরাধের অনুমান করা খুবই সহজ। আগামী বছরের জুন মাসের পর যে আন্তর্জাতিক হিসাব আসবে, সেখানেও বাংলাদেশ পুনরায় দুর্নীতিতে বিশ্বে এক নম্বর হবে, এটা একপ্রকার নিশ্চিতভাবে বলা চলে।

কিন্তু আমরা কি কেবল দুঃখ করেই ক্ষান্ত হব? আমরা কি কখনোই এসবের প্রতিকারের কোন সক্রিয় ব্যবস্থা নেব না? দেশে কি সৎ ও যোগ্য লোক বলে কেউ নেই? তারা কেন আজ দূরে? অথবা ভিতরে থেকেও তারা কেন কাজ করতে পারছে না? এর জবাব আমরা দু'ভাবে দিতে পারি। ১- পদ্ধতিগত কারণে মেধাসম্পন্ন, সৎ ও যোগ্য লোকেরা প্রশাসন ও সামাজিক নেতৃত্ব থেকে দূরে থাকেন। একই কারণে ভেতরকার সৎ ও যোগ্য লোকেরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন না। ২- আদর্শগত কারণে যোগ্য লোকেরা সর্বদা নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করেন। প্রথমোক্ত কারণটির বাস্তবতা হ'ল এদেশের প্রচলিত দলীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা। আগে রাজনীতি পরিচালিত হ'ত জনকল্যাণে। এখন সেটা হয় আত্মকল্যাণে ও দলকল্যাণে। জনগণের খেদমত

৬৭. ৫ম বর্ষ, ১২তম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০২।

করার একটা পবিত্র প্রেরণা ছিল রাজনীতিকদের হৃদয়ে, কথায় ও কাজে। ফলে রাজনীতিকগণ ছিলেন জনগণের সেবক ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। মন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টগণ ছিলেন জনগণের চোখের মণি। তাদের আগমনের খবর শুনলে মানুষ ছুটে যেত হৃদয়ের টানে। কিন্তু এখন তাদের গাড়ী বহর যেতে দেখলে মানুষ নানা মন্তব্য করে। রেডিওতে তাদের ভাষণ হ'লে মানুষ মুখ ফিরিয়ে নেয়। একদিন হরতালে দেশের ৪৫০ কোটি টাকার মত ক্ষতি হয়। অথচ রাজনীতিকরা জনগণের কল্যাণে হরতাল ডাকার মত মিথ্যাচার করেই চলেছেন অহরহ। গাড়ী ভাঙ্গা ও জ্বালাও-পোড়াও-এর এই হরতালের নাম এখন লোকেরা দিয়েছে 'ভয়তাল'।

দ্বিতীয় কারণটির বাস্তবতা এই যে, মানবতার সুউচ্চ আদর্শ, যা মানুষকে পশু থেকে পৃথক করে, তা থেকে আমরা বহু দূরে ছিটকে পড়েছি। একজন মানুষ তার বংশ, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা বা দলীয় পরিচয় যাই হৌক না কেন, সবার উপরে সে একজন মানুষ। আল্লাহ্র নিজ হাতে গড়া প্রিয় সৃষ্টি সে *(ছোয়াদ ৩৮/৭৫)*। তাকে অসম্মান করা মানে আল্লাহ্র প্রিয় সৃষ্টিকে অসম্মান করা। প্রত্যেক মানুষ একই আদম-হাওয়ার সন্তান হিসাবে অন্য মানুষের ভাই। এই আদর্শ চেতনা আজ ভূলুণ্ঠিত হয়ে গেছে। রামাযানের পবিত্র দিনে রাজধানীর বুকে শত শত মানুষ ও পুলিশের সামনে একজন তরতাযা তরুণকে আরেকদল মানুষ পিটিয়ে হত্যা করছে আর হিংস্র উল্লাস করতে করতে নির্বিবাদে চলে যাচ্ছে। যে মরল সে একজন মানুষ, সে এক স্নেহশীল বাপ-মায়ের কলিজার টুকরা সন্তান, সে তার ভাই-বোনের অতি আদরের ধন। পেটের তাকীদে বা অসৎ সংস্পর্শে কিংবা দলীয় নেতার নির্দেশের বা কোন চক্রান্তের শিকার নিরপরাধ তরুণ সে। কিন্তু সবকিছুর ঊর্ধ্বে তার বড় পরিচয় সে একজন মানুষ। সে মার খেতে খেতে বারবার কাকুতি-মিনতি করে মানুষের নিকটে মানবতা ভিক্ষা করছিল। কিন্তু তার অন্তিম বাসনা ও করুণ আকুতি ঐ মানুষ নামধারী হায়েনাদের হৃদয় স্পর্শ করেনি। রাজধানীর মতিঝিলের ব্যস্ততম সড়কের উপরে এক হোণ্ডারোহীকে সন্ত্রাসীরা হোণ্ডার তেল ঢেলে দিয়ে হোণ্ডা সমেত তার আরোহীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারল। সে বারবার আগুন থেকে বেরিয়ে বাঁচতে চাচ্ছিল। আর ঐ হিংস্র শ্বাপদেরা তাকে লাথি মেরে আগুনের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। একসময় তার দেহটি পুড়ে কয়লা হয়ে গেলে সন্ত্রাসীরা চলে গেল

উল্লাস করতে করতে। ক্যামেরাবন্দী ছবি পত্রিকায় দেখে মানুষ আঁতকে উঠেছে। কিন্তু আঁতকে ওঠেনি মানুষরূপী ঐ দ্বিপদ জীবগুলি যারা এ নৃশংস কাজটি করল। আঁতকে উঠেনি প্রশাসন, যাদের দায়িত্ব ছিল মানুষটিকে তার মানবিক মর্যাদায় বাঁচিয়ে রাখার। মাত্র কয়দিন আগে একটি সিটি কর্পোরেশনের অভিজাত হোটেলে নিয়মিত দেহ ব্যবসা বন্ধ করার জন্য স্থানীয় ছেলেরা অনুরোধ করতে গেলে হোটেল মালিক ও পুলিশের যোগসাজশে ঐ আদর্শবান তরুণগুলি এখন হাজত বাস করছে। সমাজ বিজ্ঞানের ভাষায় এগুলি হ'ল 'বিচ্যুত আচরণ তত্ত্বে'র বহিঃপ্রকাশ। মানুষের দুনিয়াবী স্বার্থ যখন প্রবল হয়, তখন সে মানবিক মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত হয় এবং সে হিংস্রতম পশুর চাইতে নিম্নস্তরে চলে যায়।[৬৮] বস্তুবাদী রাজনীতির মূল স্পিরিট হ'ল 'দুনিয়া'। যাকে হাদীছে মৃত লাশের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যাকে শকুনের দল ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়।[৬৯]

Farrie Heady নামক জনৈক গবেষক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন যে, ইউরোপের সুইজারল্যাণ্ডের আমলারা প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিষ্টান দর্শন এবং চীনের আমলারা কনফুসিয়াস ধর্ম দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কারণে ঐসব দেশে আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি খুবই কম। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের আমলারা ধর্মনিরপেক্ষ দর্শনের অনুসারী হওয়ায় তাদের শতকরা ৮০ ভাগ দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাতের দায়ে অভিযুক্ত'। একইভাবে এদেশের রাজনীতিক ও আমলাদের পেশাগত বিশ্ব দর্শন বা Professional Worldview নিতান্তই অস্পষ্ট। 'ইসলাম' সম্পর্কেও তাদের ধারণা একেবারেই শিশুসুলভ। এসবের বাইরে যারা দু'চারজন থাকেন, জাতীয় রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মত ক্ষমতা তাদের নেই। শক্তিশালী লুটেরাদের অসহায় দর্শক হিসাবে অথবা তাদের সেফগার্ড হিসাবে কিংবা সরকারের বা প্রশাসনের সততার প্রতীক হিসাবে তাদেরকে উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করা হয় মাত্র।

তাহ'লে দেশকে দুর্নীতির পঙ্ক থেকে উদ্ধারের উপায় কি? নিশ্চয়ই উপায় রয়েছে এবং এটি আমাদের ঘরেই রয়েছে। আর সেটি হ'ল আখেরাতভিত্তিক

৬৮. আ'লা ৮৭/১৬, ত্বীন ৯৫/৪, আ'রাফ ৭/১৭৯।
৬৯. মুসলিম হা/২৯৫৭; মিশকাত হা/৫১৫৭ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়।

জীবন দর্শনে উজ্জীবিত হওয়া। নেতা হই বা কর্মী হই আমাদের প্রত্যেকের প্রতিটি কাজ হৌক আখেরাতের লাভ-লোকসান ভিত্তিক। যেকাজে জান্নাত লাভ হবে, সেকাজ করব, যেকাজে জান্নাত হারাতে হবে, সে কাজ করব না, এটাই হৌক আমাদের দিগদর্শন। আমাদের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সার্বিক জীবন নীতির মূল দর্শন হৌক আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন। তা করতে গেলে যাবতীয় শয়তানী বাধা ও ত্বাগূতী লোভ-লালসা ও চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রকে দলিত-মথিত করে আপোষহীনভাবে এগিয়ে যেতে হবে সম্মুখ পানে। ঘুষের অর্থ, মদিরার আকর্ষণ, সুন্দরীর চকিত চাহনি সবই ম্লান হয়ে যাবে জান্নাতের সুগন্ধি লাভের দুর্নিবার আকাংখার সম্মুখে। বৃটেনের কোন লিখিত সংবিধানই নেই। তারা চলছে যুগ যুগ ধরে তাদের স্ব স্ব বিশ্বাস ও ঐতিহ্যকে লালন করে। আমরাও চলতে পারি আমাদের স্ব স্ব ধর্ম দর্শনকে বুকে ধারণ করে।

অতএব এদেশের মানুষের লালিত ইসলামী দর্শন অনুযায়ী দেশ পরিচালনায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হৌন। আখেরাতে মুক্তির লক্ষ্যে রাজনীতি করুন। আল্লাহ্র বিধান বাস্তবায়নে কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। হে আল্লাহ আমাদের সৎ, যোগ্য ও সাহসী নেতা দিন- আমীন![৭০]

৩৭. সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী বনাম অষ্টম সংশোধনী

গত ১৬ই মে রবিবার বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী বিল ২০০৪ পাস হয়ে গেল। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ইসলামী ঐক্যজোট, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (মঞ্জু), জাতীয় পার্টি (এরশাদ) ও স্বতন্ত্র তিনজন সহ সংসদে উপস্থিত ২৬৬ জন সদস্য একযোগে উক্ত বিলে সম্মতি প্রদান করেছেন। প্রধান বিরোধী দল (আওয়ামী লীগ) তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে উক্ত বিলের বিরোধিতা করেছে।

কিন্তু আমরা উক্ত বিলের প্রধান দু'টি বিষয়ের বিরোধিতা করছি আল্লাহ প্রেরিত ইলাহী বিধানের বিরোধী হওয়ার কারণে। সেটি হ'ল সকল সরকারী অফিস ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর ছবি টাঙ্গানো এবং জাতীয় সংসদে ৪৫টি মহিলা এম.পি-র আসন সংরক্ষিত রাখা। কারণ প্রথমতঃ

---

৭০. ৭ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা ডিসেম্বর ২০০৩।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘ঐ ঘরে (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করে না যে ঘরে (সাধারণ) কুকুর থাকে কিংবা (প্রাণীর) ছবি থাকে’।[৭১] তিনি বলেন, প্রত্যেক ছবি প্রস্তুতকারী জাহান্নামী। তার প্রস্তুতকৃত প্রতিটি ছবিতে (ক্বিয়ামতের দিন) রূহ প্রদান করা হবে এবং জাহান্নামে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে’। অতঃপর রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) প্রশ্নকারীকে বলেন, যদি তুমি একান্তই ছবি তৈরী করতে চাও, তাহ’লে বৃক্ষ-লতা বা এমন বস্তুর ছবি তৈরী কর, যাতে প্রাণ নেই’।[৭২] মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় গৃহে (প্রাণীর) ছবিযুক্ত কোন জিনিসই রাখতেন না। দেখলেই ভেঙ্গে চূর্ণ করে দিতেন’।[৭৩] খলীফা আলী (রাঃ) একদা স্বীয় পুলিশ প্রধান আবু হাইয়াজ আল-আসাদীকে বলেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি কাজে পাঠাবো না, যে কাজে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে পাঠিয়েছিলেন? সেটি হ’ল এই যে, তুমি এমন কোন ছবি ছাড়বে না, যাকে নিশ্চিহ্ন না করবে এবং এমন কোন উঁচু কবর দেখবে না, যাকে সমান না করে দেবে’।[৭৪] শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, এই আদেশ কেবল আলী (রাঃ) নয়, তাঁর পূর্বে খলীফা ওছমান (রাঃ)-এর সময়েও জারি ছিল’ *(তাহযীর পৃঃ ৯২)*। মক্কা বিজয়ের সময় রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশে ওমর (রাঃ) সর্বপ্রথম কা‘বা গৃহের মূর্তিগুলি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেন। অতঃপর সকল মূর্তি ও ছবি নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কা‘বা গৃহে প্রবেশ করলেন না’ *(আবুদাঊদ)*। উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) বলেন, কা‘বা গৃহে প্রবেশ করে বালতিতে কাপড় ভিজিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছবি সমূহ মুছতে থাকেন ও বলেন, আল্লাহ ঐ জাতিকে ধ্বংস করুন! যারা ছবি তৈরী করে। অথচ সেগুলিকে তারা সৃষ্টি করতে পারে না’ *(মুসনাদে আবুদাঊদ ত্বায়ালেসী, সনদ ‘জাইয়িদ’ দ্রঃ আত-তাহরীক, সেপ্টেম্বর’০২, দরসে হাদীছ ‘ছবি ও মূর্তি’)*।

উপরোক্ত হাদীছ সমূহ প্রমাণ করে যে, প্রাণীদেহের সব ধরনের ছবি, মূর্তি, প্রতিকৃতি ও ভাষ্কর্য সব সময়ের জন্য নিষিদ্ধ। সম্মানের উদ্দেশ্যে অর্ধদেহী বা পূর্ণদেহী সকল প্রকার প্রাণীর ছবি টাঙ্গানো বা স্থাপন করা নিষিদ্ধ। কেবলমাত্র

---

৭১. বুখারী হা/৩২২৫; মুসলিম হা/২১০৬; মিশকাত হা/৪৪৮৯।
৭২. বুখারী হা/২২২৫; মিশকাত হা/৪৫০৭ ‘পোষাক’ অধ্যায়।
৭৩. বুখারী হা/৫৯৫২; মিশকাত হা/৪৪৯১ ‘পোষাক’ অধ্যায়।
৭৪. মুসলিম হা/৯৬৯; মিশকাত হা/১৬৯৬ ‘জানায়েয’ অধ্যায়।

হীনকর কাজে ব্যবহারের জন্য, জনগুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যে, রেকর্ড রাখার স্বার্থে ও বাধ্যগত কারণ ব্যতীত কোন প্রাণীর ছবি তোলা বা সংরক্ষণ করা জায়েয নয়। অথচ এই নিষিদ্ধ কাজ করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত আমাদের জাতীয় নেতা ও নেত্রীদের ছবি তাদের বিরোধীদের হাতে সর্বত্র পদদলিত ও লাঞ্ছিত হচ্ছে। আমরা ছবি টাঙ্গানোর আইন বাতিলের দাবি জানিয়েছিলাম *(এপ্রিল-মে'০২, পৃঃ ৫০)*। এরপরেও সরকারের হুঁশ তো ফেরেইনি, বরং এতকাল ছিল কেবল প্রধানমন্ত্রীর ছবি, এবার যোগ হ'ল তার সাথে প্রেসিডেন্টের ছবি। অতএব ঐ সংসদে ও বঙ্গভবনে কিভাবে আল্লাহ্র রহমত নাযিল হবে, যেখানে সম্মানার্থে ছবি টাঙানো থাকে?

দ্বিতীয় বিষয়টি হ'ল : জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন। উদ্দেশ্য, মহিলাদের ক্ষমতায়ন। জাতীয় পার্টির সংসদীয় দলের নেত্রী রওশন এরশাদ সমর্থন দিয়েছেন কেবল মহিলাদের ক্ষমতায়নের স্বার্থেই। সরকারী দলের বক্তব্যও তাই। ভাবখানা এই যে, পুরুষ শাসিত সমাজে ক্ষমতাহারা মহিলা সমাজ এ যাবত পুরুষের অধীনে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছে। এখন তারা ক্ষমতা হাতে নিয়ে হাফ ছেড়ে বাঁচতে চান এবং স্বাধীনভাবে পুরুষ সমাজকে এক চোট দেখে নিবেন।

আমরা বলতে চাই সংবিধানের উক্ত সংশোধনী স্বভাবধর্ম ইসলামের বিরোধী। ইসলাম পুরুষকে নারীর উপরে কর্তৃত্বশীল করেছে *(নিসা ৪/৩৪)* এবং নারীকে করেছে পুরুষের প্রতি আনুগত্যশীল। প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর অবচেতন হৃদয় নিঃসন্দেহে বিষয়টি স্বীকার করে। যদিও মঞ্চে ও মিছিলে এবং জাতীয় সংসদের বিতর্ক অনুষ্ঠানে তারা সর্বদা এর বিপরীত বলতে চেষ্টা করেন। সরকারের জানা উচিত ছিল যে, চিত্র জগতের নগ্ন মেয়েরা আর এনজিওদের কাছে আত্মবিক্রীত নারীবাদী সংগঠনগুলি এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ পর্দানশীন মা-বোনদের প্রতিনিধি নয়। ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, ইসলামী বিধানে পুরুষের স্বাভাবিক কর্মস্থল হ'ল বাইরে এবং নারীর হ'ল ঘরে। ইসলাম নারীকে সাংসারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জটিল ও দুর্বহ বোঝা বহনের দুরূহ কষ্ট থেকে রেহাই দিয়েছে এবং তাকে সন্তান পালন ও পারিবারিক শান্তি-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করেছে। কর্মজীবী পুরুষ

সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনী শেষে ঘরে ফিরে আসে তার প্রেমময়ী স্ত্রীর কাছে, সন্তান স্কুল-কলেজ শেষে ফিরে আসে স্নেহময়ী মায়ের কাছে, তাদের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের কাছে। কিন্তু আজকের বস্তুবাদী সমাজ নারী-পুরুষের পারস্পরিক সহমর্মিতাপূর্ণ সেই চিরন্তন অবস্থানকে ধ্বংস করে কথিত ক্ষমতায়নের সুড়সুড়ি দিয়ে নারীকে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী বানাতে চায় এবং গৃহের শান্তি ও পারিবারিক শৃংখলা বিনষ্ট করতে চায়। রাজনীতির প্রতারণাপূর্ণ ও পারস্পরিক সংঘর্ষশীল অঙ্গনে নারীকে ডেকে এনে তার সুন্দর ও সুকুমার বৃত্তিকে ধ্বংস করার পিছনে সত্যিকার অর্থে নারীর কোন কল্যাণ নেই, বরং অকল্যাণই বেশী। বরং আমরা বলব, আল্লাহ প্রেরিত অহীর বিধানের কোন একটিরও বিরোধিতায় মানবজাতির কোন কল্যাণ নেই। আমরা বুঝতে পারি না 'আল্লাহ্র আইন চাই, সৎ লোকের শাসন চাই' ইত্যাদি শ্লোগান দিয়ে যেসব ইসলামপন্থী দলের নেতারা জাতীয় সংসদে মন্ত্রী ও এম.পি-র আসনে বসে আছেন, তারা কোন্ দলীলের ভিত্তিতে উক্ত বিলে সমর্থন দিলেন? নাকি নিজেদের ফাসিদ 'ক্বিয়াস' ও কথিত 'হিকমতে'র দোহাই দিয়ে সবকিছুকে জায়েয করে নিচ্ছেন? নারীর ক্ষমতায়ন দূরে থাক, ঐসব পুরুষ নেতাদের নিজেদের কি কোন ক্ষমতা আছে? তারা নিশ্চয়ই তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে উক্ত বিলের উক্ত বিষয় দু'টির পক্ষে ভোট দিয়েছেন। কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মতি-মর্যির বাইরে কিছু করার নৈতিক সাহস ও ক্ষমতা কোনটাই তাদের নেই। তাহ'লে আগামীতে বিভিন্ন দলের কৃপায় ক্ষমতাসীন ৪৫ জন মহিলা এম.পি-র ক্ষমতা কতটুকু হবে? জাতীয় সংসদে পুরুষ এম.পি-দের পাশে মহিলা এম.পি-দের শোভা বর্ধন এবং সকল বিষয়ে স্ব স্ব দলের পক্ষে সমর্থন ও ভোট প্রদান ব্যতীত তাদের আর কোন কাজ থাকবে কি? তাহ'লে কি প্রয়োজন এইসব অথর্ব আসন সৃষ্টি করার ও অযথা তাদের বেতন-ভাতা, টেলিফোন বিল ও পুলিশী প্রহরার জন্য জাতীয় বাজেট থেকে লাখ লাখ টাকা খরচের অংক বৃদ্ধি করার?

হ্যাঁ, দেশের প্রেসিডেন্ট এবং সকল দলের এম.পি-দের জন্য একটি সহজ পথ খোলা ছিল। সেটি এই যে, তারা বলতে পারতেন যে, উপরোক্ত দু'টি বিষয় সংবিধানের ৮ম সংশোধনী বিল ১৯৮৬-এর বিরোধী হচ্ছে বিধায় বাতিলযোগ্য। কেননা ৮ম সংশোধনীতে 'ইসলাম'-কে বাংলাদেশের 'রাষ্ট্রধর্ম' বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অতএব তার বিপরীত কোন বিল বা বিষয় কেউ

উত্থাপন করলে উক্ত সংশোধনীর দোহাই দিয়ে ইসলামপন্থী যে কোন এম.পি তার বিরোধিতা করতে পারতেন। কিন্তু তাদের কেউ এমনকি মহামান্য প্রেসিডেন্টও যখন বিষয়টিকে গুরুত্ব দেননি, তখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, তাহ'লে কি 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' নামক সংশোধনীটি কেবল ইসলামভক্ত জনগণকে খুশী করে প্রতারণার মাধ্যমে তাদের ভোট নেওয়ার একটি অপকৌশল মাত্র? হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ নামধারীরা ৮ম সংশোধনীটি বাতিলের যে দাবী করে আসছে, ইসলামপন্থী জোট সরকার কি তাহ'লে সেটা কার্যতঃ মেনে নিয়েছেন? সরকারের নিকটে আমরা আমাদের পূর্বের দাবীর *(সম্পাদকীয়, সেপ্টে'০২)* পুনরুক্তি করছি যে, সংবিধানের সংশোধনী এনে বাংলাদেশকে 'ইসলামী খেলাফত' ঘোষণা করুন এবং বিশ্বব্যাপী 'ইসলামী খেলাফত' প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন![৭৫]

৩৮. বন্যা নিয়ন্ত্রণে স্থায়ী পরিকল্পনা আবশ্যক

১৯৮৮ ও ১৯৯৮-এর দেশব্যাপী প্রলয়ংকরী বন্যার অর্ধযুগ পরে ২০০৪ সালে আবারো বন্যা এলো। এর মধ্যে ২০০১ সালে সাতক্ষীরা, যশোর, চুয়াডাঙ্গা সহ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৬টি যেলা মারাত্মক বন্যায় দেড় মাস ডুবে ছিল। ১৯৮৮-এর বন্যা আড়াই মাস স্থায়ী ছিল। আক্রান্ত হয়েছিল ৩৭টি যেলা। এবারের বন্যা এক মাস অতিক্রম করল। আক্রান্ত হয়েছে ৫১টি যেলা। দেশের দুই তৃতীয়াংশ বন্যা প্লাবিত হয়েছে। ৪ঠা আগস্ট পর্যন্ত প্রাপ্ত সরকারী হিসাব মতে এ পর্যন্ত ৩ কোটি ৩৭ লাখ ৪৭ হাযার ৫০৪ জন মানুষ বন্যায় সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মারা গেছে ৬৪০ জন। গবাদিপশু মারা গেছে ২০,৮০৫টি। ২৫ লাখ ৪১ হাযার ২৪৬ একর জমির ফসল সম্পূর্ণ বা আংশিক বিনষ্ট হয়েছে। ৪০ লাখ ২৪ হাযার ৬৬৪টি বাড়ী আংশিক বা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে। ৫৬ হাযার ৯৪১ কি.মি. রাস্তা ধ্বংস হয়েছে এবং ৫৩৩৮টি ব্রীজ-কালভার্ট নষ্ট হয়েছে। ভেড়ি বাঁধ ধ্বংস হয়েছে ৩০১৬ কি.মি.। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আংশিক বা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে ২৪,৩০৪টি। টাকার অংকে এবারের বন্যার ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক হিসাব মতে ৪২ হাযার কোটি টাকা বলা

৭৫. ৭ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা জুন ২০০৪।

হ'লেও এই অংক আরও বাড়তে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় সাড়ে তিন কোটি লোকের মধ্যে অন্ততঃ দেড় কোটি লোককে আগামী এক বছর রিলিফ দিয়ে যেতে হবে। আগামী সেপ্টেম্বরের শুরুর দিকে আবারও একটি বন্যার আশংকা রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞগণ মত প্রকাশ করেছেন। বিগত ৪৫ বছরে ১৫টি ব্যাপক বিধ্বংসী বন্যা হ'ল। শোনা যাচ্ছে, এখন থেকে নাকি শুকনা মওসুমেও বন্যা হবে। প্রশ্ন হ'ল : তাহ'লে এখন থেকে কি আমরা এভাবে ডুবতেই থাকব, আর মরতেই থাকব? এর কি কোন সমাধান নেই?

বন্যার কারণ : বাংলাদেশ নীচু ও ভাটির দেশ হওয়ার কারণে উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম তিন দিকের উঁচু ও উজানের দেশ নেপাল ও তিব্বত থেকে ভারতের উপর দিয়ে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা সহ ৫৪টি নদীর বিপুল পানিরাশি বাংলাদেশের বুক চিরে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পতিত হয়। ১৯৭৪-৭৫ সালের হিসাব অনুযায়ী বন্যার সময় কেবল পদ্মা ও যমুনা বেসিন দিয়েই প্রতি সেকেণ্ডে ১ কোটি ৫০ লাখ কিউবিক একর পানি বয়ে যায়। এই বিপুল পানি ধারণ করার মত ক্ষমতা আমাদের নদ-নদীগুলির পূর্বেও ছিল না, আর এখনতো প্রশ্নই ওঠেনা। বর্তমানে বিশেষ করে ফারাক্কা বাঁধের প্রভাবে বাংলাদেশের ছোট-বড় ৩০০০ নদীর মধ্যে ৫০০ নদী মরে গেছে। বাকীগুলো মরার অপেক্ষায় রয়েছে। স্রোতের অভাবে অধিকাংশ নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে গেছে। ফলে উজান থেকে আসা পানিরাশি ধারণের ক্ষমতা বাংলাদেশের নেই। এরপরে যদি ভারত বিগত বাজপেয়ী সরকারের গৃহীত 'আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প' বাস্তবায়ন করে এবং ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা সহ বড় বড় নদীতে বাঁধ দিয়ে সব পানি তাদের দেশে আটকে রাখে ও বর্ষা মৌসুমে অতিরিক্ত পানি ছেড়ে দেয়, তাহ'লে তো উজানের দেশটি খুব সহজে আমাদেরকে ডুবিয়ে ও শুকিয়ে মারতে পারবে। যার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ : উঁচু দেশের পানি নীচু দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই স্বাভাবিক স্রোতধারায় যখন বাধা সৃষ্টি করা হয় অথবা ধারণ ক্ষমতার বেশী পানি প্রবাহিত হয়, তখনই বন্যা দেখা দেয়। আর অতিরিক্ত পানি আসে অতিবৃষ্টির কারণে অথবা হিমালয় থেকে অতিরিক্ত বরফ গলার কারণে। ১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকেই বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চলে

বন্যার ব্যাপকতা বাড়তে থাকে। মেজর রেনেলের ম্যাপ থেকে সূত্র গ্রহণ করে পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক পরিসংখ্যানবিদ ড. আব্দুস সাত্তার প্রমাণ করেন যে, উল্লেখিত সময় পর্যন্ত পদ্মা ও যমুনা সম্পূর্ণ পৃথকভাবে প্রবাহিত হ'ত। সেকারণ তখন বন্যার কোন সুযোগ ছিল না। কিন্তু ঐ সময় সংঘটিত একটি ভূমিকম্পের ফলে গোয়ালন্দের নিকটে পদ্মা ও যমুনা মিলিত হয়ে যায়। তাতে গোটা দেশের পানি পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে উক্ত বৃহৎ নদী দু'টির গতিপথকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নেবার জন্যে তিনি ১৯৫৭ সালে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের নিকটে গঙ্গা বাঁধের প্রস্তাব পেশ করেন। সরকার প্রস্তাবটি জাতিসংঘে উত্থাপন করে। জাতিসংঘ প্রস্তাবটি পসন্দ করলেও শেষ পর্যন্ত সেদিকে না গিয়ে তারা WAPDA চালু করে, যা দেশের সর্বত্র বাঁধ দিয়ে কেবল পানি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে এবং নদী-নালা সব মজিয়ে দেয়। ড. আব্দুস সাত্তার শুরুতেই এই পরিকল্পনার তীব্র বিরোধিতা করে বলেছিলেন যে, শুধু বাঁধ দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। বরং পানি নিষ্কাশনের গতি সহজ করার মাধ্যমেই কেবল বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। দেখা গেল, এখন নদীতে পানির অভাবে ওয়াপদার প্রয়োজনই শেষ হয়ে গেছে। পাকিস্তান আমলের শেষ দিকে আইয়ূব খান গঙ্গা বাঁধ নির্মাণের জন্য ৮৬ কোটি টাকার মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তখন তাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে কিংবা ফুরানো হয়েছিল। তাই এক্ষেত্রে আমাদের ১নং পরামর্শ হ'ল : সেদিনের ৮৬ কোটির স্থলে তার শতগুণ বেশী টাকা খরচ করে হ'লেও গঙ্গা বাঁধ দিয়ে পদ্মা ও যমুনার স্রোত পৃথক করে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করান। কেননা এটাই হ'ল বন্যা নিয়ন্ত্রণের স্থায়ী সমাধান।

আমাদের ২য় পরামর্শ হ'ল : চীন সরকারকে অনুরোধ করা এই মর্মে যে, তারা যেন তিব্বতের সাং-পো নদীতে বাঁধ দিয়ে বাংলাদেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করেন। কেননা ব্রহ্মপুত্র নদের উৎসস্থল হ'ল তিব্বতের উক্ত নদী, যা তিব্বতের মধ্যেই ১৪৪৩ কি.মি. প্রবাহিত এবং যমুনা নদী মূলতঃ ব্রহ্মপুত্রেরই স্রোতধারা। তৃতীয়তঃ ভারত ও নেপাল সরকারের সাথে পরামর্শক্রমে উজানে পানির আধার সৃষ্টি করা এবং সেখান থেকে তিন দেশের সমন্বিত তদারকিতে সুষ্ঠু পানি পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

উল্লেখ্য যে, ফারাক্কা বাঁধে ভারত যে লাভবান হতে চেয়েছিল, এখন তা তাদের লোকসানের খাতে চলে গেছে। পশ্চিম বঙ্গের নদী-নালা মজে গেছে। ফলে বন্যায় ও খরায় তারাও আমাদের মত ডুবছে ও শুকাচ্ছে। সম্ভবতঃ এতদিনে তাদের হুঁশ ফিরেছে এবং হয়তবা সেকারণেই গত ২৯শে জুলাই ব্যাংককে অনুষ্ঠিত Bay of Bengal Initiatives Multi Sectoral Tecnical & Economic Co-operation সংক্ষেপে 'বিমসটেক' (BIMSTEC) সম্মেলনে ভারত আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনায় সম্মত হয়েছে। চতুর্থতঃ শহর-গ্রাম ও খাল-বিলের যাবতীয় ভরাট কাজ বন্ধ করা হৌক। বিশেষ করে ঢাকা ও অন্যান্য মহানগরীর আশপাশের পানির উৎসগুলির নাব্যতা অক্ষুণ্ন রাখা হৌক। প্রেসিডেন্ট যিয়াউর রহমানের স্বেচ্ছাশ্রমে খাল কাটা কর্মসূচী পুনরায় চালু করা হৌক। পঞ্চমতঃ রেল ও সড়ক পথসমূহ উঁচু করা হৌক ও সেখানে দীর্ঘ ব্রীজ ও কালভার্টসমূহ নির্মাণ করা হৌক। মাছের ঘেরের ভেড়িগুলি পরিকল্পিতভাবে হৌক, যাতে পানি প্রবাহে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি না হয়। ষষ্ঠতঃ হিমালয়ের ঢালুতে দুর্বৃত্তরা বনাঞ্চল উজাড় করে দিচ্ছে। ফলে গাছের শিকড়ের সাহায্যে যত পানি নীচে শোষিত হ'ত, তা এখন হচ্ছে না। ঐ পানি বন্যা আকারে ভাটিতে ধেয়ে আসছে। এদিকে বাংলাদেশী দুর্বৃত্তরা পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সুন্দরবনের গাছ কেটে সাবাড় করছে। ফলে যেমন পাহাড় ভাঙছে ও পাহাড়িয়া ঢল বাড়ছে, তেমনি সুন্দরবনের মাটি ভাঙছে ও ঝড় ধেয়ে আসছে ভিতরে বিনা বাধায়। ওদিকে পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়ে ক্রমে গ্রাস করছে তামাম ফসলী জমিকে। তাই যেকোন মূল্যে গাছ কাটা বন্ধ করতে হবে। সপ্তমতঃ হিমালয় শীর্ষে জমে থাকা বরফমালার উপরে বিমান থেকে রাসায়নিক পদার্থ ফেলে বরফ গলার পরিমাণ প্রয়োজনমত কমবেশী করার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। সাধারণতঃ প্রতি ১১ বছর অন্তর পৃথিবীতে পতিত অধিক সূর্যতাপে হিমালয়ের বরফ গলার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। উক্ত পর্বতমালা এখন ভারত ও চীনের দখলে। তাই উক্ত দুই দেশের সম্মতি ও সহযোগিতা আবশ্যক।

পরিশেষে বলব, হিংসা ও জিঘাংসার রাজনীতি পরিহার করতে হবে এবং চীন ও তিব্বতকে সাথে নিয়ে ভারত ও নেপালের সহযোগিতায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের স্থায়ী মহা পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে । এটা উপমহাদেশের সকল দেশের

স্বার্থেই যরূরী। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ ঐ জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে' *(রা'দ ১৩/১১)*। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন![৭৬]

৩৯. হ্যান্স তুমি ইসলাম কবুল কর

'ধর্মীয় জঙ্গীবাদ ও দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা' শীর্ষক তিনদিন ব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত ১১-১৩ই অক্টোবর'০৪ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ঢাকাস্থ জার্মান ও ফরাসী দূতাবাসের সহযোগিতায় 'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এণ্ড স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ 'বিস' (Biiss) কর্তৃক তাদের নিজস্ব মিলনায়তনে আয়োজিত উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ থেকে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে জার্মানীর ইরফার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হ্যান্স জি কিপেনবার্গ 'সন্ত্রাসই ইবাদত এবং ১১ই সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসীদের ধর্মগ্রন্থ' শীর্ষক একটি নিবন্ধ উপস্থাপন করেন। উক্ত নিবন্ধে মিঃ হ্যান্স সন্ত্রাস বলতে 'জিহাদ', ১১ই সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী বলতে 'মুসলিম জাতি' এবং সন্ত্রাসীদের ধর্মগ্রন্থ বলতে মহাগ্রন্থ 'আল-কুরআন'কে বুঝিয়েছেন। এজন্য তিনি সূরা তওবার ১ ও ৫ নং আয়াত দু'টিকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করেছেন। কুরআন সম্পর্কে তার পাণ্ডিত্য দেখানোর চেষ্টা ৭ অন্ধের হাতি দেখার গল্প মনে করিয়ে দেয়। হাতির যে অঙ্গে যে অন্ধ হাত রেখেছে, সে তাকে তেমনি কল্পনা করেছে। কেউ হাতির লেজ ধরে বলেছে হাতি লাঠির মত, কেউ শুঁড় ধরে বলেছে হাতি পাইপের মত, কেউ হাতির পা ধরে বলেছে, হাতি বিল্ডিংয়ের খাম্বার মত। কেউ হাতির কান ধরে বলেছে, হাতি পাখার মত। আসলে ৭ অন্ধের কেউই পূর্ণাঙ্গ হাতি দেখেনি। হ্যান্স জাতীয় পণ্ডিতদের অবস্থা ঐ সাত অন্ধের হাতি দেখার মত। যে রাসূলকে আল্লাহ পাক 'বিশ্ববাসীর জন্য রহমত' *(আম্বিয়া ১০৭)* বলেছেন, এরা তাঁকে 'যুদ্ধবাজ' (War Lord) বলছে। কারণ হোদায়বিয়ার সন্ধি অনুযায়ী ১০ বছরের 'যুদ্ধ বিরতি চুক্তি' লংঘন করে দেড় বছরের মাথায় যখন মুশরিকরা মুসলিম মিত্র বনু খোযা'আ গোত্রের উপরে হামলা করল, তখনই তাদের সঙ্গে

৭৬. ৭ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা আগস্ট ২০০৪

চুক্তি বাতিলের ঘোষণা দেওয়া হয় সূরা তওবা ১নং আয়াতের মাধ্যমে। চুক্তি ভঙ্গকারী ছিল সেদিন কাফির পক্ষ। অপরাধী মক্কার মুশরিকদের উসকানীদাতা মদীনার ইহূদী-নাছারারা এতে তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখে। তখন থেকে আজ পর্যন্ত তারা মুসলমানের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ও গোপনে ষড়যন্ত্রে মেতে আছে। বর্তমানে তারা একক পরাশক্তি হওয়ার আত্মগর্বে স্ফীত হয়ে মুসলিম শক্তিগুলিকে একে একে ধ্বংস করার অজুহাত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিজেরা ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরের তথা নাইন ইলেভেন-এর ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়ে উল্টা উসামা বিন লাদেন জুজুর নামে মুসলমানদের উপর দোষ চাপিয়ে প্রথমে আফগানিস্তান ও পরে গণবিধ্বংসী অস্ত্র উদ্ধারের নামে ইরাক দখল করে নিল। সেখানে তারা দৈনিক রক্ত ঝরাচ্ছে। সেদেশের সবকিছু একে একে ধ্বংস করে চলেছে। একই ধারায় সিরিয়া, ইরান ও সঊদী আরবের দিকে তারা এখন নিশানা তাক করেছে।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদূদ আহমাদকে ধন্যবাদ যে, তিনি তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'বাংলাদেশে জঙ্গীবাদের কোন অস্তিত্ব নেই'। জঙ্গীবাদের মূল উৎস রাজনৈতিক নিপীড়ন, দারিদ্র্য, শোষণ ও বঞ্চনা'। নিঃসন্দেহে বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক নিপীড়ন, দারিদ্র্য ও শোষণ-বঞ্চনার মূল নায়ক হ'ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের দোসর বহুজাতিক সূদী কোম্পানীগুলো। জার্মানী, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড সবাই আজ মার্কিনীদের তাবেদার। তারাই গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের নামে বিশ্বব্যাপী দলাদলি, হানাহানি ও সন্ত্রাস ছড়িয়ে দিচ্ছে।

পক্ষান্তরে ইসলামের আহ্বান সর্বদা মানব কল্যাণের দিকে। ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে কারু উপরে যবরদস্তি করা ইসলামে নিষিদ্ধ' *(বাক্বারাহ ২/২৫৬)*। ইসলাম মানুষকে মানুষের গোলামী হ'তে মুক্ত করে আল্লাহ্র গোলামীর দিকে আহ্বান জানিয়েছে। বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'কোন আরবের উপরে অনারবের, অনারবের উপরে আরবের, লালের উপরে কালোর, কালোর উপরে লালের কোন প্রাধান্য নেই আল্লাহভীরুতা ব্যতীত। তোমরা সবাই এক আদমের সন্তান এবং আদম ছিলেন মাটির তৈরী' *(আহমাদ হা/২৩৫৩৬, সনদ ছহীহ)*। রাসূল (ছাঃ) কেবল ঘোষণা দিয়েই ক্ষান্ত হননি। তিনি বাস্তবে দেখিয়ে গিয়েছেন।

তাইতো দেখি তাঁর পার্শ্বে থাকতেন যেমন কুরায়েশ নেতা আবুবকর ও ওমর (রাঃ)। তেমনি থাকতেন আফ্রিকার নিগ্রো কৃষ্ণকায় গোলাম বেলাল। এমনকি মক্কা বিজয়ের পর কা'বার ছাদে উঠে প্রথম আযান দেওয়ার উচ্চ মর্যাদা তিনি বেলালকে দান করেছিলেন। যা দেখে আভিজাত্যগর্বী কুরায়েশ নেতারা বলেছিলেন, 'এ দৃশ্য দেখার আগে আমাদের মরণ ভাল ছিল'। মৃত্যুর দু'দিন পূর্বে গোলামের পুত্র গোলাম উসামা বিন যায়েদকে সেনাপতির দায়িত্ব দিলেন তিনি। ওমরের জানাযা পড়ালেন ক্রীতদাস ছোহায়েব রূমী। ইসলাম মানুষের মেধা, যোগ্যতা, সততা ও সর্বোপরি আল্লাহভীরুতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। যা তাকে সত্যিকারের মানুষের মর্যাদায় আসীন করে। আর এখানেই সার্বজনীন ধর্ম ইসলামের বিশ্বজয়ের গোপন রহস্য নিহিত। মূলতঃ এটাই হ'ল ইসলামের প্রকৃত দাওয়াত।

ইসলাম তার অনুসারীদেরকে কোন অবস্থায় অন্যায় ও অসত্যের কাছে মাথা নত করতে শিখায়নি। আল্লাহ প্রেরিত সত্যকেই ইসলাম চূড়ান্ত সত্য বলেছে। এর বিপরীতে মানবরচিত কোন বিধানকে ইসলাম কোনই তোয়াক্কা করেনি। কারণ আল্লাহ্র গোলামীর মধ্যেই মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা নিহিত এবং মানুষের গোলামীর মধ্যে রয়েছে মানবতার প্রকৃত পরাজয়। ইসলামের এই দাওয়াতে কেউ বাধার সৃষ্টি করলে সেখানে পৃষ্ঠ প্রদর্শন কিংবা বাতিলের সঙ্গে আপোষ করতে বলা হয়নি, বরং বুক পেতে দিয়ে সার্বিক প্রচেষ্টায় সম্মুখে এগিয়ে যেতে বলা হয়েছে। আর একেই বলা হয় 'জিহাদ'। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা জিহাদ কর মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের মাল দ্বারা, জান দ্বারা ও যবান দ্বারা'।[৭৭] ইসলামে জিহাদ হ'ল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য। দুনিয়াবী স্বার্থের জন্য নয়। এই জিহাদ হ'ল আল্লাহ্র কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য, যালিমের বিরুদ্ধে মযলূমের অধিকার কায়েমের জন্য। আর এখানেই যালেমদের যত ভয়। বিশ্বের তাবৎ যালেম ও শোষকগোষ্ঠী আজ এক হয়েছে মানবতার মুক্তি সনদ ইসলামের বিরুদ্ধে এ কারণেই।

পক্ষান্তরে ৬০ লাখ ইহূদীকে হত্যাকারী মানবতার শত্রু জার্মান নেতা এডলফ হিটলার, নাগাসাকি-হিরোশিমাতে এটমবোমা মেরে লাখ লাখ নিরীহ মানুষ

---

৭৭. আবুদাঊদ হা/২৫০৪; আহমাদ হা/১২২৬৮; মিশকাত হা/৩৮২১ 'জিহাদ' অধ্যায়।

হত্যাকারী মার্কিন ও মিত্রবাহিনীর নেতারা এবং আজকের আফগানিস্তান ও ইরাকে হাযার হাযার বনু আদমকে হত্যাকারী নেতারা কি খ্রিষ্টান জঙ্গীবাদী নন? আফগানিস্তানের উপরে হামলাকারী রাশিয়াকে হটানোর জন্য এবং দেশের স্বাধীনতা ও ইসলামকে রক্ষার জন্য তালেবানের সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যাদেরকে আমরা 'মুক্তিযোদ্ধা' বলব। রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করার জন্য মার্কিনীরাই তখন 'বিন লাদেন'-কে কাজে লাগিয়েছিল। প্রয়োজন শেষে 'বিন লাদেন' এখন সন্ত্রাসী হয়ে গেল। আর নিজেরা হয়ে গেলেন সাধু ও মানবাধিকারবাদী?

'বিস' নেতারা তাদের সেমিনারের যে শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন ও নির্ধারিত বিষয়বস্তু দিয়ে বক্তা আমদানী করেছেন, তাতে তাদের উদ্দেশ্য অস্পষ্ট নয়। তারাই যে মূলতঃ ধর্মনিরপেক্ষতার 'বিষ' গিলেছেন এবং নিজেদের গা বাঁচানোর জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে পণ্ডিত নামধারী কিছু চিহ্নিত লোককে আমদানী করে তাদের মুখ দিয়ে নিজেদের কথাগুলো বলিয়ে নিয়েছেন এটা পরিষ্কার। তা না হলে ইসলাম ও ইসলামের নবীকে গালি দিয়ে ইহূদী হ্যান্স নির্বিবাদে বহাল তবিয়তে ঢাকা ত্যাগ করতে পারত না। 'বিস' নেতাদের বলছি, আপনারা এবারে দিল্লীতে অনুরূপ একটা সম্মেলন করে হিন্দু ও হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে গালি দেওয়ানোর ব্যবস্থা করুন। দেখব কেমন ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের অনুসারী আপনারা। মনে রাখুন, জিহাদ ও জঙ্গীবাদ এক নয়। জিহাদ হয় স্রেফ আল্লাহ্র জন্য। পক্ষান্তরে জঙ্গীবাদ হ'ল দুনিয়ার জন্য। তাই পৃথিবীর যে প্রান্তে মুসলমানেরা তাদের দ্বীন, ঈমান ও স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে, সবই জিহাদ, যদি তা স্রেফ আল্লাহ্র জন্য হয়। মূলতঃ মানবতার মুক্তির একটাই পথ, দাওয়াত ও জিহাদ। আর এটাই ছিল নবীদের তরীকা।

আজকের বিশ্বে সর্বত্র শোষণ, নির্যাতন ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের মূলে রয়েছে শোসকগোষ্ঠী ইঙ্গ-মার্কিন দুষ্টচক্র ও তাদের দোসররা। ইসলামের উত্থান তাদের বাধাহীন শোষণের পথে বিরাট প্রতিবন্ধক। তাই তারা একে সর্বত্র ভয়ের চোখে দেখছে। অন্ধকারে ভূত দেখে আঁতকে ওঠার ন্যায় তারা এখন সর্বত্র মুসলিম জঙ্গী দেখছে। মূলতঃ ইসলামের অস্ত্র লুকিয়ে আছে তার বিশ্বজয়ী আদর্শের মধ্যে। বোমা মেরে সেটাকে হত্যা করা সম্ভব নয়। তাই

হ্যান্সদের বলব, ইসলাম কবুল কর। ইহকাল ও পরকালের শান্তি এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে। আল্লাহ তুমি ইসলামকে হেফাযত কর- আমীন![৭৮]

৪০. মিথ্যাচার ও সাংবাদিকতা

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী'০৫ মঙ্গলবার থেকে দেশের হাতে গণা কয়েকটি ইসলামপন্থী পত্রিকা বাদে প্রায় সব ক'টি বাংলা ও ইংরেজী জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিকে কোনটায় ছবিসহ কোনটায় ছবি ছাড়া এমনকি বিদেশী বেতারের বাংলা অনুষ্ঠানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এবং এ সংগঠনের মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে কথিত জঙ্গীবাদের সাথে জড়িয়ে যেসব সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে, তা যেমন মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত, তেমনি রীতিমত হাস্যকর। বাংলাদেশের সাংবাদিকতা যে কত নীচে নেমে গেছে, বর্তমানের অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছি। এখন দেখার বিষয়, এইসব মিথ্যাচারের উপরে ভিত্তি করে দেশের সরকার কোন অন্যায় পদক্ষেপ নেন কি-না। এ ধরনের মুখরোচক শিরোনাম না দিলে ঐসব পত্রিকা বিক্রি হয় না। তাছাড়া এ ধরনের সাংবাদিকতা যে উদ্দেশ্যমূলক, তা সহজে বুঝা যায় এ কারণে যে, ইসলাম বিরোধী ধর্মনিরপেক্ষ মতাদর্শের অনুসারী পত্রিকাগুলিই কেবল এ সংবাদগুলি প্রায় একই সুরে ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে লিখেছে। বুঝতে পারি না সাংবাদিকতার নীতিমালা কি তবে সুন্দরভাবে মিথ্যা বলা? ভিত্তিহীন বিষয়কে কল্পনার ফানুস দিয়ে অট্টালিকা বানানো? অথচ মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, যা শোনা হয়, তাই-ই বর্ণনা করা।[৭৯] কোনরূপ যাচাই-বাছাই ব্যতীত একজনের বিরুদ্ধে কিছু লেখা ও তার চরিত্র হনন করা যদি সাংবাদিকতার আওতাভুক্ত হয়, তবে বলা যায় যে, সাংবাদিকতার চাইতে জঘন্য পেশা বর্তমান যুগে আর কিছু নেই। বাংলাদেশের অধিকাংশ জাতীয় দৈনিক বর্তমানে গরু মেরে জুতা দানের নীতি অনুসরণ করছে। যেমন কারু বিরুদ্ধে নোংরা শিরোনাম দিয়ে অপপ্রচার করা হ'ল। অতঃপর গা বাঁচানোর জন্য কখনও ভিতরে বা নীচে ছোট্ট করে একটু প্রতিবাদ ছাপিয়ে দিল। এতেই

---

৭৮. ৮ম বর্ষ ২য় সংখ্যা নভেম্বর ২০০৪।

৭৯. মুসলিম হা/৫; মিশকাত হা/১৫৬ 'ঈমান' অধ্যায়।

তার সাংবাদিক সততার প্রমাণ দেওয়া হয়ে গেল। অনেক পত্রিকা ওটুকুও ছাপেনা। ছাপলেও ভিতরে এমন করে ছাপবে, যেন সহজে কারু নযরে না পড়ে। ধিক সাংবাদিক সমাজের প্রতি, যারা মিথ্যাকে তাদের পুঁজি হিসাবে গ্রহণ করেছে। সত্যকে বিক্রি করে দুনিয়া অর্জন করছে।

সাধারণ পাঠক এগুলিকে লুফে নেয় ও বিশ্বাস করে এবং সাথে সাথে মুখে মুখে সর্বত্র প্রচারিত হয়ে যায়। অথচ এই মিথ্যা প্রচারণায় জড়িত হয়ে যায় প্রধানতঃ তিন পর্যায়ের লোক। ১- যারা এই মিথ্যা পরিবেশন করে। ২- ঐ সাংবাদিক যিনি এটাকে মুখরোচক শিরোনাম দিয়ে ও রং চড়ানো ভাষা দিয়ে পত্রিকায় বা বেতার-টিভিতে প্রচার করেন। ৩- যারা এটা পড়ে বা শোনে এবং বিনা যাচাইয়ে প্রচার করে। এই তিন শ্রেণীর লোকের সাথে আরও জড়িত হয় মুদ্রাকর, পিয়ন, হকার সহ অনেক মানুষ। দেখা যাচ্ছে ছোট্ট একটি মিথ্যা খবর শত শত লোককে পাপী করে ফেলছে। পৃথিবীতে প্রথম খুনী হ'ল আদমপুত্র ক্বাবীল। সেকারণ ক্বিয়ামত পর্যন্ত যত খুনের ঘটনা ঘটবে, তার পাপের একটা অংশ ক্বাবীলের আমলনামায় যোগ হবে।[৮০] পাপের দিকে আহ্বানকারীদের বিষয়ে আল্লাহ বলেন, ক্বিয়ামতের দিন ওরা পূর্ণ মাত্রায় বহন করবে নিজেদের পাপভার এবং ঐসব লোকদের পাপভার, যাদেরকে ওরা অজ্ঞতা হেতু বিপথগামী করে। সাবধান! খুবই নিকৃষ্ট বোঝা তারা বহন করে থাকে' *(নাহল ১৬/২৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ... যে ব্যক্তি মানুষকে ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান জানালো, তার উপরে ঐ পরিমাণ গোনাহ চাপানো হবে, যে পরিমাণ গোনাহ তার অনুসারীদের উপরে চাপবে। তাদেরকে তাদের গোনাহ থেকে এতটুকুও কম করা হবে না'।[৮১]

মানুষের জানমাল ও ইযযত পরস্পরের জন্য হারাম। অথচ হলুদ সাংবাদিকতার মাধ্যমে সেই ইযযত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। একজন সম্মানী ব্যক্তির সম্মান ক্ষুণ্ণ করা কিংবা বিনষ্ট করাই যেন এই সব সাংবাদিকতার প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর বিনিময়ে তারা দুনিয়ায় কিছু হাছিল করলেও আখেরাত যে হারাচ্ছেন, এটা সুনিশ্চিত।

---

৮০. বুখারী হা/৩৩৩৫; মুসলিম হা/১৬৭৭; মিশকাত হা/২১১ 'ইলম' অধ্যায়।
৮১. মুসলিম হা/২৬৭৪; মিশকাত হা/১৫৮ 'ঈমান' অধ্যায়।

তথ্য সন্ত্রাসের এই যুগে একটি মিথ্যাকে শতকণ্ঠে বলিয়ে গোয়েবল্সীয় কায়দায় সত্য বলে প্রমাণিত করার যে কোশেশ চলছে, তার দ্বারা পাঠক সমাজ সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত হবে ও সামাজিক শান্তি বিনষ্ট হবে। কিন্তু দেরীতে হ'লেও চূড়ান্ত বিচারে সত্যই জয়লাভ করবে। এটাই স্বাভাবিক ও চিরন্তন সত্য। সমাজ সংস্কারকগণের জীবনে চিরকাল আমরা এটাই দেখে এসেছি।

বর্তমান সময়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সমাজ সংস্কারের দূরদর্শী লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। তাতে বাধা আসা স্বাভাবিক। একদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী মিডিয়া সমূহের প্রত্যক্ষ হামলা, অন্যদিকে ইসলামী নামের শিরক ও বিদ'আতপন্থী পত্রিকা ও মিডিয়া সমূহের নিশ্চুপ ভূমিকা অথবা পরোক্ষ ও তীর্যক হামলা- দু'য়ের মুকাবিলা করেই আমাদেরকে সামনে এগোতে হচ্ছে। তাই আজ জঙ্গীবাদের যে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে এবং যেসব অপরিণামদর্শী তরুণকে জিহাদের প্রস্তুতির সুড়সুড়ি দিয়ে একাজে লাগানো হচ্ছে, তারা যে বিদেশী প্রভুদের ক্রীড়নক, তা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। যেসব সংবাদপত্র নির্দোষ ইসলামী নেতাদের কলংকিত করার চেষ্টায় নিরত আছে, তারাও যে মহল বিশেষের দ্বারা পরিচালিত নয়, তা হলফ করে বলার উপায় নেই। তারা দেশের সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলার জন্য এবং বিদেশের নিকট বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক ও সন্ত্রাসী রাষ্ট্র প্রমাণ করার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অতএব আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই যে, ইসলামের স্বচ্ছ-সুন্দর ও আদিরূপ প্রতিষ্ঠার জন্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' যেমন কথা, কলম ও সংগঠনের মাধ্যমে তাদের জিহাদী প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে, তেমনি দেশের আইন-শৃংখলা রক্ষা এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে সর্বদা দেশের সরকারের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করে যাবে ইনশাআল্লাহ।

আমরা সাংবাদিকতার পেশাকে সমুন্নত রাখার স্বার্থে সাংবাদিকতায় জড়িত বন্ধুদের সত্যসেবী হবার এবং অন্যের চরিত্র হননে কালি-কলম ব্যয় না করার আহ্বান জানাচ্ছি। নইলে সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন সাংবাদিকদেরকে ডাষ্টবিনের নোংরা ময়লার মত মানুষ দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিবে। মিথ্যাচার ও সাংবাদিকতা সমার্থক হিসাবে গণ্য হবে। আমরা সংশ্লিষ্ট সকলকে গীবত-

তোহমতের পরকালীন মর্মান্তিক পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন![৮২]

[এ সম্পাদকীয় লেখার পরপরই ২২শে ফেব্রুয়ারী'০৫ মঙ্গলবার দিবাগত রাতে মুহতারাম আমীরে জামা'আত তিনজন কেন্দ্রীয় নেতাসহ গ্রেফতার হন। অতঃপর ৩ বছর ৬ মাস ৬ দিন কারাভোগের পর ২৮.০৮.২০০৮ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তিনি বগুড়া যেলা কারাগার হ'তে যামিনে মুক্তি পান। -প্রকাশক।]

ভাষা ও সংস্কৃতি

৪১. ভাষার স্বকীয়তা অক্ষুণ্ন রাখুন!

২১শে ফেব্রুয়ারী ভাষা দিবস সমাগত। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ঢাকার রাজপথে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার ন্যায্য দাবীকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য অদূরদর্শী শাসনশক্তি সেদিন বুলেট চালিয়ে হত্যা করেছিল আমাদেরই কিছু তরুণ ভাইকে। আমরা তাদের আত্মত্যাগকে স্মরণ করি শ্রদ্ধার সঙ্গে। সেদিনের সেই রক্তদান বৃথা যায়নি। বাংলা আজ কেবল রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পায়নি, স্বাধীন রাষ্ট্রযন্ত্রের মালিকানাও লাভ করেছে; *আল-হামদুলিল্লাহ*। ইতিহাস সচেতন ব্যক্তি মাত্রই জানেন যে, বাংলা ভাষার উন্নয়নে বঙ্গের প্রাচীন মুসলিম শাসক ও সাহিত্যিকদের অবদানই ছিল সর্বাধিক। আর যেকোন ভাষা তার জাতির চিন্তা-চেতনার প্রতিবিম্ব হিসাবে কাজ করে। মুসলমানদের চিন্তা-চেতনা, ঈমান-আক্বীদা ও আমল-আখলাক সমৃদ্ধ আরবী, ফারসী শব্দাবলী সঙ্গতকারণেই তাই এ ভাষার বুকে স্বাভাবিকভাবে স্থান করে নিয়েছে। বাংলা ভাষাকে অধিকতর সমৃদ্ধ করেছে। কোলকাতা কেন্দ্রিক সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা বিষয়টিকে ভাল চোখে দেখেননি। তারা আরবী-উর্দূ-ফারসী হটিয়ে বাংলা ভাষায় শুদ্ধি অভিযান চালাতে চাইলেন। ফলে ঢাকা ও কোলকাতা কেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যের দু'টি ধারা সৃষ্টি হ'ল। যা আজও অব্যাহত আছে ও থাকবে। কারণ এ ধারার অন্তর্নিহিত ফল্গুধারা হ'ল আদর্শিক, রাজনৈতিক নয়। রাজনীতি কখনো আদর্শ পরিবর্তন করতে পারেনা। বরং আদর্শই রাজনীতি ও রাজনৈতিক মানচিত্র পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে। স্বাধীন বাংলাদেশ তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। একই বাংলাভাষী

---

৮২. ৮ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা মার্চ ২০০৫।

হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিম বঙ্গীয়রা আজও দিল্লীর শাসিত। সেখানকার ৪০ শতাংশ মুসলিম বাংলাভাষী নাগরিক প্রাদেশিক সরকারের উচ্চপদ সমূহে অনধিক এক শতাংশ এবং নিম্নপদ সমূহে অনধিক তিন শতাংশের বেশী আজও অধিকার করতে সক্ষম হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের বাংলা আজ হিন্দী আগ্রাসনে ভীত-সন্ত্রস্ত। খোদ কোলকাতা থেকেই এখন বাংলা সাহিত্যের পাততাড়ি গুটানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন বঙ্গদেশের পূর্ব অংশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানেরা তাদের আদর্শিক স্বাতন্ত্র্যকে অক্ষুণ্ন রেখে আজ স্বাধীন রাষ্ট্রের পত্তন ঘটিয়েছে। তাদের ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার সাথে সাথে বিশ্বের দরবারে অন্যতম সমৃদ্ধ ভাষা হিসাবে পরিচিত করে তুলেছে। তাই বাংলা ভাষাকে পৌত্তলিকতা মুক্ত করে তার আদর্শিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা যেমন আমাদের জাতীয় কর্তব্য। তেমনি ইসলামের নামে শিরক ও বিদ‘আত যুক্ত সাহিত্য সৃষ্টি করা হতে বিরত থেকে নির্ভেজাল তাওহীদ ও সুন্নাহ ভিত্তিক সাহিত্য রচনা করাও আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। কারণ বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্ব নির্ভর করছে এর আদর্শিক স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন রাখার উপরে। অধিকার সচেতন সাহিত্যানুরাগী ভাইদেরকে বিষয়টির প্রতি অধিক গুরুত্ব দানের আহবান জানাচ্ছি এবং দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের প্রতি আবেদন রাখছি যে, শুধুমাত্র দিবস পালনের মধ্যে নয় বরং বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করার জন্য সত্যিকারভাবে কাজ করুন এবং ইতিমধ্যে অতি বাঙ্গালী হওয়ার নামে বাংলা ভাষা হ’তে ইসলামী ঐতিহ্যকে উৎখাত করার জন্য সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে মুসলমানের মুখোশ পরে সাহিত্য সেবার নামে যেসব বিভীষণগুলো লুকিয়ে আছে, তাদেরকে চিহ্নিত করুন। এই মাসে আমরা আমাদের পাঠক-পাঠিকা ও জনসাধারণকেও উক্ত বিষয়ে সচেতন থাকার আহবান জানাচ্ছি।[৮৩]

৪২. নববর্ষের সংস্কৃতি

মানুষের জীবন মূলতঃ অসংখ্য ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ড, পল ও অনুপলের সমষ্টির নাম। যাকে ‘হায়াত’ বলা হয়। আল্লাহ নির্ধারিত সময়ে হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার মত এক সময় জীবনের আলো নিভে যাবে ও ‘মউত’ সংঘটিত হবে। মানুষের এই হায়াত ও মউত সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

৮৩. ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮।

'কে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর আমল করে, সেটা পরীক্ষা করার জন্য তিনি তোমাদের হায়াত ও মঊত সে সৃষ্টি করেছেন' *(মুলক ৬৭/২)*। এই 'সর্বাধিক সুন্দর আমল' বা কাজের হিসাব নেওয়ার জন্যই আমাদের দৈনিক, মাসিক ও বাৎসরিক হিসাব তৈরী করতে হয় ও তার ভাল-মন্দ পর্যালোচনা করে সামনের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সাথে সাথে আমাদের নতুন জীবন শুরু হয়। পিছনের দিনটি আর ফিরে আসে না। এইভাবে অতীত ও বর্তমানের দোলাচলে আমাদের অনিশ্চিত জীবন তরী এগিয়ে চলেছে চূড়ান্ত মুহূর্তের দিকে। জীবনদাতা আল্লাহ্‌র নিকটে জীবনের প্রতিটি সেকেণ্ড ও মিনিটের হিসাব দিতে হবে। তাই সচেতন মুমিনের নিকটে সময়ের মূল্য সবচাইতে বেশী। এইভাবে সময়ের গুরুত্ব বিবেচনা করেই দিন, মাস ও বর্ষ গণনা গুরুত্ব লাভ করেছে।

আল্লাহ পাক পুরা বৎসরকে ১২টি মাসে গণনা করেছেন *(তওবা ৯/৩৬)*। পৃথিবীর সকল জাতি তা মেনে নিয়েছে। এরি মধ্যে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা ধর্মীয় ইস্যুকে সামনে রেখে তাদের বর্ষ গণনা শুরু করেছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রবীউল আউয়াল মাসে মদীনায় হিজরত করলেও ওমর (রাঃ) আরবদেশে প্রচলিত বছরের প্রথম মাস হিসাবে মুহাররম থেকেই হিজরী সন গণনার সূত্রপাত করেন। মুগল আমলে ভারতবর্ষে হিজরী সন গণনা করা হ'ত ও সেই ভিত্তিতে রাজস্ব আদায় করা হ'ত। কিন্তু চান্দ্র মাসগুলি সৌর ঋতুর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পারায় প্রজাদের পক্ষে অন্য মৌসুমে রাজস্ব আদায়ে বিপাকে পড়তে হ'ত। বিষয়টি চিন্তা করে সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ খৃঃ) বাংলাদেশে রাজস্ব আদায়কে নিয়মানুগ করার জন্য ফসল ওঠার মৌসুমের সাথে সংগতি রেখে নতুন একটি সন বা বর্ষপঞ্জী তৈরী করার জন্য তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্য পণ্ডিত ফাৎহুল্লাহ সিরাজীকে দায়িত্ব প্রদান করেন। তিনি চান্দ্র মাসের পরিবর্তে সৌর মাস অনুযায়ী নতুন বাংলা সন উদ্ভাবন করেন ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দে। কিন্তু বাংলা সনের গণনা শুরু হয় সম্রাট আকবরের সিংহাসনারোহণের বছর ৯৬৩ হিজরী মোতাবেক ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দ হ'তে। ঐ সময় ছিল হিজরী সনের মুহাররম মাস ও বাংলাদেশে ছিল শকাব্দের দ্বিতীয় মাস বৈশাখ মাস। সেকারণে বাংলাদেশে নতুন বাংলা সনের

প্রথম মাস হিসাবে নির্ধারণ করা হয় বৈশাখ মাসকে। যদিও শকাব্দের প্রথম মাস শুরু হয় পহেলা চৈত্র হ'তে। পরবর্তীকালে মাস গণনার সুবিধার্থে ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ১৯৬৬ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী যে রিপোর্ট প্রদান করেন, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার তা অনুমোদন করে এবং বর্তমান বাংলাদেশ সরকার তা বহাল রাখে। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলা নববর্ষের সৃষ্টি মূলতঃ রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে এবং এর প্রচলন হয় সম্রাট আকবরের নির্দেশে পণ্ডিত ফাৎহুল্লাহ সিরাজীর হাতে ও বর্তমান সংশোধিত রূপ লাভ করে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের নির্দেশে জ্ঞানতাপস ড. শহীদুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে একটি কমিটির মাধ্যমে। সম্ভবতঃ মুসলমানদের দ্বারা প্রবর্তিত ও হিজরী সনের সাথে সম্পৃক্ততার কারণে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বাধীনতার পর হ'তেই বাংলা সনের পরিবর্তে শকাব্দ ব্যবহার করে আসছেন। ফলে ঢাকায় যেদিন ১লা বৈশাখ হয় কোলকাতায় সেটা হয় তার পরের দিন।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, চান্দ্র বর্ষ ৩৫৪ দিন ৮ ঘণ্টা ৪৮ মিনিটের কিছু বেশী সময়ে সম্পন্ন হয় এবং সৌর বর্ষ ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেণ্ডে সম্পন্ন হয়। হিজরী সন বাংলা সনের চেয়ে প্রতি ৩৩ বৎসরে এক বৎসর এগিয়ে যায়। ফলে হিজরী সন হ'তে বাংলা সনের উৎপত্তি হ'লেও এই কম-বেশীর কারণে বিগত ৪৪৩ বছরে হিজরী সনের সাথে বাংলা সনের ১৩ বছরের পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। এখন বাংলা ১৪০৬ সাল কিন্তু তার সঙ্গে ১৩ বছর যোগ হয়ে এখন হিজরী ১৪১৯ সাল। সৌরবর্ষ সূর্যের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় বাৎসরিক ঋতু পরিক্রমা, মাস, দিন, ঘণ্টা নির্দিষ্ট সময়ে আবর্তিত হয়। ফলে আমাদের গণনা কার্যেও সুবিধা হয়। কিন্তু চান্দ্রবর্ষ চন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় এবং সৌরবর্ষ হ'তে বছরে ১০/১১ দিন কম হওয়ায় ছিয়াম, হজ্জ ইত্যাদি ইবাদত পালনে সুবিধা হয়। সারা বছর সকল ঋতুতে ঘুরে-ফিরে রামাযান, হজ্জ, ঈদ ইত্যাদি পালনের সুযোগ ঘটে। অন্যথায় কোন দেশে হয়ত শুধু গ্রীষ্মকালেই রামাযান আসত কিংবা কোন দেশে কেবল শীত কালেই। এতে নির্দিষ্ট এলাকার জন্য অবিচার হ'ত। ইসলাম বিশ্বধর্ম। তাই বিশ্বের সকল এলাকার বান্দাগণের প্রতি সুবিচার করার জন্য ফরয ইবাদতগুলির সময়কালকে আল্লাহ চান্দ্র মাসের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

উপরোক্ত আলোচনায় পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, নববর্ষ কোন উদযাপনের বিষয় নয়। বরং হিসাব কষার দিন। হিজরী নববর্ষ কখনো বিশেষভাবে উদযাপিত হয়েছে বলে খুলাফায়ে রাশেদীনের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। প্রতিটি দিন, মাস ও বর্ষ আল্লাহ্র সৃষ্টি। বান্দার কর্তব্য অতীতের হিসাব করে বর্তমানকে ব্যবহার করা ও ভবিষ্যতের পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

বাংলাদেশে নববর্ষ মূলতঃ তিনটি। ১- ইংরেজী নববর্ষ ১লা জানুয়ারী, ২- হিজরী নববর্ষ ১লা মুহাররম ও ৩- বাংলা নববর্ষ ১লা বৈশাখ। এর মধ্যে বাংলা নববর্ষ হ'ল সবচেয়ে উপেক্ষিত। কেননা এ দেশের সরকারী-বেসরকারী দিন, তারিখ, সময় সবকিছু নির্ধারিত হয় ইংরেজী ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী। চীন ও জাপান যেমন নিজস্ব ভাষা ও সনের উপরে দাঁড়িয়েই ইংরেজীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে এগিয়ে চলেছে, ইচ্ছা করলে আমরাও সেটা পারি। কিন্তু সেটা হৌক বা না হৌক আমাদের লক্ষ্য এখন অন্যদিকে। আর তা হ'ল নববর্ষ উদযাপনের নামে বেলেল্লাপনা, বেহায়াপনা ও মূর্তি সংস্কৃতির প্রচলন করা। প্রত্যেক জাতির সংস্কৃতির মধ্যে তাদের আক্বীদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনার ছাপ থাকে। কিন্তু এবার রাজধানী ঢাকায় যে নববর্ষ উদযাপিত হ'ল এবং পত্রিকা সমূহের রিপোর্ট মতে কপালে চাঁদতারা খচিত সাপ, ঘোড়া, পেঁচা ইত্যাদি পশু-পক্ষীর মুখোশ মিছিল, টিএসসিতে দু'ঘণ্টা ধরে প্রকাশ্যে ফ্রি স্টাইলে নারী নিপীড়ন, সিঁথিতে সিঁদুর লাগিয়ে কপালে চন্দনতিলক দিয়ে ধুতি-পাঞ্জাবী ও লালপেড়ে শাড়ী পরে ঢোল-তবলা বাজিয়ে যে মিছিল করা হ'ল, এগুলি কোন্ সংস্কৃতির নিদর্শন? 'এসো হে বৈশাখ! দুর্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো' বলে আহ্বান কোন আক্বীদার প্রতিনিধিত্ব করে? মূলতঃ বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নভাবে ১লা বৈশাখকে মূল্যায়ন করেছেন তাঁদের স্ব স্ব ধারণা অনুযায়ী। যেমন প্রেসিডেন্ট তাঁর বাণীতে বলেছেন, 'বিগত বছরের সাফল্য ও ব্যর্থতার আলোকে নতুন উপলব্ধিতে কর্মক্ষেত্রে নিজেকে আরও নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়োজিত করতে হবে'। প্রধানমন্ত্রী* বলেছেন, 'উন্মত্ত সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও কূপমণ্ডূকতার বিরুদ্ধে নিত্য সংগ্রামমুখর বাঙালীর জাতীয় জীবনে নববর্ষ নতুন উদ্যমে বাঁচার সাহস যোগায়'। বিরোধী দলীয় নেত্রী** 'নববর্ষের প্রথম দিন চলমান গণ আন্দোলনকে গণ অভ্যুত্থানে পরিণত করার শপথ নেওয়া'র আহ্বান জানান। ঢাকার রাজপথে যখন সংস্কৃতিসেবীরা ৫০ থেকে ২০০ টাকা

প্লেট ইলিশ-পান্তা খাওয়ার বিলাসিতা করছেন। বাংলার নিভৃত পল্লীতে তখন অসংখ্য মানুষ অনাহারে নীরবে চোখের পানি ফেলছেন। তাই বলি নববর্ষ উদযাপনের নামে অহেতুক অপচয় ও অপসংস্কৃতির আমদানী বন্ধ করে দেশের প্রতিটি পয়সা ও প্রতিটি ঘণ্টা ও মিনিট দেশ গড়ার কাজে লাগান। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন![৮৪]

অপসংস্কৃতি

৪৩. থার্টি-ফার্স্ট নাইট

৩১শে ডিসেম্বর প্রতিটি সৌর বর্ষের শেষ দিন। এদিন দিবাগত রাতকে ইংরেজীতে ‘থার্টি-ফার্স্ট নাইট’ বলা হয়। এই বিদায়ী রাত্রির ১২-টা ১ মিনিটে ইংরেজী ক্যালেণ্ডারের হিসাবে পরবর্তী নববর্ষ শুরু হয়। যদিও চান্দ্র বর্ষ হিসাবে দিন গণনা শুরু হয় প্রতিদিন সূর্যাস্তের পর হ’তে।

‘থার্টি ফার্স্ট’ বলে কোন আনন্দ রাতের খবর এদেশের মানুষ জানত না। বিগত কয়েক বছর যাবত এটি রাজধানীতে দেখা যাচ্ছে এবং রাতটি নতুন আঙ্গিকে জাতির সামনে আবির্ভূত হচ্ছে। বলা যায় রীতিমত একটা ভয়ংকর রাত। এ রাত এখন আনন্দ-ফূর্তির নামে পুরোদস্তুর একটা জংলী রাতে পরিণত হয়েছে। সংসারের দায়িত্বহীন কিছু তরুণ-তরুণী ও আর্থিক দুশ্চিন্তাহীন কিছু ফূর্তিবাজ মানুষ এ রাতের প্রধান নট-নটী। বাপের পাঠানো টাকায় যারা নিশ্চিন্তে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে, তাদের একাংশ এ রাতে নেচে-গেয়ে ফূর্তি করে এমন পর্যায়ে চলে যায়, যা মনুষ্যত্বের সীমানা পেরিয়ে জন্তু-জানোয়ারকেও হার মানায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে এ রাতের শিকার জনৈকা বাঁধনের শ্লীলতাহানির ঘটনায় বিগত সরকারের আমলে সারা দেশে তোলপাড় হয়েছিল। বর্তমান সরকার এগুলিকে নিষিদ্ধ করছেন না, তবে যাতে আনন্দ-ফূর্তি ঠিক থাকে, কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে না যায়, সেজন্য পুলিশ প্রটেকশন দিচ্ছেন। রসগোল্লা আলগা রেখে মাছি তাড়ানোর জন্য কর্মচারী নিয়োগ করা যেমন বোকামী, থার্টি ফার্স্ট নাইটের আনন্দ-ফূর্তির অনুষ্ঠানের বৈধতা অব্যাহত রেখে তার বাড়াবাড়ি বন্ধ করার জন্য পুলিশ নিয়োগ করা অনুরূপ বোকামী বৈ কিছুই নয়।

---

৮৪. ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, মে ১৯৯৯। * শেখ হাসিনা। ** বিএনপি সভানেত্রী খালেদা জিয়া।

অন্যবারের চেয়ে এবারের বিষয়টি অতীব দুঃখবহ। কারণ একদিকে ইরানের গত ২৬শে ডিসেম্বরের ভয়াবহ ভূমিকম্পে অর্ধ লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু ও লক্ষ লক্ষ আহত ও আশ্রয়হারা মানুষের আহাজারিতে বিশ্ব চেতনা সেখানে থমকে দাঁড়িয়েছে, অন্যদিকে ২৫শে ডিসেম্বরে পশ্চিম আফ্রিকার বেনিনে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত বাংলাদেশের ১৫ জন কৃতি সামরিক কর্মকর্তার লাশ ৩১শে ডিসেম্বর দিবাগত সন্ধ্যা রাতে ঢাকার মাটি স্পর্শ করছে। দেশবাসী শোকে মুহ্যমান। সরকার এদিন জাতীয় শোক দিবস ঘোষণা করেছেন। অথচ সবকিছু মানবিক আর্তিকে দলিত-মথিত করে এ রাতেই রাজধানীসহ বড় বড় মহানগরী ও পর্যটন নগরীগুলিতে চলছে থার্টি-ফার্স্ট নাইটের নামে নানাবিধ আনন্দ-ফূর্তির অনুষ্ঠান ও রাতভর হৈ-হুল্লোড় আর ক্যাসেট ও মাইকবাজির অত্যাচার। তাই একে 'থার্টি-ফার্স্ট নাইট' না বলে 'ফষ্টি-নষ্টি নাইট' বলাই যথার্থ হবে। পাশ্চাত্যের জান্তব সভ্যতার অংশবিশেষ হ'ল এই কথিত 'থার্টি-ফার্স্ট নাইট' ও 'ভ্যালান্টাইন্‌স ডে' বা 'ভালোবাসা দিবস'। বাংলাদেশের ধর্মীয় সংস্কৃতি এগুলিকে অস্বীকার করে। মানবতা বিধ্বংসী এইসব অপসংস্কৃতি থেকে জাতিকে রক্ষা করার প্রধান দায়িত্ব সরকারের এবং রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের। জানিনা সরকারী দল ও মন্ত্রী মহোদয়গণ গোপনে এগুলির সমর্থক কি-না। নইলে এগুলি বন্ধ করার মত শক্তি-সাহস বা ক্ষমতা কোনটাই তো তেমন চোখে পড়ে না।

আমাদের বক্তব্য হ'ল : এই ধরনের যাবতীয় নগ্ন সংস্কৃতি নিষিদ্ধ করে সরকারী নির্দেশ জারি করতে হবে এবং তা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। দুর্বল সরকার নয়, শক্ত সবল ও সাহসী সরকার চাই। দুর্নীতি ও অপসংস্কৃতি পরস্পরে মাসতুতো ভাই। দু'টোকে বারিত করার জন্য সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

ইসলামী সংস্কৃতিতে বর্ষ বিদায় ও বর্ষ বরণের কোন বিধান নেই। প্রতি রাতেই আমরা মৃত্যুবরণ করি। প্রতি প্রত্যুষেই আমরা নতুন জীবন পেয়ে আল্লাহ্‌র নিকটে সিজদায় লুটিয়ে পড়ি ও তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। অতঃপর তাঁর তাওফীক কামনা করে দিবসের কর্তব্যকর্মে নিজেকে নিয়োজিত করি। এজন্যেই ঘুমাতে যাবার সময় বলি- *বিসমিকাল্লা-হুম্মা আমূতু ওয়া আহ্‌ইয়া* 'হে আল্লাহ! তোমার নামে আমি মরি ও বাঁচি'। প্রত্যুষে যখন ঘুম থেকে উঠি,

তখন বলি, *আলহামদুলিল্লা-হিল্লাযী আহ্ইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর* 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি আমাকে মৃত্যু দানের পরে জীবন দান করেছেন এবং তাঁর দিকেই হবে আমাদের পুনরুত্থান'।[৮৫] যে মুসলমান দৈনিক রাতে ও সকালে এই দো'আ পড়ে ও তার প্রভুর নিকটে জীবনের হিসাব পেশ করে, তার জন্য প্রতি রাতই বিদায়ী রাত ও প্রতিটি দিনই নতুন দিন। দিবস ও রাত্রির সৃষ্টিকর্তা হ'লেন আল্লাহ। উভয়টির জন্য পৃথক কর্মসূচী ও কর্ম পরিধি প্রদান করেছেন আল্লাহ। সূর্যকে দিবসে এবং চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজিকে রাত্রিতে মাখলূক্বাতের সেবার জন্য তিনিই নিয়োজিত করেছেন। পানিতে-ভূমিতে ও অন্তরীক্ষে সৃষ্ট সকল মাখলূক্বাতকে তিনি মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এসব কিছুই বান্দার প্রতি তাঁর অফুরন্ত দয়ার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তাঁর এই সৃষ্টি কৌশলে কোন ত্রুটি কেউ খুঁজে পাবে না *(মুল্ক ৬৭/৩)*। কারু কল্যাণ বা অকল্যাণ করার ক্ষমতা দিবস বা রাত্রির নেই। সেকারণ কোন দিন বা রাতকে, কোন সময় বা মুহূর্তকে শুভ বা অশুভ বলে গণ্য করার কোন যৌক্তিকতা নেই। হাদীছে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সময়কে গালি দিয়ো না। আমিই সময়' অর্থাৎ কালের স্রষ্টা। আমার হাতেই সকল ক্ষমতা। আমিই রাত্রি ও দিবসকে যেভাবে চাই আবর্তন করি'।[৮৬] তাই ইসলামী শরী'আতে বর্ষবরণের বা বর্ষ বিদায়ের বা কোন দিবস পালনের কোন বিধান নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরাম এরূপ কিছু করেছেন বলে জানা যায় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্ম দিবস, নবুঅত প্রাপ্তি দিবস, মি'রাজ দিবস, মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত দিবস, বদর দিবস, মক্কা বিজয় দিবস, তাঁর মৃত্যু দিবস প্রভৃতি স্মরণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দিবসগুলি তাঁর যুগে, খেলাফতে রাশেদাহ্র যুগে কিংবা উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে কখনোই পালিত হয়নি। এগুলি বিধর্মীদের দেখাদেখি মুসলিম উম্মাহ্র কোন কোন অঞ্চলে বিশেষ করে উপমহাদেশীয় মুসলমানদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে মাত্র।

অতএব শুধু থার্টি-ফার্স্ট নাইটে নয়, বরং দূরদর্শী মানুষের জন্য প্রতি রাত্রিতেই আগামীকাল সুন্দর জীবনের হিসাব করা উচিত। আমাদের আয়ুষ্কাল খুবই সামান্য। তাই জীবনের প্রতিটি সেকেণ্ড ও মিনিটকে হিসাব করে কাজে

৮৫. বুখারী হা/৬৩২৪; মিশকাত হা/২৩৮২ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, অনুচ্ছেদ-৬।
৮৬. মুসলিম হা/২২৪৬; বুখারী হা/৪৮২৬; মিশকাত হা/২২ 'ঈমান' অধ্যায়।

লাগাতে পারলেই ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে উন্নতি আসবে, নইলে নয়। আল্লাহ আমাদের তরুণ-তরুণীদের ও সমাজ নেতাদের সুমতি দান করুন এবং আমাদের সকল গুনাহ-খাতা মাফ করে সুন্দর মানুষ হবার তাওফীক দান করুন- আমীন।[৮৭]

৪৪. ভ্যালেন্টাইন্স ডে

বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে যেসব বিদেশী অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে, সেসবের অন্যতম হ'ল 'ভ্যালেন্টাইন্স ডে' (Valentine's Day) বা ভালবাসা দিবস। প্রতিবছর ১৪ই ফেব্রুয়ারীর এদিনে তরুণ-তরুণীরা পরস্পরের প্রতি ভালবাসায় উন্মাতাল হয়ে পড়ে। পরস্পরের প্রতি লাল গোলাপের উপহার বিনিময় করে। কলিজার লাল ছাপ মারা গেঞ্জি ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়। বড় বড় শহরের ধনীর দুলালেরা কিংবা লক্ষ্যহীন যুবক-যুবতীরা এদিনটা তাদের অমিত যৌনাচারের মোক্ষম সুযোগ হিসাবে কাজে লাগায়। বিশেষ বিশেষ বিল্ডিংকে তারা এসব কাজে ব্যবহার করে এবং সেখানে নানাবিধ অনুষ্ঠান করে। প্রশ্ন হ'ল এই যে, এগুলি আসল কোত্থেকে এবং এগুলির উৎস কি? উৎসের সন্ধানে গেলে আমরা নিম্নোক্ত তিনটি বিষয় দেখতে পাই।- ১. ১৪ই ফেব্রুয়ারী হ'ল রোমকদের বিবাহ দেবী 'ইউনু'-এর বিবাহের পবিত্র দিন। ২. ১৫ই ফেব্রুয়ারী হ'ল রোমকদের 'লেসিয়াস' দেবীর পবিত্র দিন। এদিন তিনি দু'টি শিশুকে দুধ পান করিয়েছিলেন। যারা পরবর্তীতে রোম নগরীর প্রতিষ্ঠাতা হয়েছিল। ৩. রোম সম্রাট ক্লডিয়াস তার বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করতে গিয়ে যখন এতে বিবাহিত পুরুষদের অনাসক্তি দেখলেন, তখন তিনি পুরুষদের জন্য বিবাহ নিষিদ্ধ করে ফরমান জারি করেন। কিন্তু জনৈক রোমান বিশপ সেন্ট ভ্যালেন্টাইন এটাকে অস্বীকার করেন ও গোপনে বিয়ে করেন। সম্রাটের কানে এ খবর গেলে তাকে পাকড়াও করা হয় ও ২৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারীতে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। সেদিন থেকে এ দিনটি 'ভালবাসা দিবস' হিসাবে অথবা ঐ সাধুর নামানুসারে 'ভ্যালেন্টাইন্স ডে' হিসাবে পালিত হয়ে আসছে।

---

৮৭. ৭ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা জানুয়ারী ২০০৪।

আধুনিক মিডিয়ার কল্যাণে ইদানিং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ দিবসটি পরিচিতি লাভ করেছে এবং বেশ জোশের সাথে পালিত হয়ে আসছে। ইংল্যাণ্ড ও ইতালীতে নাকি অবিবাহিত তরুণীরা এদিন সূর্যোদয়ের আগেই ঘুম থেকে উঠে স্ব স্ব বাড়ীর জানালা পথে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে। সেখানে তারা প্রথম যে ব্যক্তিকে দেখতে পায়, সেই ব্যক্তি অথবা তারই মত আরেক ব্যক্তি তাকে বিয়ে করবে এক বছরের মধ্যে এরূপ একটি বিশ্বাস তাদের মধ্যে গেঁথে গেছে। ইংরেজ কবি ও নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপিয়ার (১৫৬৪-১৬১৬ খৃঃ) তার বিখ্যাত হ্যামলেট (Hamlet) নাটকে এ বিশ্বাসেরই প্রতিধ্বনি করেন ওফেলিয়ার (Ophelia) মুখ দিয়ে গাওয়ানো একটি গানে এভাবে- Tomorrow is St. Valentine's Day, all in the morning betime, and I a maid at your window, To be your Valentine. 'আগামীকাল সেন্ট ভ্যালেন্টাইন্‌স ডে। সমস্ত সকাল জুড়ে জানালায় দাঁড়িয়ে আছি তোমার 'ভ্যালেন্টাইন' হ'তে'।

উপরের আলোচনায় একথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, কথিত 'ভালবাসা দিবস' মূলতঃ রোমক সংস্কৃতি। যা শিরকী আক্বীদা হ'তে উৎসারিত। ইসলামী আক্বীদার সাথে যা পুরাপুরি সাংঘর্ষিক। বর্তমানে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ প্রবণতা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইংরেজী নববর্ষের পূর্বরাত 'থার্টি ফার্স্ট নাইট' ভ্যালেন্টাইন্‌স ডে, সুন্দরী প্রতিযোগিতা প্রভৃতির বেলেল্লাপনার দৃশ্য টেলিভিশনের পর্দায় ও খবরের কাগজের পাতায় যেভাবে প্রদর্শিত ও প্রকাশিত হচ্ছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে দেশ পাশ্চাত্য দেশগুলির ন্যায় অনৈতিক দেশে পরিণত হবে। যেখানে সতীত্ব ও বিশুদ্ধ চরিত্র বলে কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না। এক্ষণে আমরা দেখব, এইসব অনুষ্ঠানের সাথে ইসলামের সম্পর্ক কেমন।

প্রথমতঃ এটি প্রতি বছর আনন্দের ও ভালবাসার দিবস তথা 'ঈদুল হুব্ব' হিসাবে পালিত হয়। অথচ ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা ব্যতীত কোন স্বীকৃত 'ঈদ' ইসলামে নেই।[৮৮] উল্লেখ্য যে, ঈদও দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই সকল জাতির জন্য ঈদ রয়েছে এবং এটি হ'ল আমাদের ঈদ'।[৮৯]

---

৮৮. আবুদাঊদ হা/১১৩৪; মিশকাত হা/১৪৩৯ 'ঈদায়েনের ছালাত' অনুচ্ছেদ।
৮৯. বুখারী হা/৯৫২; মুসলিম হা/৮৯২; মিশকাত হা/১৪৩২ 'ঈদায়েনের ছালাত' অনুচ্ছেদ।

দ্বিতীয়তঃ ভ্যালেন্টাইন্স ডে মূলতঃ একটি শিরকী উৎসব। তাছাড়া এর মাধ্যমে যৌন সুড়সুড়ি দেওয়া হয় মাত্র। যা নিঃসন্দেহে অনৈতিক। ইসলাম কখনোই কোন শিরকী আক্বীদা ও অনৈতিক আচরণকে সমর্থন করে না। বেগানা নারী ও পুরুষের মধ্যে বিবাহ বহির্ভূত সকল প্রকার মেলামেশাকে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। তৃতীয়তঃ এ অনুষ্ঠান পালনে কাফির ও মুশরিকদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে ব্যক্তি তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে'।[৯০] চতুর্থতঃ অমুসলিমদের পালিত যেকোন অনুষ্ঠানে বিশেষ করে তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে মুসলমানদের যোগদান করা অর্থ তাদের অনুষ্ঠানে উৎসাহ যোগানো ও সহযোগিতা করা। মুসলমান কখনোই নিজেদের তাওহীদী আক্বীদা ও ছহীহ সুন্নাহ বিরোধী কোন অনুষ্ঠানে যোগদান দূরে থাক, কোনরূপ উৎসাহ প্রদান ও সহযোগিতা করতে পারে না। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকী ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর। পাপ ও শত্রুতার কাজে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ৫/২)*।

আমরা মুসলমান। আমরা আখেরাতে বিশ্বাস করি। আমাদের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত বিশ্বাসের ভিত্তিতে। আমরা দুনিয়াকে আখেরাতের শস্যক্ষেত্র হিসাবে মনে করি। দুনিয়াবী আয়েশ-আনন্দের চাইতে আমরা আখেরাতে মুক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি। যে কাজে রাসূল-এর অনুমোদন নেই, যে কাজে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি নেই, যে কাজে আখেরাতে কিছু পাওয়ার নেই, সে কাজকে আমরা অহেতুক ও অপচয় মনে করি। 'ভ্যালেন্টাইন্স ডে' অনুরূপ একটি ফাল্তু কাজ ব্যতীত কিছুই নয়। দেশের যুবসমাজকে ধ্বংস করার জন্য এটা শয়তানের পাতানো একটি ফাঁদ মাত্র। শয়তান আমাদের প্রকাশ্য দুশমন। আমরা যেকোন মূল্যে শয়তানী ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকতে চাই। আমাদের ছালাত, আমাদের কুরবানী, আমাদের জীবন, আমাদের মরণ সবকিছু কেবল আল্লাহ্র জন্যই উৎসর্গীত। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে বর্তমান ফিৎনার যামানায় যাবতীয় শিরকী ও বিদ'আতী

---

৯০. আবুদাঊদ হা/৪০৩১; আহমাদ হা/৫১১৪; মিশকাত হা/৪৩৪৭ 'পোষাক' অধ্যায়।

রসম-রেওয়াজ থেকে বেঁচে থাকার ক্ষমতা দাও এবং আমাদের দেশের প্রশাসনকে ইসলামের পক্ষে শক্তিশালী ভূমিকা রাখার তাওফীক দাও! আমীন।[৯১]

সামাজিক

৪৫. পতিতাবৃত্তি বন্ধ করুন

নির্যাতিত, অবহেলিত ও উপেক্ষিত নারী সমাজের অধিকার নিশ্চিত করেছে ইসলাম। কন্যা সন্তানকে জীবন্ত পুঁতে মেরে ফেলার মত জাহেলী প্রথার মূলোৎপাটন করেছে ইসলাম। ইসলামই দিয়েছে তাদের উত্তরাধিকারের সুমহান মর্যাদা। দিয়েছে মাতৃত্বের চির গৌরব। অথচ সে নারী আজ প্রতিনিয়ত নির্যাতিত হচ্ছে। বঞ্চিত হচ্ছে তাদের অধিকার থেকে। পরিণত হয়েছে পণ্য সামগ্রীতে। আবার এক শ্রেণীর নারী প্রগতির দোহাই দিয়ে নিজেরাই অশালীনতায় মত্ত রয়েছেন।

নারী ও শিশু নির্যাতন অন্য যেকোন সময়ের রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। পত্রিকার পাতা উল্টালেই এরূপ অসংখ্য চিত্র ভেসে উঠে। প্রতিনিয়ত বিদেশে পাচার হচ্ছে অসংখ্য নারী ও শিশু। চাকুরীর লোভ দেখিয়ে ঘর থেকে বের করা হয় এসব নারীদের। কেউবা আবার দারিদ্র্যের দুঃসহ যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে স্বেচ্ছায় বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসে কাজের সন্ধানে। অথচ এক শ্রেণীর প্রতারকের খপ্পরে পড়ে পাচার হয়ে জীবনের সকল আশা-আকাঙ্খা, চাওয়া-পাওয়া, সুখ-শান্তি নিমেষেই ম্লান হয়ে যায় তাদের। অবশেষে ঠাঁই হয় দেশ বা বিদেশের কোন পতিতালয়ে। নিজেদের পরিচয় ঘটে পতিতা হিসাবে। আবার অনেকে দাম্পত্য জীবনের সোনালী অধ্যায় থেকে অকস্মাৎ ছিটকে পড়ে হতাশার শিকার হয়ে বাকী জীবনের জন্য বেছে নেয় এ পথকে। কেউবা আবার দারিদ্র্যের কষাঘাতে হোঁচট খেয়ে স্বেচ্ছায় লিপ্ত হয় এ পেশায়। সরকার অনুমোদিত এ পেশাটি এখন প্রধান শহরগুলোতে জমজমাট রূপ পরিগ্রহ করেছে। এক শ্রেণীর পাচারকারী অধিক মুনাফার লক্ষ্যে কিশোরীদেরও বাধ্য

---

৯১. ৭ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা মার্চ ২০০৪।

করছে এ পেশায়। পত্রিকান্তরে প্রকাশ, সরকারী হিসাব অনুযায়ী দেশের ১৮টি অনুমোদিত পতিতালয়ে বর্তমানে ৮০ হাযারের অধিক শিশু পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত রয়েছে। যাদের বয়স ১১ থেকে ১৪ বছর। অবশ্য বেসরকারী সংস্থার হিসাব অনুযায়ী পাঁচ লাখ। অন্য এক জরীপে প্রকাশ, বাংলাদেশ থেকে প্রতিমাসে বিদেশে পাচার হয় ৫০০ নারী। বিশ্বের বিভিন্ন পতিতালয়ে ঠাঁই হয় এদের অধিকাংশের। দুর্বিসহ এ জীবন থেকে উদ্ধার পেয়ে আর কখনো স্বদেশের মাটিতে পা রাখার সৌভাগ্য হয় না তাদের। এভাবেই জীবন প্রদীপ নিভে যায় একদিন। রিপোর্টে প্রকাশ, কেবল পাকিস্তানেই গত ১০ বছরে পাচার হয়েছে প্রায় দু'লাখ নারী।

যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগঠিত হবার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে 'কোয়ালিশন এগেইনস্ট ট্রাফিকিং ইন উইমেন' (সিএটিডব্লিউ) বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে ঢাকার হোটেল শেরাটনে গত ২৭ থেকে ২৯ জানুয়ারী যৌন নিপীড়ন বিরোধী বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও এশিয়া মহাদেশের ৫৬ জন প্রতিনিধি এ সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনে বক্তাগণ পতিতাবৃত্তি সিদ্ধকরণকে মানবাধিকার লঙ্ঘন বলে আখ্যায়িত করে এ পেশা বন্ধের দাবী জানান। তারা সুইডেন ও ভেনেজুয়েলার উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, 'দেশ দু'টি রাষ্ট্রীয়ভাবে পতিতাবৃত্তি নিষিদ্ধ করেছে এবং এর জন্য শাস্তি ও জরিমানাও নির্ধারণ করেছে। পাশাপাশি পতিতাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে। কাজেই তাদের নিকট থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে'। তাদের এ দাবী ও বক্তব্যকে আমরা সাধুবাদ জানাই এবং অবিলম্বে পতিতাবৃত্তি নিষিদ্ধ করা ও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে তা কার্যকর করার জোর দাবী জানাই। সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলে শেরাটন ছেড়ে নিষিদ্ধ পল্লীতে সিএটিডব্লিউ প্রবেশ করবে- এ প্রত্যাশা আমাদের।

বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশ। কিন্তু দুর্ভাগ্য, বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক অবক্ষয় আইয়ামে জাহেলিয়াতকেও হার মানিয়েছে। আড়াই বছরের শিশু থেকে ৬০ বছরের বৃদ্ধাও এ দেশে নিরাপদ নয়। খুন-খারাবী-সন্ত্রাস মামুলী ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। মানুষের মাথা কেটে জনসমক্ষে ফুটবল খেলার মত লোমহর্ষক ঘটনাও ঘটল কিছুদিন আগে কুমিল্লায়। মুসলিম

দেশের মুসলিম শাসকগণ পতিতাবৃত্তির মত একটি ঘৃণ্য ও জঘন্য পেশাকেও রাষ্ট্রীয়ভাবে অনুমোদন দিয়েছেন। ডিশ এন্টেনার অনুমোদনের মাধ্যমে যুব চরিত্র ধ্বংসের সুযোগ করে দিয়েছেন। অশ্লীল পত্র-পত্রিকা, দেয়ালে দেয়ালে অশ্লীল পোষ্টারিং ও প্রেক্ষাগৃহে নীল ছবি প্রদর্শন ইত্যাদি চরিত্র বিধ্বংসী কার্যক্রম বন্ধেও সরকারের কোন তৎপরতা নেই। নেই সামাজিক তাগিদও। মানুষকে নিয়েই সমাজ, আর সেই মানুষ বিশেষ করে তরুণ শ্রেণী যদি এভাবে ধ্বংস হয়ে যায় তাহ'লে সুন্দর সমাজ গড়ার আশা করা কেবল বৃথা রাজনৈতিক শ্লোগান নয় কি?

ক্রমাবনতিশীল এ সমাজকে বাঁচাতে হ'লে এবং স্বচ্ছ, সুস্থ ও সুশৃঙ্খল সমাজ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে সর্বাগ্রে বেহায়াপনা থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে। পতিতাবৃত্তি সরকারীভাবে নিষিদ্ধ করে এসব পতিতাদের পুনর্বাসন করতে হবে এবং সর্বোপরি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর এজন্য বিত্তবান ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকেও এগিয়ে আসতে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন![৯২]

৪৬. পশুত্বের পতন হৌক!

শামসুদ্দীন জুয়েল (২৫)। মৃত্যুর দিকে দ্রুত ধাবমান ডুবন্ত এক তরতাযা যুবক। চাঁদাবাজ পুলিশের তাড়া খেয়ে সচ্ছল ঘরের শিক্ষিত এই নিরপরাধ যুবকটি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে পালাতে গিয়ে পড়ে যায় ড্রেনে। তার সাথী কিরণের পকেট থেকে পুলিশ পঞ্চাশ টাকা হাতিয়ে নিয়ে ছেড়ে দেয়। কিন্তু তার পকেটে কিছু না পেয়ে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিয়ে ক্যাম্পে নিয়ে যেতে চায়। এতে ভয় পেয়ে সে দৌড় দেয়। অবশেষে নোংরা নর্দমার গভীরতায় সে ক্রমে তলিয়ে যেতে থাকে। 'বাঁচাও' 'বাঁচাও' বলে আর্তচীৎকার করতে থাকে সে। দু'হাত জোড় করে অনুরোধ করতে থাকে সে সকলের কাছে করুণ কণ্ঠে। উপরে দাঁড়িয়ে থাকা 'জনগণের বন্ধু' পুলিশগুলি হো হো করে হাসতে থাকে জুয়েলের কাতর আর্তির জবাবে। এলাকার সাধারণ মানুষ তাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে যায়। মাতৃস্নেহে উদ্বেলিত জনৈকা মহিলা নিজের

৯২. ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯।

শাড়ী ঝুলিয়ে দেন, যেন তা ধরে ছেলেটা বাঁচতে পারে। কিন্তু না। কারু পক্ষে কিছুই করা সম্ভব হয়নি। ঐ পুলিশ নামধারী নিষ্ঠুর হায়েনাদের বাধার জন্য। অবশেষে... হ্যাঁ অবশেষে এক সময় বৃদ্ধ পিতা-মাতার নয়নের মণি, তাদের ভবিষ্যৎ রঙিন স্বপ্নের রূপকার, অতি আদরের কলিজার টুকরা সন্তান শামসুদ্দীন জুয়েল তলিয়ে গেল চিরদিনের মত ড্রেনের নোংরা পানিতে। হারিয়ে গেল চিরতরে সভ্য মানুষের গড়া এ পৃথিবী থেকে। রেখে গেল একরাশ প্রশ্ন : এই কি মানবতা, এই কি আইনের শাসন! ১৮ই নভেম্বর'৯৯ খবর বের হ'ল বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে। রাজধানীর মুগদাপাড়া এলাকার শোকার্ত সাধারণ মানুষ মিছিল করে তাদের আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ ঘটালো। পুলিশের ফাঁসি দাবী করলো। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। এর বেশী তাদের আর কি-ইবা করার আছে? যাদের করার ছিল, তারা অত্যন্ত সুচতুরভাবে পুলিশ তিনটাকে ক্লোজ করে নিয়ে জনগণের ক্ষোভ থেকে বাঁচিয়ে নিল। এরপর শুরু হয়েছে মিথ্যা ও প্রতারণার জাল ফেলা। দু'পাঁচ বছর পরে যখন বিচারের রায় বেরোবে, তখন হয়ত বলা হবে যে, ছেলেটি ছিল সন্ত্রাসী কিংবা অপ্রকৃতিস্থ। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যথারীতি আইন প্রয়োগ করতে যাওয়ার কারণে সে প্রাণভয়ে পালাতে গিয়ে ড্রেনে ডুবে মরেছে। পুলিশের সেখানে কিছুই করার ছিল না। অতএব পুলিশ বেকসুর খালাস (!)

দেশের সর্বত্র প্রতিদিন এমনিভাবে চলছে চাঁদাবাজি, খুন-ধর্ষণ, অত্যাচার-নির্যাতন, গুম-অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায়ের মহোৎসব। পত্রিকায় শিরোনাম হয়ে বেরিয়ে আসছে খুলনার ত্রাস এরশাদ শিকদারের লোমহর্ষক হত্যাযজ্ঞের ঘটনাবলী। জীবন্ত মানুষকে হাত-পা বেঁধে ডোবায় পোষা রাক্ষুসী মাগুর মাছ দিয়ে খাইয়ে দেওয়া, বস্তায় ভরে ইট ঝুলিয়ে নদীতে ফেলে হত্যা করা এসবই ছিল তার নিয়মিত ঘটনা। ভৈরবের তলদেশ থেকে এখন বেরিয়ে আসছে তার নিষ্ঠুরতার মর্মান্তিক সাক্ষ্যসমূহ। ওদিকে তাকে ডিঙিয়ে শিরোনাম দখল করতে যাচ্ছে চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর এলাকার ত্রাস লাল্টু বাহিনীর পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের খবর সমূহ। জীবন্ত মানুষকে বস্তায় ভরে জ্বলন্ত ইট ভাটায় ছুঁড়ে ফেলে জাহান্নামের শাস্তির মহড়া দেখিয়ে সে ইতিমধ্যে নিষ্ঠুরতার প্রতীক হয়ে উঠেছে। অথচ খুলনার ন্যায় সেখানেও পুলিশের ও রাজনৈতিক নেতাদের

সম্পৃক্ততার খবর পাওয়া যাচ্ছে। পুলিশের হেফাযতেও খুন হচ্ছে মানুষ প্রতিনিয়ত। এমনকি খোদ রাজধানীতে ডিবি হেড কোয়ার্টারে রুবেল হত্যা, জালাল হত্যা সচেতন মানুষকে বোবা বানিয়ে দিয়েছে। যেগুলির কোন বিচার আজও হয়নি। কখনো হবে বলেও অনেকে বিশ্বাস করেন না। খোদ সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গণে প্রকাশ্য দিনের বেলায় শত শত মানুষের সামনে যুবক খুন হ'ল। অতঃপর সন্ত্রাসীরা বীরদর্পে বুক ফুলিয়ে নির্বিঘ্নে চলে গেল। অথচ কিছুই হ'ল না। তাহ'লে মানুষ যাবে কোথায়? দেশে এই ক্রমবর্ধমান অপরাধপ্রবণতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণ কি? বিচারক আছেন। বিচারালয় আছে। দল আছে, নেতা আছেন। নির্বাচন আছে, ভোটাভুটি আছে, গণতন্ত্র আছে। আইন আছে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা আছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। এর কারণ কি?

আমরা মনে করি যে, একটি মানবিক সমাজ গড়তে গেলে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন নৈতিকতার উজ্জীবন ও মানবতার অনুশীলন। প্রয়োজন নীতিবান ও আদর্শবান নেতৃত্ব। স্বাধীন ও সহজ বিচার ব্যবস্থা, আইনের সফল ও সুষ্ঠু প্রয়োগ এবং নিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থা। বলা চলে যে, বাংলাদেশে বর্তমানে উপরোক্ত গুলির কোনটিই পুরোপুরিভাবে নেই। নৈতিকতার উজ্জীবন নয় বরং অপনোদনের প্রতিযোগিতা সর্বত্র লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নীতিবান ও আদর্শবান নয় বরং নীতিহীন ও আদর্শহীন নেতৃত্ব জাতির ঘাড়ে সওয়ার হয়ে আছে। দু'দিন আগেও যাকে স্বৈরাচার বলা হয়েছে, আজ আবার তাকেই বরণ করে নেওয়া হচ্ছে ফুলের তোড়া দিয়ে। সরকারে থাকলে স্বৈরাচার আর বিরোধী দলে থাকলে জনগণের বন্ধু- এটাই হ'ল এদেশের রাজনৈতিক কালচার। এদেশের বিচার বিভাগ প্রশাসন বিভাগ থেকে স্বাধীন নয়। এরপরেও রয়েছে বিচারকার্যের দীর্ঘসূত্রিতা। কথায় বলে Justice delayed, Justice denied. 'বিলম্বিত বিচার এক প্রকার অবিচার'। ফলে সন্ত্রাসীরা লাই পেয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে।

অতঃপর নিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থা। সেটাও এদেশে নেই। কারণ এদেশে গণতন্ত্রের নামে চলছে দলতন্ত্র। যদিও সংবিধানে রয়েছে যে দলই ক্ষমতাসীন হৌক না কেন সরকার থাকবে নিরপেক্ষ। কিন্তু বাস্তবে সেটা নেই এবং তা সম্ভবও নয়। কেননা যিনি দলীয় প্রধান, তিনিই হবেন সরকার প্রধান। তাহ'লে কিভাবে তিনি নিরপেক্ষ হবেন? ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। দলীয় স্বৈরাচার,

দলীয় শাসন-শোষণ ও অত্যাচারে দেশবাসীর নাভিশ্বাস উঠছে। মানবতা নিভৃতে কাঁদছে। শহরে-নগরে, গ্রামে-গঞ্জে অসংখ্য এরশাদ শিকদার, কাঙালী যাকির ও লাল্টু বাহিনী সৃষ্টি হচ্ছে। রুবেল, জুয়েল, জালাল, আহাদ, ডাঃ হুমায়ুন নিঃশব্দে নীরবে হারিয়ে যাচ্ছে। আর তাদের বুকফাটা আর্তনাদ ও হৃদয় ছেঁড়া দীর্ঘশ্বাস বাংলার আকাশ-বাতাস ভারী করে তুলছে। জানিনা কখন আল্লাহ্‌র ফায়ছালা নেমে আসবে। জিহাদী হুংকার দিয়ে গর্জে উঠবে মানবতা। ভেঙ্গে চূর্ণ হয়ে যাবে বাতিলের তখত-তাঊস। স্বপ্নঘোর কেটে যাবে রঙিন সুরার নীল জৌলুসে হাবুডুবু খাওয়া রাঘব বোয়ালগুলোর।

এরি মধ্যে বছর ঘুরে এল রামাযান। আমরা তাকে স্বাগত জানাই। স্বাগত জানাই তার উদাত্ত আহ্বানকে- 'হে কল্যাণের অভিযাত্রী এগিয়ে চল! হে অকল্যাণের অভিসারী বিরত হও'।[৯৩] রামাযানের রাত্রিতে আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে এই অদৃশ্য আহ্বান ধ্বনি কি সন্ত্রাসীদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করবে? তাদের জানা উচিত অন্যায় ও সন্ত্রাসের পতন অবশ্যম্ভাবী এবং ন্যায় ও সত্যের জয় সুনিশ্চিত। সত্যসেবী ও ধৈর্যশীলদের সাথে আল্লাহ থাকেন। অতএব হে অকল্যাণের অভিসারীরা! রামাযানের এই পবিত্র মাসে এসো তওবা করি। নীরবে-নিভৃতে অনুতপ্ত হয়ে চোখের পানি ফেলে আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা করি ও তাঁর দিকেই ফিরে চলি। পশুত্বের পতন হৌক। মানবতা জয়লাভ করুক! আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন![৯৪]

৪৭. মুছল্লী না সন্ত্রাসী?

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী শুক্রবার বাদ জুম'আ খুলনা খালিশপুরে ইমাম পরিষদের ব্যানারে একদল লোক খালিশপুর ১২ নং সড়কের আহলেহাদীছ জামে মসজিদে হামলা করে মসজিদ ও ওযূখানা ভাংচুর করে এবং পার্শ্ববর্তী মাওলানা আব্দুর রঊফ ছাহেবের বাড়ী ও লাইব্রেরীতে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। পবিত্র কুরআনের তাফসীর ও হাদীছ সহ বহু ধর্মীয় গ্রন্থাবলী তারা তছনছ করে। কিছু কিতাব ছিঁড়ে ফেলে। কিছু পার্শ্ববর্তী পুকুরে নিক্ষেপ

৯৩. তিরমিযী হা/৬৮২; ইবনু মাজাহ হা/১৬৪২; মিশকাত হা/১৯৬০।
৯৪. ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৯।

Contents

করে ও কিছু তারা লুট করে নিয়ে যায় বলে জানা যায়। তার পূর্বে তারা জুম'আর ছালাতের পর বিভিন্ন মসজিদ থেকে এসে খালিশপুরে গোলচত্বরে জমায়েত হয় ও পার্শ্ববর্তী খালিশপুর শ্রমিক ময়দানে অনুষ্ঠিতব্য স্থানীয় আহলেহাদীছদের আয়োজিত একটি ওয়ায মাহফিলের মঞ্চ ও প্যাণ্ডেল ভেঙ্গে দেয়। পুলিশ হামলাকারীদের ২৬ জনকে গ্রেফতার করে এবং পরের দিন তাদেরকে ছেড়ে দেয়। মসজিদের সেক্রেটারীর পক্ষ থেকে ৪০ জনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গেছে। 'আল্লাহ কি নিরাকার ও সর্বত্র বিরাজমান'? নামক মাওলানা আব্দুর রঊফের লেখা ৩২ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকার বিরুদ্ধে স্থানীয় ইমাম পরিষদের ক্ষোভের প্রেক্ষিতে এই হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে। বইটি জানুয়ারী '৯৫-তে প্রথম ও নভেম্বর '৯৯-তে পুনরায় প্রকাশিত হয়। পুস্তিকাটি বাযেয়াফ্ত করার জন্য পুলিশ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকটে সুফারিশ করেছে বলে খবরে প্রকাশ। পুস্তিকাটির প্রকাশককে পরের দিন পুলিশ গ্রেফতার করেছে বলে জানা গেছে। অথচ দেশে হর-হামেশা ইসলাম বিরোধী ও বিভিন্ন নোংরা বই-পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। সেদিকে খেয়াল নেই।

আহলেহাদীছের বিরুদ্ধে খুলনা ইমাম পরিষদের এ হিংসাত্মক আচরণ আজকের নতুন নয়। বিগত ১৯৯৪ সালের ২২শে এপ্রিল তারিখে খুলনা ইমাম পরিষদের নেতাদের প্ররোচনায় কিছু মাদরাসা ছাত্র খুলনা পৌরসভা মিলনায়তনে আয়োজিত 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র ইসলামী সম্মেলনে হামলা করে। পরে শ্রোতা ও পুলিশের পিটুনী খেয়ে থানায় গিয়ে সম্মেলনের পোস্টারে ঘোষিত উপস্থিত-অনুপস্থিত বক্তা ও নেতৃবৃন্দের নামে ঢালাওভাবে বিভিন্ন ধারায় মিথ্যা মামলা দায়ের করে। বিচারে বাদীপক্ষের সকল অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয় এবং ২৪.১১.৯৪ইং তারিখে মামলা খারিজ হয়ে যায়। সেদিনও জালসার শুরুতে তারা হামলা করেছিল। এবারও জালসা শুরুর আগেই ফাঁকা প্যাণ্ডেলে ও ফাঁকা মসজিদে তারা হামলা করেছে। একই ইমাম পরিষদ বর্তমান ঘটনার নায়ক। মাওলানা আব্দুর রঊফ ফরিদপুরের গওহরডাঙ্গা মাদরাসার স্বনামধন্য মুহতামিম মরহূম মাওলানা আব্দুল আযীয ছাহেবের পুত্র। স্বীয় বুযর্গ পিতার জীবদ্দশায় তিনি জেনে-বুঝে আহলেহাদীছ

হন এবং তাঁর প্রচারে খালিশপুর ও অন্যান্য স্থানের বহু লোক আহলেহাদীছ হয়েছেন। 'খুলনা ইমাম পরিষদ' নামীয় সংগঠনের আলেমরা তাঁর বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই ক্ষুব্ধ। কারণ ধর্মীয় দলীল-প্রমাণে তারা কখনোই মাওলানা আব্দুর রঊফের মোকাবিলায় টিকতে পারেননি। ফলে স্থানীয় ভক্তদের কাছে এটা তাদের এখন 'প্রেস্টিজ ইস্যু' হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইমাম পরিষদের সম্মানিত আলেমদেরকে বাগদাদ ধ্বংসের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। সেদিন শাফেঈদের বিরুদ্ধে হানাফীরা হালাকু খাঁকে ডেকে এনেছিল। ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারীতে হামলার শুরু থেকে ৪০ দিন পর্যন্ত ব্যাপক হত্যাকাণ্ডে বাগদাদ ও তার আশপাশের শহরে আট হ'তে চল্লিশ লক্ষ মুসলমান নিহত হয়েছিল। কয়েকশত বছর ধরে সঞ্চিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অমূল্য ভাণ্ডার এক সপ্তাহের মধ্যেই তারা দজলার বুকে ডুবিয়ে বিনষ্ট করে দিয়েছিল। ফলে ইসলামের রাজনৈতিক ঐক্য চিরতরে শেষ হয়ে যায়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলমানদের অগ্রযাত্রা বন্ধ হয়ে যায়। আজও কি আমরা সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চাচ্ছি?

আমরা মনে করি একটি স্বাধীন দেশে মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে। কারু যদি কারু মত পসন্দ না হয়, তাহ'লে তিনি তার পাল্টা মত প্রকাশ করবেন স্বাধীনভাবে। অথবা তার বিরুদ্ধে আপীল করার জন্য দেশের আদালতে যাবেন। সেখানে আইনের ফায়ছালা আসবে। কিন্তু সেপথে না গিয়ে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া ও অন্যের প্রতি ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা, দৈহিকভাবে হামলা ও নির্যাতন করা, তাদের জনসভা পণ্ড করা, সর্বোপরি ইবাদতের স্থান মসজিদ ভাংচুর এবং কুরআন-হাদীছ ও ধর্মীয় কিতাবপত্র তছনছ ও লুট করা নিঃসন্দেহে জঘন্যতম অপরাধ ও মৌলিক মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লংঘন। দেশের সংবিধানের রক্ষাকারী হিসাবে পুলিশ ও আদালত জননিরাপত্তার এ বিষয়গুলি নিশ্চিত করতে না পারলে এদেশ কারু জন্য নিরাপদ এমনকি বাসযোগ্য থাকবে কি-না সন্দেহ। আমরা এই সন্ত্রাসী ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং দোষী ব্যক্তিদের আইনানুগ শাস্তির দাবী জানাচ্ছি। দুর্ভাগ্য, বিভিন্ন পত্রিকায় হামলাকারীদেরকে 'মুছল্লী' হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। জানিনা মসজিদে হামলাকারীরা কিভাবে মুছল্লী হয়। বইটি আমরা

পড়েছি। বইটিতে নিঃসন্দেহে 'হক' প্রকাশিত হয়েছে এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সুস্পষ্ট দলীল সমূহ দিয়েই বইটি লিখিত হয়েছে। বইটিতে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) সহ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সম্মিলিত আক্বীদা প্রতিফলিত হয়েছে। জানিনা পুলিশ কেন বইটি বাযেয়াফ্ত করার জন্য আগবেড়ে সুফারিশ করতে গেল।

এই সুযোগে এক শ্রেণীর পত্রিকা মাঠে নেমেছে। তারা এই সন্ত্রাসী হামলাকে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা এবং ইসলামী আন্দোলনকে 'বিষ নিয়ে নাড়াচাড়া' করার সঙ্গে তুলনা করে পরোক্ষভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে একচোট নিয়েছেন। সন্ত্রাসী হামলাকারীদের 'ধর্মপ্রাণ' বলে সাফাই গেয়ে তারা নিজেদের মাযহাবী গোঁড়ামি ও আহলেহাদীছ বিদ্বেষকে খোলামেলা করে দিয়েছেন। মূলতঃ এরাও অসাম্প্রদায়িকতার নামে নোংরা সাম্প্রদায়িক। তারা হানাফী ও আহলেহাদীছকে এক কাতারে শামিল করেছেন। তারা জানেন না যে, আহলেহাদীছ প্রচলিত অর্থে কোন ব্যক্তি পূজারী মাযহাবের নাম নয়। এটি একটি আন্দোলন। এ আন্দোলন ধর্মের নামে বিভিন্ন মাযহাব, তরীকা ও পীর-মুরীদীর ভাগাভাগিতে যেমন বিশ্বাসী নয়, তেমনি রাজনীতির নামে জনগণকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াইয়েরও ঘোর বিরোধী। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' মুসলিম উম্মাহকে সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে একক ও ঐক্যবদ্ধ উম্মাহ হিসাবে গড়ে তুলতে চায়। এ আন্দোলন তাই যাবতীয় গোঁড়ামি ও দলাদলির বিরুদ্ধে সর্বদা জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করে থাকে। সাংবাদিক বন্ধুদেরকে এ আন্দোলন সম্পর্কে আরও পড়াশোনার আবেদন জানাই। মাওলানা আব্দুর রঊফের কোন কোন বক্তব্যের সাথে আমরা একমত নই। কিন্তু আমরা চাই হিংসা ও গোঁড়ামির অবসান হৌক! উদারতা ও মানবতা জয়লাভ করুক! আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন![৯৫]

৯৫. ৩য় বর্ষ, ৪র্থ ও ৫ম যুগ্ম সংখ্যা, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০০০।

৪৮. উত্তরাঞ্চলকে বাঁচান!

ফারাক্কা বাঁধ থেকে ছাড়া পানি হু হু করে ধেয়ে আসছে রাজশাহীর দিকে। সে চায় শিক্ষানগরী রাজশাহীকে গ্রাস করতে। শহর রক্ষা বাঁধ তার প্রধান শত্রু। একে সে খাবেই। এবার যেন সে মরিয়া হয়ে উঠেছে। উত্তরাঞ্চলের এই বিভাগীয় শহরকে তলিয়ে দিতে পারলে পুরা উত্তরাঞ্চলকে সে ডুবিয়ে দিতে পারবে নিমেষে। সাড়ে ৪ কোটি মানুষ আজ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছে নিজেদের এই ধ্বংস দৃশ্য।

কই আগে তো কখনো এরূপ ছিল না। প্রমত্তা পদ্মা যার নাম। তার বুকে আজ গভীরতা নেই কেন? কেন সে আজ পানি বিহনে কাতরাচ্ছে। ব্লাড প্রেসারের রোগীর মত অল্পতেই সে ফুঁসে উঠছে কেন? কে তার স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও গতিপ্রবাহ বিনষ্ট করল? আসুন একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি পার্শ্ববর্তী বন্ধু দেশটির দিকে। কেননা তাদেরই সৃষ্ট এই মরণ বাঁধ ফারাক্কা। এই ফারাক্কাই আজ আমাদের ও আমাদের প্রাণপ্রিয় পদ্মার মধ্যে ফারাক সৃষ্টি করেছে। পদ্মাকে আমাদের শত্রু বানিয়েছে।

ফারাক্কা বাংলাদেশের রাজশাহী-চাঁপাই নবাবগঞ্জ সীমান্ত থেকে মাত্র ১১ মাইল ভিতরে গঙ্গা নদীর উপরে ভারতের দেওয়া বাঁধের নাম। যা কেবল বাংলাদেশের জনগণের জন্য নয়, খোদ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের জন্যেও গলার ফাঁসে পরিণত হয়েছে। কারণ গঙ্গার স্বাভাবিক প্রবাহে বাধা দেওয়ার ফলে তার বুকে পলি জমে জমে ক্রমশঃ নদী ভরাট হয়ে যাচ্ছে। তার পানি ধারণ ক্ষমতা প্রতি বছর কমে যাচ্ছে। ফলে উজানের ধেয়ে আসা প্রবল পানিস্রোত আর স্বাভাবিক বর্ষার পানি একত্রিত হয়ে তার বুক ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর সেই সাথে ভেসে যাচ্ছে তার তীরবর্তী মুর্শিদাবাদ, নদীয়া প্রভৃতি যেলার লাখ লাখ বনু আদমের স্বপ্নসাধ। ধ্বংস হচ্ছে তাদের ফসল ও বাড়ী-ঘর। বাপ-দাদার ভিটে-মাটি ছাড়া হয়ে তারা এখন উদ্বাস্তু হিসাবে আশ্রয় নিচ্ছে পার্শ্ববর্তী যেলাগুলিতে। ফলে তাদের মন রক্ষার জন্য সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে ফারাক্কার বাঁধ খুলে দেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশের দিকে। আর কোটি কোটি গ্যালন পানি ভীষণ ক্রোধে ঝাঁপিয়ে এসে আছড়ে পড়ছে রাজশাহীর মরা পদ্মার বুকে। এভাবে বর্ষাকালে পানি ছেড়ে ও শুকনা মওসুমে পানি আটকিয়ে বাংলাদেশকে

ডুবিয়ে ও শুকিয়ে মারার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করেছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ এই দেশটি।

কলিকাতা বন্দরের নাব্যতা রক্ষার অজুহাতে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের প্রবল বাধা উপেক্ষা করে ১৯৭০ সালে ভারত এই বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন করে। কিন্তু তা চালু করতে সাহস করেনি। ইতিমধ্যে এসে যায় '৭১-এর যুদ্ধ। ভারত সুকৌশলে যুদ্ধের জয়মাল্য নিজের ঘরে তুলে নেয়। পাকিস্তান আর্মীর রেখে যাওয়া বিপুল অস্ত্রশস্ত্র এবং এদেশের মিল-কলকারখানা সমূহের মেশিন-পত্র ও যন্ত্রপাতি সব সে নিজ দেশে লুটে নিয়ে যায়। বাধা দিতে গিয়ে ৯ম সেক্টর কমাণ্ডার মেজর আব্দুল জলীলকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। ফলে তিনিই হন স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম রাজবন্দী। অতঃপর বাংলাদেশ নামক একটি ফোকলা ও খুঁড়িয়ে চলা সদ্য স্বাধীন দেশের দুর্বলতাকে ভারত পুরোপুরি নিজ স্বার্থে কাজে লাগায়। ফলে তৎকালীন সরকারের কৃতজ্ঞতাসুলভ আচরণের সুযোগে সে অতি সহজেই ১৯৭৫ সালের ২১শে এপ্রিল থেকে চালু করে এই মরণ বাঁধ ফারাক্কা। এর বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে উত্তরাঞ্চলের মানুষ। মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ঐতিহাসিক 'ফারাক্কা মিছিল' হয় রাজশাহী থেকে চাঁপাই নবাবগঞ্জের কানসাট পর্যন্ত। কিন্তু কে শুনবে দুর্বলের এ আর্ত চীৎকার? মানুষের চোখ-কান-বিবেক যখন অন্ধ হয়ে যায়, তখন সে হয় পশুর চেয়েও অধম। তাই যাদের জন্য এই মিছিল, এই চীৎকার ধ্বনি, এই বক্তব্য, এই লেখনী, তারা তো স্বার্থ উদ্ধার করে নীরবে হাসছে ক্রূর হাসি। আর এদিকে আমাদের চুক্তিবাদী নেতা-নেত্রীরা খুশীমনে গলাবাজি করছেন। আর জনগণকে নিজেদের সাফল্যের ফিরিস্তি শুনাচ্ছেন দিনরাত।

বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৭ সালের নভেম্বর মাসে ভারতের সাথে যে চুক্তি করে, তাতে বলা ছিল যে, (১) ফারাক্কা পয়েন্টে শুকনা মওসুমে বাংলাদেশ শতকরা ৬০ ভাগ পানি পাবে। বলা ছিল (২) ২১শে এপ্রিল থেকে শুকনা মওসুমে প্রতি দশ দিনের সার্কেলে বাংলাদেশ পাবে ৩৪ হাযার ৫শ' কিউসেক পানি এবং ভারত পাবে ২০ হাযার ৫শ' কিউসেক পানি। আরও বলা ছিল যে, (৩) বাংলাদেশ তার নির্ধারিত হিস্যার শতকরা ৮০ ভাগের নীচে কখনোই পাবে না। এটাকেই বলা হয় 'গ্যারান্টি ক্লজ' বা পানির নিশ্চয়তা বোধক ধারা। এটা

ছিল ভারতের সঙ্গে পানি কূটনীতিতে বাংলাদেশের একটি বিরাট সাফল্য। কিন্তু ১৯৮৬ সালের পর থেকে দু'দেশের মধ্যে আর কোন পানি চুক্তি নেই। এখন চলছে ভারতের একচেটিয়া পানি সন্ত্রাস। সে ইচ্ছামত পানি ছাড়ছে আর বন্ধ করছে। শুধু গঙ্গা নয়, তিস্তা, সুরমা, বরাক সহ ৫৪টি নদীর উজানে বাঁধ দিয়ে সে আমাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে।

ভূগর্ভে পানির স্বাভাবিক স্তর নেমে গিয়েছে। সেখানে আর্সেনিক দূষণ শুরু হয়েছে। ফলে পানযোগ্য সুপেয় পানি থেকেও আমরা বঞ্চিত হ'তে চলেছি। ফোরাতের তীরে তৃষ্ণার্ত হুসায়েন পরিবারের ন্যায় পানি বিহনে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে আজ হাহাকার উঠছে। এটাই হ'ল আজ বাংলাদেশের নিষ্ঠুর বাস্তবতা। ইতিমধ্যে ভারত পেয়ে গেল তার পসন্দমত আরেকটি সরকার। ফলে পুনরায় সুযোগ নিল সে। ৩০ বছরের 'পানি গোলামী' চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়ে নিল সে অতি সহজে ১৯৯৬ সালের ১২ই ডিসেম্বরে। ফল্লো হার্ডিঞ্জ ব্রীজের নীচে পানিহীন শুকনা পিলারে তাই লেখা দেখি '... অবদান, পানি সমস্যার সমাধান'। রোগীকে মেরে ফেলাই যদি রোগের সমাধান হয়, তবে পদ্মাকে মেরে ফেলে আমাদের নেতা-নেত্রীরা নিঃসন্দেহে সেই সমাধান করেছেন বলা চলে।

বর্তমান চুক্তিতে আর আগের সেই গ্যারান্টি ক্লজ নেই, নেই আন্তর্জাতিক ফোরামে বা আদালতে বাংলাদেশের অভিযোগ পেশ করার ক্ষমতা। কেননা সেখানে রয়েছে দ্বিপাক্ষিকভাবেই সবকিছু মিটানোর কথা। যা দুর্বল ও সবলের মধ্যে কোনকালেই সম্ভব নয়। কিন্তু না। পদ্মা মরবে না। তাকে মরতে দেওয়া যাবে না। কেননা তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে উত্তরাঞ্চলের সাড়ে চার কোটি মানুষের জীবন ও স্বপ্ন। তাই পদ্মাকে যারা মেরেছে, সেই হত্যাকারী আসামীদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ফোরাম ও আদালতে ঐসব পানি সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হবে। ওদেরকে বিশ্ব সমাজে চিহ্নিত করতে হবে। সেই সাথে ব্যাপক সামাজিক চেতনা সৃষ্টি করতে হবে এবং আল্লাহ্র নিকটে গায়েবী মদদ চাইতে হবে। তিনি যেন কোটি কোটি মানুষের জীবন রক্ষাকারী পানি সমস্যার সমাধানের পথ সুগম করে দেন- আমীন![৯৬]

---

৯৬. ৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, জুলাই ২০০০।

৪৯. ডেঙ্গুজ্বর : আসুন! অন্যায় থেকে তওবা করি ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেই

মানুষের পাপ যত বৃদ্ধি পাবে, ততই নতুন নতুন গযব নাযিল হবে। পাপের প্রকৃতির যেমন পরিবর্তন হচ্ছে, গযবের প্রকৃতিও তেমনি পরিবর্তিত হচ্ছে। এক সময় ম্যালেরিয়া জ্বর, কালাজ্বর এদেশের আতংক ছিল। ওলাউঠা, গুটি বসন্ত, টিবি ইত্যাদির পরে আসলো ‘ক্যান্সার’। তারপর বর্তমান শতাব্দীর বিশ্বকাঁপানো মরণব্যাধি এইডস-এর আক্রমণ শুরু হ’ল। এখন আবার আসলো ডেঙ্গু জ্বর। গযবের পর গযব। এসবই আসে পরিকল্পিতভাবে বিশ্বপালক আল্লাহ্‌র নির্দেশে *(হাদীদ ৫৭/২২-২৩)* তাঁর অবাধ্য বান্দাদেরকে বাধ্য করার জন্য ও তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কথা, মৃত্যুর কথা ও জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাবের কথা স্মরণ করিয়ে সাবধান করার জন্য *(তওবা ৯/৭৪)*। সমাজের বিশেষ করে উঁচু স্তরের নেতৃবৃন্দ যখন দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং যখন তাদের ফিসক্ব ও ফুজূরী তথা পাপাচার সীমা ছাড়িয়ে যাবার উপক্রম হয়, তখনই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ ধরনের গযব চলে আসে *(ইসরা ১৭/১৬)* বিশ্ব পরিচালনায় স্থিতি আনার জন্য *(রূম ৩০/৪১)*। এটাই আল্লাহ্‌র চিরস্থায়ী রীতি যার কোন পরিবর্তন নেই *(ফাত্বির ৩৫/৪২-৪৫)*। এই রীতির আলোকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের গযব আসে। কখনও আসে সামাজিক ফিৎনা ও অশান্তির আকারে, কখনো আসে প্রাকৃতিক গযব আকারে *(নূর ২৪/৬৩)*। বিগত উম্মতগুলির মিথ্যাবাদিতা ও অবাধ্যতার কারণে তাদের উপর একই নিয়মে গযব এসেছে ও তারা ধ্বংস হয়েছে *(মুমিন ৪০/৮৫)*। নূহ (আঃ)-এর কওমের উপরে মহাপ্লাবণের শাস্তি, হূদ (আঃ)-এর কওমের উপরে ৮ দিনের প্রবল ঝড়ে নিশ্চিহ্ন করার শাস্তি, লূত্ব (আঃ)-এর কওমের উপরে জনপদ উল্টে দিয়ে ধ্বংস করার শাস্তি, অহংকারী নমরূদকে মশার আক্রমণে ধ্বংস করার শাস্তি, ক্ষমতাগর্বী ফেরাউনকে সদলবলে নদীতে ডুবিয়ে মারার শাস্তি, উচ্চাভিলাষী আবরাহা বাহিনীকে পাখির ঠোঁট দিয়ে নিক্ষিপ্ত কংকর দ্বারা নিশ্চিহ্ন করার শাস্তি প্রভৃতি আমাদের উপদেশ হাছিলের জন্য এখন ইতিহাসের অমর সাক্ষ্য হিসাবে মওজূদ আছে *(আন‘আম ৬/৪২, নাহল ১৬/৩৬, যুখরুফ ৪৩/২৫)*।

১৭৭৯ সালে মিসর ও জাভা (ইন্দোনেশিয়া)-তে প্রথম ডেঙ্গুজ্বরের মহামারী ঘটে। তবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ডেঙ্গু মহামারী আকারে

প্রথম দেখা দেয় ১৭৮০ সালে আমেরিকার ফিলাডেলফিয়াতে। অতঃপর ঊনিশ শতকে ও বিশ শতকের প্রথম দিকে ডেঙ্গুজ্বরের মহামারী ঘটে আমেরিকা, দক্ষিণ ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়াতে। ভারত মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর ও ক্যারিবিয়ান সাগরের কিছু কিছু দ্বীপেও ডেঙ্গুর সন্ধান মেলে। তবে এইসব ডেঙ্গু প্রাণঘাতী ছিল না। পরবর্তীতে হেমোরেজিক বা রক্তক্ষরণজনিত প্রাণঘাতী ডেঙ্গুজ্বর (DHF) মহামারী আকারে প্রথম ঘটে ১৯২২ সালে আমেরিকার টেক্সাস ও লুসিয়ানা নগরীতে। ১৯৫৬ সালে ফিলিপাইনের শিশুদের মারাত্মক আকারে হেমোরেজিক ডেঙ্গু দেখা দেয়। ১৯৮১ সালে কিউবাতে এবং ১৯৮৯ সালে ভেনেজুয়েলাতে এই জ্বর মহামারী আকারে দেখা দেয়। তবে ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফেভার সবচেয়ে বেশী হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' (WHO)-এর হিসাব মতে ১৯৮১ থেকে '৮৬ পর্যন্ত এই রোগে এই অঞ্চলে আক্রান্ত হয়েছে ৭ লাখ ৯৬ হাযার ৩৮৬ জন এবং মারা গেছে ৯ হাযার ৭৭৪ জন। ১৯৯৭ সালে নয়াদিল্লীতে ডেঙ্গুজ্বর ভয়াবহরূপে দেখা দেয়। যাতে ৩০ হাযার লোক আক্রান্ত হয় এবং সহস্রাধিক লোক মারা যায়।

১৯৬৪ সালে ঢাকায় প্রথম ডেঙ্গুজ্বর দেখা দেয়। অতঃপর ১৯৭৭-৭৮ সালে পুনরায় দেখা দেয়। তবে এগুলি ছিল সামান্য আকারে। তখন একে 'ঢাকা ফেভার' বলা হ'ত। অতঃপর ১৯৯৭ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে যখন ঢাকায় হঠাৎ করে ডেঙ্গুজ্বরে দুই তরুণ মারা গেল, তখন সরকারের টনক নড়ল। ঢাকা মহানগরীকে ২৩টি জোনে ভাগ করে ২১টিতেই ডেঙ্গু স্ত্রী জাতীয় এডিস মশার উপস্থিতি পাওয়া গেল। এরপরে ১৯৯৮ সালের জুলাই-আগস্টে ভয়াবহ বন্যার পরপরই 'বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা'র পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকারকে ডেঙ্গুজ্বর সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হ'ল। অতঃপর ২০০০ সালের জুন মাস থেকে ডেঙ্গু এখন মহামারী আকারে ঢাকা মহানগরীকে গ্রাস করেছে। সেই সাথে সারা দেশে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ছে। ২রা আগস্ট পর্যন্ত ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আক্রান্ত হয়েছে পাঁচ শতাধিক। দৈনিক এ সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

এ গযব আল্লাহ্র হুকুমে এসেছে আমাদের হুঁশিয়ার করার জন্য। এক্ষণে যদি আমরা হুঁশিয়ার হই ও অবিরত ধারায় কৃত পাপসমূহ থেকে তওবা করি,

অনুতপ্ত হই ও আমাদের কর্ম সংশোধন করি, তাহ'লে ইনশাআল্লাহ তিনি এ গযব সত্বর উঠিয়ে নেবেন *(আন'আম ৬/৫৪)*। আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হওয়া ঠিক নয় *(যুমার ৩৯/৫৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, আল্লাহ এমন কোন রোগ নাযিল করেন না, যার ঔষধ নাযিল করেন না'।[৯৭] অতএব এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, ডেঙ্গুজ্বরের ঔষধ আল্লাহ অবশ্যই নাযিল করেছেন। আমাদের তা খুঁজে বের করতে হবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের একাজে গভীর গবেষণায় লিপ্ত হ'তে হবে। ইতিমধ্যে থাইল্যাণ্ডে ডেঙ্গু ভ্যাক্সিন আবিষ্কার হয়েছে। যা দু'বছরের মধ্যে বাজারজাত হবে বলে শোনা যাচ্ছে। হোমিওপ্যাথিতে এর অব্যর্থ মহৌষধ আছে বলে দাবী করা হচ্ছে। অতএব এর প্রতিষেধক আবিষ্কারের প্রচেষ্টা চালানোর সাথে সাথে মশক নিধন ও মশকের বংশ বিস্তার রোধের ব্যবস্থা নিতে হবে।

পরিশেষে আসুন! আত্মসমালোচনা করি। আত্মসংশোধনের সাথে সাথে সমাজ সংশোধনে ব্রতী হই। আল্লাহ্র দেওয়া প্রশাসনিক ক্ষমতাকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করি। প্রাণঘাতী ডেঙ্গুজ্বরের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য সরকারী-বেসরকারী সকল প্রকারের চেষ্টা সমন্বিত করি এবং এই গযব উঠিয়ে নেওয়ার জন্য আল্লাহ্র নিকটে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি। আল্লাহ তুমি তোমার অসহায় বান্দাদের গুনাহ-খাতা মাফ কর এবং আমাদের তওবা কবুল কর। হে আল্লাহ তোমার দুর্বল বান্দাদের উপর থেকে এই কঠিন গযব উঠিয়ে নাও- আমীন! ইয়া রব্বাল 'আ-লামীন![৯৮]

৫০. অপারেশন ক্লীনহার্ট ও রামাযান

পবিত্র রামাযান আসার অনধিক তিন সপ্তাহ পূর্বেই দেশে শুরু হয়েছে 'অপারেশন ক্লীনহার্ট' (Operation Clean Heart) নামক এক অভিনব শুদ্ধি অভিযান। এ শুদ্ধি অভিযানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মূলতঃ সেনাবাহিনীর উপরে। উদ্দেশ্য সন্ত্রাস দমন। বর্তমান জোট সরকার আসার এক বছর পূর্তির ৬ দিন পরে গত ১৬ই অক্টোবর বুধবার দিবাগত রাত ১২-টার পর হঠাৎ করে আর্মী ক্র্যাকডাউন শুরু হয়। রাজধানী ঢাকা এবং ৬টি বিভাগীয় শহরসহ যেলা শহরগুলিতে একই সাথে ৪০ হাযার আর্মীকে

৯৭. বুখারী হা/৫৬৭৮; মিশকাত হা/৪৫১৪।
৯৮. ৩য় বর্ষ, ১১তম সংখ্যা, আগস্ট ২০০০।

অ্যাকশনে নামানো হয়। দেশব্যাপী বিস্তৃত ৪টি মোবাইল ফোন কোম্পানীর সাড়ে ৮ লাখ মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক রাত ১২-টা হ'তে সকাল ৬-টা পর্যন্ত ৬ ঘণ্টা বন্ধ রাখা হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'বেসামরিক প্রশাসনের ব্যর্থতার জন্য নয়, বরং অধিকতর সাফল্যের জন্য সম্পূরক হিসাবে কাজ করতেই সেনা ও নৌবাহিনী নিয়োগ করা হয়েছে'। আমরা সরকারের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানাই ও এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

'অপারেশন ক্লীন হার্ট' অর্থ অনেকে করেছেন 'হৃদয় শুদ্ধি অভিযান'। আমরা মনে করি এর অর্থ হওয়া উচিত 'শুদ্ধ হৃদয় অভিযান'। কেননা দেশের সেনাবাহিনী নির্দলীয় হিসাবে শুদ্ধ হৃদয়। তারা দলীয় সংকীর্ণতা দুষ্ট না হয়ে বরং শুদ্ধ হৃদয়ে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে নিরপেক্ষভাবে শুদ্ধি অভিযান চালাতে সক্ষম হবেন। পত্রিকান্তরে প্রকাশ যে, প্রধানমন্ত্রী কয়েকদিন পরে অভিযান শুরু করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিএনপি-র উপরতলার কিছু লোক বিষয়টি ফাঁস করে দিলে প্রধানমন্ত্রী দারুণভাবে ক্ষুব্ধ হন এবং সেদিনই সন্ধ্যায় মন্ত্রী পরিষদের যরূরী সভা ডেকে আলোচনা করে রাত ১২-টা থেকেই অভিযান শুরুর নির্দেশ দেন। প্রধানমন্ত্রী ভেবেছিলেন এর ফলে চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা সবাই ধরা পড়বে। কিন্তু তা হয়নি। তারা সময়মতই সংবাদ পেয়ে অপারেশন শুরুর দু'দিন আগেই কেবলমাত্র কুষ্টিয়া সীমান্ত দিয়েই নাকি সাড়ে তিন হাযারের মত সন্ত্রাসী সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে তাদের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেছে বলে খবরে প্রকাশ। দেশের অন্যান্য সীমান্ত পথে কত হাযার সন্ত্রাসী পালিয়েছে তার হিসাব কে বলবে? ফলে এখন যারা ধরা পড়ছে তারা কেউ শীর্ষ সন্ত্রাসী নয় বরং তাদের সহযোগী দ্বিতীয় বা তৃতীয় সারির সন্ত্রাসী অথবা সাধারণ নেশাখোর-মাতাল বা ছিঁচকে নিশিকুটুম্ব।

পত্রিকান্তরে প্রকাশ, সরকার ঘোষিত ২৩ শীর্ষ সন্ত্রাসীর অধিকাংশসহ বাংলাদেশের শীর্ষ সন্ত্রাসীদের প্রায় ৯০% নিশ্চিন্তে বসবাস করছে ভারতের বিভিন্ন শহরে ও বিশেষ করে পশ্চিম বঙ্গের রাজধানী কলিকাতায়। সেখানকার যাকারিয়া স্ট্রীটের বিলাসবহুল হোটেলগুলিতেই তাদের অধিকাংশের আস্তানা। এমনকি অনেক 'টপটেরর' কলিকাতার অভিজাত এলাকা সল্ট লেকেও বাড়ী ভাড়া নিয়ে বা এপার্টমেন্ট কিনে বসবাস করছে। তাদের বাংলাদেশী দোসররা হর-হামেশাই সেখানে যাতায়াত করে। এমনকি ঐসব শীর্ষ সন্ত্রাসীদের প্রায় সকলে ভারতীয় মোবাইল কোম্পানীর মোবাইল সংযোগ নিয়েছে এবং এর

মাধ্যমে তারা সহজেই বাংলাদেশী সোর্স ও সাঙ্গপাঙ্গদের সাথে যোগাযোগ রাখছে। বাংলাদেশ সীমান্তের নিকটবর্তী ভারতীয় গ্রাম ও শহরগুলিতে অবস্থান করে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে অতি সহজে তারা তাদের সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক অব্যাহত রেখেছে এবং বর্তমান সেনা তৎপরতার সব খবরাখবর জেনে নিয়ে নিত্য নতুন পলিসি নির্ধারণ করছে। যেখানে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ হর-হামেশা বাংলাদেশ থেকে কথিত হরকাতুল জিহাদ ও তালেবান অনুপ্রবেশের ধুয়া তুলে আসছেন, যেখানে বৈধ পাসপোর্ট ও ভিসা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশী পর্যটকদের ভারতের রাস্তা-ঘাট ও হোটেলগুলিতে সর্বদা তত্ত্ব-তালাশ, চাঁদাবাজি ও বিভিন্নভাবে হয়রানি করা হচ্ছে, সেখানে কোনরূপ বৈধতা ছাড়াই মাসের পর মাস এমনকি বছরের পর বছর সেদেশে বসবাস করছে এইসব চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা। অথচ এ নিয়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কোন মাথাব্যথা নেই। নিঃসন্দেহে তাদের এই আচরণ রহস্যজনক। বাংলাদেশ সরকারের উচিত এ বিষয়ে অনতিবিলম্বে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসা এবং সেখানে গিয়ে যেন সন্ত্রাসীরা আশ্রয় না পায় তার যরূরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা। নইলে সরকারের শুভ পদক্ষেপ মাঠে মারা যাবে। বর্তমানের সেনা-পুলিশ যৌথ অভিযান শেষে পুনরায় পূর্ণোদ্যমে শুরু হবে সন্ত্রাস এবং সৃষ্টি হবে নতুন নতুন সহযোগী সন্ত্রাসী ক্যাডার বাহিনী।

এ যাবত সন্ত্রাসী যারা ধরা পড়েছে বা গা ঢাকা গিয়েছে তাদের প্রায় সবাই সরকারী বা বিরোধী রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় লালিত-পালিত। সেকারণ ইতিমধ্যেই অনেক শুভাকাংখী আশংকা ব্যক্ত করেছেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই শুভ উদ্যোগ যেকোন সময় বানচাল করে দিতে পারে দলের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা তার বন্ধুরূপী শত্রুরাই। ‘ব্যক্তির চেয়ে দল বড়, দলের চেয়ে দেশ বড়’ প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণা যদি সঠিক হয় তবে বলব, দেশের স্বার্থে পরিচালিত এই কঠোর অভিযান যেন দলের লোকদের মহব্বতে মাঝপথে বন্ধ না হয়ে যায়। যেভাবে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর শাসনকালে এক সময় অতিষ্ঠ হয়ে সেনাবাহিনী নামিয়েছিলেন। কিন্তু যখনই আওয়ামী সন্ত্রাসীরা একের পর এক পাকড়াও হ’তে থাকলো, তখনই তিনি দ্রুত সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে নেন। বলা চলে যে, এই আধাখেঁচড়া সেনা অভিযানে সাপের লেজে পা দিয়ে ছেড়ে দেওয়ার ফলেই তাঁর পতন ত্বরান্বিত হয়। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী পিছনের এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিলে ভাল হবে বলে মনে করি।

এ বিষয়ে আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ন্যায়বিচারের একটি দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। 'কুরায়েশ বংশের অন্যতম সম্ভ্রান্ত শাখা বনু মাখযূম গোত্রের ফাতেমা বিনতে আসওয়াদ নাম্নী জনৈকা মহিলা যখন চুরির দায়ে দোষী সাব্যস্ত হ'ল, তখন উক্ত গোত্রের নেতারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে তার শাস্তি মওকূফের সুফারিশ করার জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর সন্তানবৎ প্রিয় তরুণ উসামা বিন যায়েদকে প্রেরণ করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উসামাকে বললেন, তুমি কি আমাকে আল্লাহ প্রদত্ত দণ্ডবিধির বিষয়ে সুফারিশ করছ? অতঃপর তিনি সকলকে মসজিদে ডেকে নিয়ে ভাষণের এক পর্যায়ে বললেন, তোমাদের পূর্বেকার উম্মত এজন্য ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যকার সম্ভ্রান্ত লোকেরা চুরি করলে তাকে তারা ছেড়ে দিত। আর দুর্বল শ্রেণীর লোকেরা চুরি করলে তাকে শাস্তি দিত। আল্লাহ্র কসম! যদি মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতেমা আজকে চুরি করত, তাহ'লে অবশ্যই আমি তার হাত কেটে ফেলতাম'।[৯৯] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা আল্লাহ্র দেওয়া দণ্ডবিধিসমূহ কার্যকর কর। চাই সে ব্যক্তি নিকটের হৌক বা দূরের হৌক। এ ব্যাপারে তোমরা কোন নিন্দুকের নিন্দাবাদকে ভয় করো না'।[১০০] মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কি পারবেন রাজনীতির সঙ্গে অপরাধ জগতের নাড়ীর যোগ ছিন্ন করতে? আমরা দো'আ করি যেকোন মূল্যে সন্ত্রাস নির্মূলের ওয়াদার উপরে টিকে থাকার জন্য আল্লাহ পাক আমাদের সরকারকে তাওফীক দিন- আমীন!

আমরা মনে করি কেবল সেনা অভিযান যথেষ্ট নয়, বরং সন্ত্রাস ও দুর্নীতি হ্রাস করার জন্য একটি প্যাকেজ প্রোগ্রাম যরূরী। যেসকল উৎস থেকে দুর্নীতি হয়, সে সকল উৎসে শুদ্ধি অভিযান চালাতে হবে। নইলে বাঁধের একটি ছিদ্রপথ বন্ধ করলে অন্য ছিদ্রপথ দিয়ে তীব্র বেগে দুর্নীতির নোংরা স্রোতে নালা বন্ধ হয়ে যাবে। মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীকে বলব, (১) দল ও প্রশাসনের সকল স্তর থেকে দুর্নীতিবাজদের বহিষ্কার করুন ও তাদের আয়ের সাথে সঙ্গতিহীন যাবতীয় সম্পদ বাযেয়াফত করে সরকারী কোষাগারে জমা করুন (২) ইসলামী ফৌজদারী আইন সর্বত্র কঠোরভাবে বলবৎ করুন এবং শুধু ৬টি ক্ষেত্রে নয়, ক্রমে সকল ক্ষেত্রে দ্রুত বিচার আইন কার্যকর করুন। সাথে সাথে

৯৯. বুখারী হা/৩৪৭৫; মুসলিম হা/১৬৮৮; মিশকাত হা/৩৬১০।
১০০. ইবনু মাজাহ হা/২৫৪০, সনদ হাসান; মিশকাত হা/৩৫৮৭।

নির্দলীয় তাক্বওয়াশীল ও যোগ্য লোকদেরকে বাছাই করে প্রশাসনের বিভিন্ন পদে আসীন করুন (৩) আইনমন্ত্রীর ভাষ্যমতে দেশের ফৌজদারী মামলা সমূহের শতকরা ৭৫ ভাগ হ'ল জমিজমা সংক্রান্ত। এইসব মামলা নিষ্পত্তির জন্য প্রতি উপযেলাতে পৃথক আদালত প্রতিষ্ঠা করুন। যারা সরেযমীনে তদন্ত করে সিদ্ধান্ত নিবেন। অনুরূপভাবে পারিবারিক শালিশী আদালত গঠন করুন। আর এইসব আদালতে দ্বীনদার ও সম্মানী লোকদের নিয়ে 'বিচার সহায়ক কমিটি' গঠন করুন। তাহ'লেই বিচারকগণ প্রকৃত আসামী শনাক্ত করতে সক্ষম হবেন (৪) শিক্ষার সর্বস্তরে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করুন (৫) অশ্লীল ও মারদাঙ্গা ছায়াছবি প্রদর্শন, পর্ণো সাহিত্য, সিনেমার নগ্ন পোস্টারিং, ধূমপান ও মাদকদ্রব্যের আমদানী ও সহজলভ্যতা কঠোর হস্তে দমন করুন।

পরিশেষে বলব, রামাযান আসছে। 'ক্লীনহার্ট' বা হৃদয় শুদ্ধির প্রকৃত সুযোগ এ মাসেই রয়েছে। তাই নুযূলে কুরআনের এই পবিত্র মাসকে মর্যাদা দিন। এ মাসের সম্মানে সব হালাল জিনিসের মূল্য হ্রাস করার ব্যবস্থা নিন। এ মাসে কোন অন্যায় কাজের শাস্তি অন্য মাসের তুলনায় দ্বিগুণ করুন। অফিসে-আদালতে, যানবাহনে সর্বত্র যাতে ধর্মীয় আবহ সৃষ্টি হয় এবং রামাযানের পবিত্রতা বজায় থাকে, সেদিকে তীব্র দৃষ্টি রাখুন। শুধু সেনাবাহিনী নয়, প্রশাসন ও বিচার বিভাগের সর্বত্র সকলে যেন 'ক্লীনহার্ট' বা শুদ্ধহৃদয় হন, আমরা আল্লাহ পাকের নিকটে সেই প্রর্থনা করি। আল্লাহ দেশে শান্তি দিন-আমীন![১০১]

৫১. হে সন্ত্রাসী! আল্লাহকে ভয় কর

সন্ত্রাস সন্ত্রাস আর সন্ত্রাস। সর্বত্র সন্ত্রাস। ৯০-এর দশকের আগে কখনো এত অধিকহারে সন্ত্রাসের বিষয়টি নযরে আসেনি। বাংলাদেশের মানুষ স্বভাবগতভাবেই শান্তিপ্রিয়। সহিংসতা এদের স্বভাববিরুদ্ধ। কিন্তু এখন অতি সীমিত সংখ্যক ব্যক্তি হ'লেও তাদের পেশা হ'ল সন্ত্রাস। আগে সন্ত্রাস লুকিয়ে-ছাপিয়ে করা হ'ত। এখন তা চলছে বুক ফুলিয়ে সর্বসমক্ষে। কিন্তু সন্ত্রাসের এই বিস্তার ও ব্যাপকতার কারণ কি? দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক কলামিষ্টগণ প্রায় সকলেই যে কথা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলতে চেয়েছেন তার সার-

১০১. ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, নভেম্বর ২০০২।

সংক্ষেপ হ'ল : (১) বিভিন্ন রাজনৈতিক দল স্ব স্ব নির্বাচনী স্বার্থে দলীয় সন্ত্রাসী বাহিনী গড়ে তুলেছে (২) স্বাভাবিকভাবেই সন্ত্রাসীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হ'ল সরকারের মন্ত্রী-এমপি বা দলনেতাগণ (৩) যেহেতু প্রতি মেয়েদান্তে সরকার পরিবর্তন হয়, সেকারণ বিরোধী দলে সন্ত্রাসীদের কদর হয় বেশী (৪) অনেক ক্ষেত্রে সন্ত্রাসীরাই মন্ত্রী-এমপি নির্বাচিত হয়। কেননা এইসব গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য যোগ্যতা, সততা, দক্ষতা ইত্যাদির চাইতে দলীয় লোককেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে (৫) ছাত্রনেতা নামধারী উচ্চ ডিগ্রীপ্রাপ্ত দলীয় ক্যাডাররা বিভিন্ন সরকারী গুরুত্বপূর্ণ চাকুরীতে প্রবেশ করে। বিচার বিভাগ, পুলিশ বিভাগ, প্রশাসন বিভাগ এমনকি সেনাবাহিনীতেও। ফলে দলীয় সন্ত্রাস এখন সমাজদেহের উপরে-নীচে, শিরা-উপশিরায় সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছে (৬) প্রতিবেশী বন্ধু (?) রাষ্ট্রটির অনবরত উস্কানি ও তাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সন্ত্রাসী ও চালান করা অস্ত্রের মাধ্যমে দেশে পরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হচ্ছে (৭) স্বাধীনতার পক্ষশক্তির লেবেল আঁটা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের খয়েরখাহ বলে পরিচিত দলটির প্রকাশ্য ও গোপন সমর্থনে সন্ত্রাসের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

অতঃপর সন্ত্রাসের প্রতিকার হিসাবে তাঁরা যেসব কথা বলেছেন, সেগুলির সার-সংক্ষেপ হ'ল : (১) রাজনীতির সাথে অপরাধ জগতের নাড়ি বিচ্ছিন্ন করতে হবে (২) চিহ্নিত নেতাদের ও তাদের মদদপুষ্ট রাষ্ট্রদ্রোহী শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের সুনির্দিষ্ট অভিযোগে গ্রেফতার ও বিচার করতে হবে (৩) প্রশাসনকে নিরপেক্ষ ও কঠোর হ'তে হবে (৪) সরকারী দল থেকে সন্ত্রাসীদের বের করে ও শাস্তি দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে (৫) স্বজনপ্রীতি ও দলীয়করণ বাদ দিয়ে মেধা, সততা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে পুরা প্রশাসনকে ঢেলে সাজাতে হবে (৬) সীমান্ত এলাকায় কঠোরভাবে নিশ্ছিদ্র প্রহরা বসাতে হবে এবং এজন্য সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সমূহ কাজে লাগাতে হবে।

উপরোক্ত কারণ ও প্রস্তাবিত প্রতিকার ব্যবস্থাগুলির সঙ্গে আমরা একমত। কিন্তু কথায় বলে যে সর্ষে দিয়ে ভূত ঝাড়াবেন, সেই সর্ষের মধ্যেই রয়েছে ভূত। কার কাছে আমরা প্রতিকার দাবী করছি? গণতন্ত্রের নামে যে বিভেদাত্মক রাজনৈতিক ব্যবস্থা আমাদের দেশে চালু হয়েছে, তা কখনোই জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে কি? দলবাজির মাধ্যমে সহজে নেতা হবার যে সুড়সুড়ি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রয়েছে, তার দ্বারা মেধাহীন, যোগ্যতাহীন, অসৎ

Contents

ও অপদার্থ লোকদের রাষ্ট্র ও সমাজনেতা হ'তে কোন বাধা আছে কি? সূদ, ঘুষ, চাঁদাবাজি, চোরাকারবারী ও জুয়া-লটারীর মাধ্যমে সহজে বড় লোক হওয়ার যে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা এদেশে চালু আছে, তার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের চিন্তা স্বপ্নবিলাস নয় কি? ধর্মহীন ও জাতীয় লক্ষ্যহীন যে শিক্ষা ব্যবস্থা এদেশে চালু আছে, তার মাধ্যমে সৎ, ধার্মিক ও দেশপ্রেমিক নেতা ও কর্মকর্তা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব কি? এডভোকেট নামীয় ব্যক্তিদের কূট তর্ক, বৃটিশ আমলের দীর্ঘসূত্রী বিচার ব্যবস্থা, দোষী প্রমাণিত হওয়ার আগেই নির্দোষ মানুষকে বছরের পর বছর হাজতে পুরে রাখার যে 'খোয়াড়ে' আইন এদেশে চালু আছে, তার মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবার কল্পনা করা যায় কি? পর্ণো সাহিত্য, নগ্ন ও মারদাঙ্গা ছবি সর্বস্ব সিনেমা-টিভি, ভিসিআর-ভিসিপি চালু রেখে দেশে উদ্যমী ও কর্মনিষ্ঠ, শিক্ষিত ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন তরুণ প্রজন্ম সৃষ্টির সরকারী হিতোপদেশ খোলা রসগোল্লার উপরে মাছি বসতে মানা করার ন্যায় প্রতারণা নয় কি?

আমরা বলতে চাই যে, সন্ত্রাসী যুবকটি মূল সন্ত্রাসী নয়। সে নোংরা পরিবেশের অসহায় শিকার এবং নেপথ্য গডফাদারদের বাহন মাত্র। দেশের মাথায় পচন ধরেছে। তা এখন পুরা সমাজদেহকে ক্যান্সারের মত গ্রাস করেছে। অতএব যে সিস্টেম-এর কারণে দেশে অশান্তি সৃষ্টি হচ্ছে, যে পদ্ধতি অনুসরণের ফলে সন্ত্রাসী কিংবা সন্ত্রাসের লালনকারীরা দেশের ও সমাজের নেতা হচ্ছে, ঐ সিস্টেম-এর পরিবর্তন ঘটাতে হবে। তাহ'লে অন্যান্য ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে। এজন্য আমাদের প্রস্তাব সমূহ নিম্নরূপ :

(১) প্রথমেই সন্ত্রাসী ও তার লালনকারীকে একথা বিশ্বাস করতে হবে যে, সে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র হাতে গড়া প্রিয় সৃষ্টি ও তার বাপ-মায়ের অতি আদরের সন্তান। যেকোন সময়ে স্রষ্টার আহ্বানে তাকে দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে ও সেখানে তাকে পূর্ব জীবনের পূর্ণ হিসাব দিতে হবে। উক্ত বিশ্বাস সৃষ্টি ও তা লালনের জন্য দেশে আখেরাতমুখী একক জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

(২) প্রচলিত দল ও প্রার্থীভিত্তিক নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে এবং প্রশাসন ও বিচার বিভাগের ন্যায় রাষ্ট্রের ৩য় স্তম্ভ আইন সভা তথা জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচনের বিষয়টিও দেশের প্রেসিডেন্ট ও তাঁর পরামর্শ সভার

মনোনয়নের উপরে ছেড়ে দিতে হবে। ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ের প্রশাসনিক ইউনিট যেলা প্রশাসকের অধীনে ন্যস্ত করা যেতে পারে। এই ব্যবস্থা আনতে পারলে দেশে শোষক ও সন্ত্রাসীর সংখ্যা আপনা থেকেই কমে যাবে।

(৩) দেশে শক্তিশালী প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকার ব্যবস্থা চালু করতে হবে এবং কেবল প্রেসিডেন্ট জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। প্রেসিডেন্ট জাতীয় ভিত্তিক বৃহৎ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দল সমূহ থেকে প্রতিনিধি নিয়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে যোগ্য ও বরেণ্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি পরামর্শসভা গঠন করবেন। সাথে সাথে বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে পৃথক ও স্বাধীন করে দিতে হবে এবং সেখানে সকল বিভাগের যেকোন ব্যক্তির জবাবদিহির ব্যবস্থা থাকতে হবে। সকল স্তরের ঘুষখোর ও দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান রেখে পৃথক আইন পাস করতে হবে। একই সাথে উক্ত তিনটি বিভাগে নৈতিক প্রশিক্ষণ যোরদার করতে হবে ও অপরাধ প্রমাণের জন্য সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

পরিশেষে বলব, আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টির সেরারূপে সম্মানিত করেছেন *(বনু ইসরাঈল ১৭/৭০)*। বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনা মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব লাভের প্রধান কারণ। এর মাধ্যমে সে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র পসন্দ-অপসন্দ জেনে নিয়ে তাঁর পসন্দের অনুসরণ করে ও অপসন্দ থেকে বিরত হয়। সাধারণ জীব-জন্তুর মধ্যে কামনা-বাসনা আছে, কিন্তু বুদ্ধি ও চেতনা নেই। ফেরেশতাদের মধ্যে বুদ্ধি ও চেতনা আছে, কিন্তু কামনা-বাসনা নেই। জিন জাতির মধ্যে কামনা-বাসনা ও বুদ্ধি-চেতনা আছে। কিন্তু তুলনামূলকভাবে তা খুবই নগণ্য। পক্ষান্তরে মানুষের মধ্যে উভয়টিই রয়েছে প্রখরভাবে। সে তার বিবেক ও চেতনার সাহায্যে স্বীয় কামনা-বাসনাকে পরাভূত করে এবং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র অপসন্দনীয় বিষয়াদি থেকে নিজেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়। আর তখন সে ফেরেশতার চাইতেও উচ্চ মর্যাদায় আসীন হয়। কিন্তু যখনই ষড় রিপুর তাড়নায় ও শয়তানের প্ররোচনায় তার বিচারবোধ ও চেতনা আচ্ছন্ন হয় এবং নিজেকে কামনা-বাসনার কাছে সমর্পণ করে দেয়, তখনই সে মানবতার সর্বোচ্চ শিখর থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে জন্তু-জানোয়ারের চাইতে নিম্নে পতিত হয় *(তীন ৯৫/৪-৫)*। তখন সে হৃদয় থাকতেও বুঝে না, চোখ থাকতেও দেখে না,

কান থাকতেও শোনে না *(আ'রাফ ৭/১৭৯)*। মানুষের এই অধঃপতিত অবস্থায় সে হয় সবধরনের অন্যায়কারী ও সন্ত্রাসী। তাকে ঐ অধঃপতিত অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য চাই সর্বদা আখেরাতমুখী নৈতিক প্রশিক্ষণ এবং কঠোর ও নিরপেক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা। ইনশাআল্লাহ তবেই দেশে ফিরে আসবে সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ ও নিরাপদ জনজীবন।

হে সন্ত্রাসী! তুমি জন্মগতভাবে ছিলে ফুলের মত সুন্দর একটি ফুটফুটে মানব শিশু। যৌবনে তুমি হয়েছ সন্ত্রাসী নামক সমাজের ঘৃণ্য জীব। তওবা কর সন্ত্রাস থেকে। ফিরে চল তোমার প্রভু পালনকর্তার দিকে। কষ্টের হালাল রূযীর উপরে সন্তুষ্ট থাকো। তোমার নিষ্পাপ সন্তানের শ্রদ্ধেয় পিতা হবার চেষ্টা কর। সমাজের সর্বাধিক কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত কর। মনে রেখ, তোমার কর্ণ, তোমার চক্ষু, তোমার হৃদয় ও বিবেক-বুদ্ধি সবকিছুই ক্বিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে *(বনু ইসরাঈল ১৭/৩৬)*। কি জবাব দেবে তুমি সেদিন? তুমি কি পারবে জাহান্নামের কঠিন আযাব একদিন ভোগ করতে? তুমি কি চাওনা দুনিয়াতে সৎকর্মের বিনিময়ে জান্নাতের চিরস্থায়ী শান্তি লাভ করতে? অতএব ফিরে এসো প্রভুর পানে। তওবা কর খালেছ মনে। অনুতপ্ত হও আল্লাহ্র কাছে ও বান্দার কাছে। মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ আসার আগেই নিজেকে সংশোধন করে নাও। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন![১০২]

৫২. ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ইসলাম

আল্লাহ বলেন, মানবজাতি একই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। অতঃপর জান্নাতের সুসংবাদ দানকারী ও জাহান্নামের ভয় প্রদর্শনকারী রূপে আল্লাহ যুগে যুগে নবীগণকে প্রেরণ করেন। তিনি তাদের সাথে সত্যসহকারে কিতাব নাযিল করেন, যাতে তার মাধ্যমে তারা লোকদের মধ্যকার বিবাদীয় বিষয় সমূহ ফায়ছালা করে দেন। অথচ যারা কিতাবপ্রাপ্ত হয়েছিল, তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনাদি এসে যাওয়ার পরেও তারা পারস্পরিক হঠকারিতাবশে উক্ত কিতাবে মতভেদ করল। অতঃপর আল্লাহ স্বীয় আদেশক্রমে বিশ্বাসীগণকে তাদের বিবাদীয় বিষয়ে সত্যের দিকে পথ প্রদর্শন করলেন। বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে সরল পথ দেখিয়ে থাকেন' *(বাক্বারাহ ২/২১৩)*।

---

১০২. ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, জুন ২০০৩।

উপরোক্ত আয়াতে মানব জাতির ঐক্য, তাদের পারস্পরিক মতানৈক্য ও মতভেদের কারণ, অতঃপর ঐক্যের পথ, সবকিছু বলে দেওয়া হয়েছে। এক্ষণে বিশ্বমানবতার ঐক্য এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, সে বিষয়ে আমরা সংক্ষেপে আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ।

প্রথমে বাংলাদেশের জনগণকে একটি বিষয়ে একমত হ'তে হবে যে, তারা তাদের সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আল্লাহকে বিশ্বাস করেন কি-না। যদি আল্লাহতে বিশ্বাসীদের সংখ্যা বেশী হয়, তবে তাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, তারা আল্লাহকে কেবল সৃষ্টিকর্তা হিসাবে মানেন, না সবকিছুর পরিচালক ও বিধানদাতা হিসাবে মানেন। যদি দ্বিতীয় মতের লোকের সংখ্যা বেশী হয়, তাহ'লে তাদেরকে সিদ্ধান্তে আসতে হবে যে, আল্লাহ্র বিধান কি কেবল তাদের ব্যক্তি জীবনের জন্য, না সার্বিক জীবনের জন্য? এগুলি সবই মৌলিক প্রশ্ন। প্রয়োজনে এর উপরে জনমত যাচাই করা যেতে পারে।

আমরা মনে করি যে, বাংলাদেশের মুষ্টিমেয় কিছু নাস্তিক বাদে সকল নাগরিকই আল্লাহতে বিশ্বাসী। এদেশের সকল মানুষ আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে, বিধানদাতা হিসাবে, সবকিছুর ধারক ও পরিচালক হিসাবে, জীবন ও মৃত্যুদাতা হিসাবে বিশ্বাস করেন। গোল বাধবে একখানে গিয়ে। সেটি হ'ল এই যে, বিদেশী বস্তুবাদী মতবাদ সমূহের খপ্পরে পড়ে কিছু দুনিয়াপূজারী লোক তাদের স্বেচ্ছাচারিতা ক্ষুণ্ন হবার ভয়ে আল্লাহ্র বিধি-বিধান সমূহকে তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা বৈষয়িক জীবনের বিস্তৃত ময়দান থেকে হটিয়ে কেবল গৃহকোণে আবদ্ধ করে রাখতে চাইবেন। তারা ছালাত-ছিয়াম-হজ্জ ইত্যাদি ব্যক্তিগত ইবাদতে আল্লাহ্র বিধান মানতে রাযী হবেন, কিন্তু সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র দাসত্ব কবুল করতে রাযী হবেন না।

এক্ষণে এদের সাথে অন্যদের ঐক্যের পথ কি? বাহ্যতঃ ঐক্যের কোন পথ খোলা নেই। আমরা মনে করি যে, এর পরেও ঐক্যের পথ আছে। যেমন (১) ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী দল ও নেতৃবৃন্দকে যদি বুঝানো যায় যে, আল্লাহ্র বিধান মেনে নেওয়ার মধ্যেই তাদের দুনিয়াবী কল্যাণ বেশী রয়েছে, তাহ'লে ঐ লোকগুলি দুনিয়াবী স্বার্থেই আল্লাহ্র বিধান মেনে নিবে। কেননা ওদের মূল

লক্ষ্যই হ'ল দুনিয়া হাছিল করা। যেমন, সূদ-ঘুষ, জুয়া-লটারী, চুরি-ডাকাতি-সন্ত্রাস ইত্যাদির দুনিয়াবী অপকারিতা বিজ্ঞান ও যুক্তি দিয়ে বুঝাতে হবে। অতঃপর তাকে আল্লাহ্র বিধানের স্থায়ী কল্যাণকারিতা এবং মৃত্যু পরবর্তী চিরস্থায়ী জীবনের মর্মান্তিক আযাবের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। আশা করি এতেই তাদের অধিকাংশের হিতজ্ঞান ফিরে আসবে এবং আল্লাহ্র দেওয়া চিরন্তন ও সার্বজনীন বিধান সমূহ তারা মেনে নিবেন। যদি বলেন, নেতাদের হেদায়াত হওয়া সুদূরপরাহত। তাহ'লে বর্তমানের আধুনিক মিডিয়া ব্যবহার করে সহজে জনমত যাচাই করে নিতে হবে। আশা করি অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ্র বিধান মেনে নেওয়ার পক্ষে রায় দিবেন। তখন ঐসব দুনিয়াদার নেতারা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমতের সামনে মাথা নত করবেন। অথবা নেতৃত্ব থেকে তাদের হটে যেতে হবে।

আমরা মনে করি এমন কোন জ্ঞানী মানুষ নেই, যিনি উপরোক্ত অন্যায় কর্ম সমূহকে ন্যায় কর্ম মনে করেন। এভাবে অন্ততঃ সামাজিক শৃংখলা ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে বাংলাদেশের সকল ধর্ম, বর্ণ ও দলমতের লোকদের মধ্যে ঐক্যমত সৃষ্টি হবে। যদি দেড় হাযার বছর পূর্বে মদীনার ইহূদী-নাছারা ও পৌত্তলিকগণ স্ব স্ব ধর্ম পরিত্যাগ না করেও ইসলামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণ বিধান সমূহ কবুল করে নিতে পারে, তবে বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলিম এবং হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান নেতৃবৃন্দ সামাজিক কল্যাণের স্বার্থে কেন তা মেনে নিতে পারবেন না?

বাকী রইল ইসলামী নেতাদের মাঝে ঐক্য। এটি খুবই সহজ, আবার খুবই কঠিন বিষয়। সহজ এজন্য যে, মুসলিম নেতৃবৃন্দ ইচ্ছা করলে ইসলামের নামে সহজেই এক প্লাটফরমে আসতে পারেন ও যেকোন বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন। পক্ষান্তরে এটা খুবই কঠিন ও প্রায় অসম্ভব ব্যাপার কতগুলি কারণে যেমন, (১) এঁরা ধর্মীয়ভাবে বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকায় বিভক্ত (২) বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমান 'হানাফী' মাযহাবের হ'লেও তাদের মধ্যে রয়েছে পরস্পরে বিস্তর ধর্মীয় মতভেদ। ১৯৮১ সালের সরকারী হিসাব মতে এদেশে রয়েছে ২ লক্ষ ৯৮ হাযার পীর। নিঃসন্দেহে এক পীরের সাথে আরেক পীরের মিল নেই। মিল নেই একে অপরের মুরীদদের সাথেও।

এদের বাইরে রয়েছে মাওলানা মওদূদীর অনুসারী 'জামায়াতে ইসলামী' ও মাওলানা ইলিয়াস দেউবন্দীর অনুসারী 'তাবলীগ জামা'আত'। এদের পরস্পরে সাপে-নেউলে সম্পর্ক। এক্ষণে এদের মধ্যে ঐক্যের পথগুলি আমরা তুলে ধরার প্রয়াস পাব। যেমন (১) ১৪ কোটি নাগরিকের মধ্যে অন্যদের বাদ দিয়ে যদি এদেশে ১২ কোটি মুসলমানের বাস হয়, তবে তার মধ্যে অন্যূন ২ কোটি 'আহলেহাদীছ' বাদ দিলে ১০ কোটি 'হানাফী' মুসলমান বসবাস করেন। পাকিস্তানের শী'আ-সুন্নী দ্বন্দ্বের বিপরীতে বাংলাদেশের একটি প্লাস পয়েন্ট এই যে, এখানে শী'আ মুসলমানের সংখ্যা খুবই নগণ্য, একেবারে হাতে গণা বললেও চলে। ফলে এখানকার সকল মুসলমান 'সুন্নী'। এদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা হিসাব মত খুবই সহজ হওয়ার কথা। এ বিষয়ে আমাদের প্রস্তাব সমূহ নিম্নরূপ :

(১) সকল বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে হবে। হানাফী ভাইগণ যে ইমামের অনুসারী হওয়ার দাবী করেন, সেই ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর স্পষ্ট বক্তব্য হ'ল এই যে, 'কোন বিষয়ে ছহীহ হাদীছ পেলে জেনো যে, সেটাই আমার মাযহাব'। আহলেহাদীছগণের দাবীও সেটাই। অতএব এক্ষেত্রে হানাফী আহলেহাদীছ সকলে এক প্লাটফরমে আসতে পারেন। এরপরেও ব্যাখ্যাগত মতভেদ যদি থাকে এবং সেটা যদি ছহীহ হাদীছকে অগ্রাহ্য করার পর্যায়ে না যায়, তবে সেক্ষেত্রে স্ব স্ব আমল পৃথক রেখেই পারস্পরিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব। (২) যদি সকলে স্ব স্ব দলীয় প্যাড ও ব্যানার অক্ষুণ্ণ রাখতে চান, তবুও পারস্পরিক ভ্রাতৃসুলভ সহযোগিতা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্লাটফরম সৃষ্টি করা খুবই সহজ। আমরা মনে করি বাংলাদেশে এটা এখন একান্তই সময়ের দাবী। জনগণের প্রাণের দাবীও এটা।

উপরোক্ত প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য যরূরী বিষয়গুলি হল :

(১) পারস্পরিক গীবত-তোহমত ও অশালীন বক্তব্য সমূহ পরিহার করা। বিশেষ করে বই ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে পরস্পরের বিরুদ্ধে স্থায়ী গীবত বর্জন করা। কেননা এগুলির গোনাহ ক্বিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে এবং গীবতকারী ব্যক্তির ও ব্যক্তিসমষ্টির আমলনামায় তা লিপিবদ্ধ হবে (২) নিজ

মতের উপরে এবং অনৈক্যের উপরে যদি না করা (৩) বিভিন্ন দলের মধ্যে উপদল সৃষ্টির মাধ্যমে ভাঙ্গন সৃষ্টি রোধের জন্য প্রার্থিতা ও ক্যানভাসিং-এর বর্তমান ভোট পদ্ধতির বাইরে সর্বাধুনিক স্বচ্ছ পদ্ধতির মাধ্যমে জনমত যাচাই করে একক দলীয় নেতা বা আমীর নির্বাচন করা ও শূরা পদ্ধতির মাধ্যমে দল পরিচালনা করা (৪) দুনিয়াবী স্বার্থের উপরে দ্বীনী স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া (৫) সর্বোপরি মুসলিম ঐক্য ও জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প থাকা এবং উক্ত বিষয়ে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করা। আহলেহাদীছদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের একই প্রস্তাব রইল। আমরা মনে করি ইসলামী আইন বাস্তবায়নের ব্যাপারে দেশে একটি ব্যাপকভিত্তিক Consensus বা 'জাতীয় ঐক্যমত' সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন![১০৩]

৫৩. প্রকৃত জিহাদই কাম্য

সম্প্রতি কিছু তরুণ জয়পুরহাটে ধরা পড়েছে। তারা সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে দেশে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং সেজন্য সর্বত্র নাশকতামূলক তৎপরতা চালিয়ে সরকার ও জনগণকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তাদের উদ্দেশ্য হাছিল করতে চায় বলে পত্র-পত্রিকায় বক্তব্য এসেছে। এরা নাকি আহলেহাদীছ মাদরাসাগুলিকে ঘাঁটি করে তাদের অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। কোন কোন পত্রিকায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-কে জঙ্গী সংগঠনের তালিকাভুক্ত করে খবর প্রকাশ করা হয়েছে। সেই সাথে আহলেহাদীছ জামা'আতের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম ও দেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাগ্মী মাওলানা আব্দুল্লাহ ইবনে ফযল (রহঃ)-এর নামে কুৎসা রটিয়ে বলেছে, 'একাত্তরে আব্দুল্লাহ ইবনে ফজল একজন দুর্ধর্ষ আল-বদর ছিলেন। একাত্তরে তার কুখ্যাতির নানা কাহিনী এখনও মানুষের মনে গেঁথে আছে'। আমরা উপরোক্ত মন্তব্যসমূহের তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জানিয়ে দিচ্ছি যে, যদি আহলেহাদীছ মাদরাসাগুলিকে এভাবে ঢালাওভাবে চিহ্নিত করা হয় এবং তাদের শ্রদ্ধেয় আলেমদের সম্পর্কে এই ধরনের ভিত্তিহীন ও নোংরা মন্তব্য সমূহ করা হয়, তাহ'লে এদেশের অন্যূন দু'কোটি আহলেহাদীছের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ

১০৩. ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১১তম সংখ্যা, আগস্ট ২০০৩।

ধূমায়িত হবে, যা এক সময় জাতীয় ক্ষোভে পরিণত হবে। মাওলানা আব্দুল্লাহ ইবনে ফযল এক ওয়ায মাহফিলে বক্তৃতার জন্য এসে ১৯৮৪ সালের ২১শে এপ্রিল শনিবার দিবাগত রাতে তাহাজ্জুদের সময় রাজশাহী মহানগরীর রাণীবাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে শায়িত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত তিনি সারা দেশে বক্তৃতা করে ফিরেছেন। সর্বস্তরের জনগণ তাঁর ঈমানবর্ধক হৃদয়গ্রাহী ভাষণ ঘণ্টার পর ঘণ্টা মন্ত্রমুগ্ধের মত শ্রবণ করত ও আখেরাতে মুক্তির জন্য কেঁদে বুক ভাসাতো। সরকার ও জনগণ তাঁর বিরুদ্ধে কখনো কোন কুকীর্তির অভিযোগ উত্থাপন করেনি। অথচ স্বাধীনতার ৩২ বছর পরে এসে ছেলের কোন অপরাধের কারণে তার মরহূম পিতাকে দায়ী করা কতটুকু সঙ্গত হয়েছে, তরুণ রিপোর্টার ও বিজ্ঞ সম্পাদকের তা অবশ্যই ভেবে দেখা উচিত ছিল। এদেশে বিদেশী খ্রিষ্টান এনজিওগুলির খপ্পরে পড়ে হাযার হাযার হিন্দু-মুসলিম প্রতিনিয়ত খ্রিষ্টান হয়ে যাচ্ছে। যাদের নিয়ে অদূর ভবিষ্যতে ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তিমূরের মত অবস্থা বাংলাদেশে যেকোন সময় হ'তে পারে। সেদিকে ঐসব বাম ঘেঁষা পত্রিকাগুলির কোন মাথাব্যথা নেই। অথচ মধ্যপ্রাচ্যের হাতেগণা দু'চারটি ইসলামী দাতা সংস্থা নিঃস্বার্থভাবে এদেশের দ্বীন ও সমাজের সেবায় কাজ করে যাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধেই তাদের যত অন্তর্জ্বালা। বিষয়টি বুঝতে মোটেই অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

জানা আবশ্যক যে, সকল ইসলামপন্থী দল ও ওলামায়ে কেরামের ন্যায় মাওলানা আব্দুল্লাহ ইবনে ফযল ছিলেন নিঃসন্দেহে একজন শ্রেষ্ঠ আলেম ও নিখাদ দেশপ্রেমিক নেতা এবং সেদিনের ন্যায় আজও এদেশের ইসলামপন্থী শক্তিই দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী। ভিতর ও বাহিরের স্বাধীনতা বিরোধী চক্র সবসময় এদেশের ইসলামী শক্তিকে দুর্বল করতে চেয়েছে। এতদিন পর পলিসি পরিবর্তন করে এখন তারা মুছল্লী সেজে মসজিদে ঢোকার পন্থা গ্রহণ করেছে। দেশের বাম ও বাম ঘেঁষা দলগুলির ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে প্রতিবেশী রাষ্ট্র এখন ইসলামী দলগুলির মধ্যে তাদের এজেন্ট ঢুকিয়ে দিচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় যদি আহলেহাদীছের কোন ছেলেকে হাত করে তারা তাদের স্বার্থে কাজে লাগিয়ে থাকে, তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কেননা তাতে তাদের দু'টি স্বার্থ হাছিল হবে। ১- 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নেতৃত্বে অগ্রগামী বর্তমানে

সচেতনভাবে ঐক্যবদ্ধ আহলেহাদীছ জনশক্তিকে ভিতর থেকে দুর্বল করা। ২- শিরক ও বিদ'আত মুক্ত নির্ভেজাল ইসলামের আদিরূপ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন থেকে জনগণকে বিরত রাখা।

অতএব যদি বাংলাদেশে জিহাদ ও ইসলামের নামে কোন সশস্ত্র সংগঠন থেকেই থাকে, তবে তার উৎস বাংলাদেশে নয়, বরং ইসলাম বৈরী প্রতিবেশী রাষ্ট্রে। 'হিন্দুস্তান টাইম্স' ২০০২-এর প্রথম দিকেই বাংলাদেশে 'আহলেহাদীছ'কে জঙ্গী সংগঠন বলে আখ্যায়িত করেছিল। এতদিন পরে তাদের অনুসারী পত্রিকাগুলির মাধ্যমে জানিয়ে দিল যে, 'আহলেহাদীছ' বলতে তারা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-কেই বুঝাতে চেয়েছে। কেননা এ সংগঠনের মূল শ্লোগান হ'ল- 'আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি'। 'মুক্তির একই পথ, দাওয়াত ও জিহাদ'। 'আমাদের রাজনীতি, ইমারত ও খেলাফত'। 'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর'। ইসলামের এই মৌলিক শ্লোগানগুলি ইসলাম বিরোধী শক্তির বুকে স্কাড ক্ষেপণাস্ত্রের ন্যায় বিদ্ধ হয়। তাই তারা প্রথমে 'দ্বীন কায়েমের পদ্ধতি' নামে বই লিখে সেখানে জিহাদের অপব্যাখ্যা করে কিছু আহলেহাদীছ তরুণকে বিভ্রান্ত করে। অতঃপর তাদের দিয়েই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর মূল নেতাদেরকে হত্যা করার হুমকি দিতে থাকে। এছাড়াও রাজনৈতিক হয়রানি গত কয়েক বছর থেকেই চলছে।

আমরা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে, আমরা সর্বদা দাওয়াত ও জিহাদে বিশ্বাসী। 'জিহাদ' ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া। মুমিনের যিন্দেগী প্রতি মুহূর্তে জিহাদের যিন্দেগী। মুসলমান যখনই জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তখনই তার উপরে আল্লাহ্র গযব নেমে আসবে। এই জিহাদ হবে সর্বদা নিজের প্রবৃত্তিরূপী শয়তানের বিরুদ্ধে, যাবতীয় শয়তানী আদর্শের বিরুদ্ধে, শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিরোধী যাবতীয় আক্বীদা ও আমলের বিরুদ্ধে। শান্ত অবস্থায় এই জিহাদ হবে কথা, কলম ও জনমত সংগঠনের মাধ্যমে। কিন্তু দেশের উপরে সশস্ত্র হামলার সময় সরকারের নির্দেশে প্রত্যেক সক্ষম আহলেহাদীছ ইসলামের স্বার্থে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় হাসিমুখে বুকের তপ্ত-তাযা খুন ঢেলে দিয়ে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করবে। সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী, আল্লামা

ইসমাঈল শহীদ, মাওলানা নিছার আলী তিতুমীর, মাওলানা বেলায়েত আলী, এনায়েত আলী প্রমুখ আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামের নেতৃত্বেই এক সময় ভারতবর্ষে দ্বীন ও স্বাধীনতার জন্য জিহাদ আন্দোলন হয়েছিল। তাঁদেরই রক্তভেজা পথ বেয়ে আজ আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো লাভ করেছি। তবে বর্তমান অবস্থায় দেশে জিহাদের নামে যা কিছু হচ্ছে, তা সন্ত্রাস ব্যতীত কিছুই নয়। এসবের সাথে প্রকৃত জিহাদের কোনই সম্পর্ক নেই। মুমিন হিসাবে আমাদের নিকটে প্রকৃত জিহাদই কাম্য। এ প্রেক্ষিতে আমরা সরকারের নিকটে প্রস্তাব রাখতে চাই যে, দেশের সকল মাদরাসা ও কলেজ পর্যায়ের ছাত্রদের বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক প্রশিক্ষণ দিন ও তাদেরকে ইসলামী প্রশিক্ষণ দান করুন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন![১০৪]

রাজনৈতিক

৫৪. কল্যাণমুখী প্রশাসন

আদর্শকে কেন্দ্র করেই মানুষের সার্বিক জীবন আবর্তিত হয়। আদর্শহীন মানুষ এমনকি নিজ পরিবারের সদস্যদের নিকটেও অবিশ্বস্ত ও অশ্রদ্ধার পাত্র। অনুরূপভাবে একটি জাতি উন্নত হয় তার আদর্শনিষ্ঠার কারণে। জাতিকে নীতি ও কল্যাণের পথে পরিচালনার জন্যই প্রয়োজন আদর্শবান ও কল্যাণমুখী প্রশাসন।

হাত, পা বা মাথা সবকিছু পরস্পরে পৃথক হ'লেও তারা একই দেহের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এমনিভাবে ধর্মীয় জীবন, রাজনৈতিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন পৃথক হ'লেও তার কোনটিই মানুষের জীবনসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বরং দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মানুষের নিজ আদর্শ ও আক্বীদা-বিশ্বাস অনুযায়ী চলে। ইসলাম মানুষের সার্বিক জীবনে কল্যাণের পথ দেখায়। মুসলিমের নিকটে তাই ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নটি একেবারেই অচল। এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল : বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে যেখানে আল্লাহ প্রেরিত দ্বীনের প্রবেশাধিকার নেই, সেখানে তাহ'লে কার পদচারণা চলছে? জওয়াব অতি পরিষ্কার...।

রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের নিজস্ব কোন আদর্শ না থাকার ফলেই সম্ভবতঃ এদেশ চলে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন জনের কথায়। একদিকে সুন্দরী প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা

১০৪. ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১২তম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০৩।

গ্রহণ ও পুনরায় সরকারী হুকুমে তা বাতিল করণ। একদিকে খুন-ধর্ষণ, ছিনতাই-রাহযানির বিরুদ্ধে তার স্বরে চিৎকার, অন্যদিকে ডিশ এ্যান্টেনার মাধ্যমে দেশব্যাপী ভিসিআর-ভিসিপি, রঙিন টেলিভিশন ও ব্লু ফিল্মের নীল দংশন। একদিকে পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়া অর্থনীতির বিরুদ্ধে রাজপথ সরগরম, অন্যদিকে সূদ-জুয়া-হাউজী-লটারীর সরকারী অনুমোদন ও গরীবের রক্ত শোষণ। একদিকে বলা হচ্ছে চাই আইনের শাসন, অন্যদিকে আইনের রক্ষকরাই আইন ভঙ্গের চ্যাম্পিয়ন। বলা হচ্ছে 'পানি সমস্যার সমাধান, অমুক নেত্রীর অবদান'। দেখা যাচ্ছে পানিহীনতায় বৃহৎ নদীটি শুষ্ক এবং দেশ মরুভূমি হচ্ছে। একটি বিশেষ দলকে বলা হচ্ছে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি, তারাই আবার দেশের এক দশমাংশ পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভিনদেশের হাতে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। বলা হচ্ছে সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন চাই, অথচ চর দখলের মত হল দখল করা হচ্ছে। পাখির মত ছাত্র হত্যা করা হচ্ছে। এমনকি নিরীহ গাভী পর্যন্ত দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের শিক্ষিত জ্ঞানী লোকদের অনুগ্রহ লাভে ব্যর্থ হয়ে নিহতের তালিকায় শামিল হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলির লালিত ছাত্র নামধারী দলীয় সন্ত্রাসী ও পুলিশ দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রভোষ্ট পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের লাঠিপেটা করা হচ্ছে। সর্বোচ্চ প্রশাসনের অন্যায় হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ভাইস চ্যান্সেলর সহ ৭০ জন প্রশাসনিক পদাধিকারী সর্বোচ্চ পদমর্যাদার অধ্যাপককে পদত্যাগ করে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন হ'তে নীরবে চলে যেতে হচ্ছে। এসবই রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের দিকনির্দেশনাহীন চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ।

এদিকে ঢাকার একটি পরিচিত সাপ্তাহিকের সুপরিচিত সম্পাদক বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বপ্রথম 'সুন্দরী প্রতিযোগিতা' বন্ধের সরকারী ঘোষণাতে খুবই নাখোশ হয়েছেন এবং 'বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার ও ঐসব মৌলবাদী দলগুলির চরিত্রে কোনো পার্থক্য নেই' বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'সুন্দরী প্রতিযোগিতা আধুনিক সমাজের সুন্দর প্রতিযোগিতা। এ প্রতিযোগিতার ভেতর সৌন্দর্যের বাইরে অন্য কিছু খোঁজার মত অশ্লীল লোকের সংখ্যা পৃথিবীতে সীমিত। বাংলাদেশের সুস্থ সুন্দর আধুনিক প্রজন্মের কেউই এর বিপক্ষে নয়'।

কথায় বলে ‘জণ্ডিসের রোগী সবকিছুকে হলুদ দেখে’। সম্মানিত সম্পাদক ছাহেব এই সুন্দরী প্রতিযোগিতায় নিজের ঘরের স্ত্রী-কন্যাদেরকে মডেল হিসাবে বের করে এনে দাঁড় করাতে পারবেন কি? নারী ও পুরুষের স্বভাবগত চরিত্রে যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক আছে তা কি তিনি অস্বীকার করবেন? নেগেটিভ ও পজেটিভ দু’টি তারের (ক্যাবল) উপরে যদি পর্দা না থাকে, তাহ’লে কি শর্ট সার্কিট হয়ে আগুন ধরে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী নয়? আগুনের ক্রিয়া জ্বালানো, পানির ক্রিয়া নিভানো -এই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়াকে অস্বীকার করা যাবে কি? বেগানা নারী-পুরুষের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া মানুষের একটি স্বভাবজাত বিষয়। একে কেউ অস্বীকার করতে পারবেন কি? প্রতিদিন সকালে দৈনিক পত্রিকার পাতা উল্টালে আমরা কি এসবের নোংরা চিত্র দেখতে পাই না? পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা প্রভৃতির মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি, প্রেম-ভালোবাসা ও স্নেহ-মমতার প্রতিক্রিয়া সঞ্জাত সম্পর্ক আছে বলেই সমাজ-সংসার আজও টিকে আছে। এই প্রতিক্রিয়ার পর্দা উঠানোটাই হ’ল প্রকৃত অশ্লীলতা। তবে কি প্রতিক্রিয়াহীন এবং শ্লীল-অশ্লীল ও ন্যায়-অন্যায় ভেদাভেদহীন পশুর সমাজে পরিণত হওয়ার জন্য সম্মানিত সম্পাদক ছাহেব নিজে একজন মুসলমান হয়েও আমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন?

মূলতঃ রাজনীতিকগণ ও প্রশাসনের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগণ হ’তে নিম্নপদস্থ ব্যক্তি ও তাদের দেখাদেখি সাধারণ নাগরিকগণ যেন নীতিহীনতার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। চরিত্রহীন জাতি পশুর চাইতে অধম। ‘যেমন খুশী তেমন সাজ’ এটা কোন রাষ্ট্রীয় নীতি হ’তে পারে না। অধঃপতিত এই সমাজকে বাঁচাতে গেলে তাই প্রয়োজন দেশপ্রেমিক নীতিবান ও কল্যাণমুখী রাষ্ট্রীয় প্রশাসন। চাই সুনির্দিষ্ট আদর্শিক মানদণ্ড। সে মানদণ্ড হ’ল সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বিধান ‘ইসলাম’। আসুন অতি বুদ্ধিমান হওয়ার দুর্বুদ্ধি ত্যাগ করে আল্লাহ্র বিধানের নিকটে নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করি ও তা নিরপেক্ষ ও নিরাপোষভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজে সত্যিকারের শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করি। আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রশাসন সেদিকে কান দিবেন কি?[১০৫]

---

১০৫. ১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, মে ১৯৯৮।

৫৫. স্বাধীনতার মাসে অধীনতার কসরৎ

২৬শে মার্চ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস। এ মাসেরই ২৫শে মার্চ দিবাগত রাতে রাজধানী ঢাকার ঘুমন্ত মানুষের উপর হিংস্র আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নীতিহীন পাকিস্তানী সেনাবাহিনী। ফলে পরদিন ২৬শে মার্চকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস হিসাবে ঘোষণা করেন দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। সাধারণ মানুষ সর্বদা স্বাধীনতা প্রিয় এবং এই কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রাখতে দেশের প্রতিটি নাগরিক সর্বদা আপোষহীন প্রতিজ্ঞায় অটল। কিন্তু সাধারণ জনগণের সরল প্রতিজ্ঞা ও দেশের নেতৃবৃন্দের ইচ্ছা ও চেতনা কি একই মানদণ্ডে পরিমাপ করা যাবে? পাকিস্তানী শাসকদের অদূরদর্শিতার কারণে যেমন তখনকার স্বাধীনতা টেকেনি, তেমনি বাংলাদেশী নেতৃবৃন্দের অদূরদর্শিতার কারণে এ দেশের স্বাধীনতা যেকোন সময় উবে যেতে পারে, সেকথা সর্বদা সকলের মনে রাখা কর্তব্য। হাঙ্গরের প্রসারিত মুখ গহ্বরে সূঁচালো দন্তসারির মধ্যে একটা তরতাযা প্রাণ যেমন বেশীক্ষণ লাফ-ঝাঁপ করতে পারে না, বঙ্গীয় ব-দ্বীপ এই বাংলাদেশের স্বাধীনতাও অনুরূপ অনিশ্চয়তার চোরাবালিতে যেকোন সময় হারিয়ে যাওয়া মোটেই অবাস্তব বিষয় নয়।

দেশটির ভূ-প্রকৃতি ও শস্য-শ্যামল ভূ-অর্থনৈতিক অবস্থান চিরকাল বিদেশীদের আকৃষ্ট করেছে। ফলে দেশটি অধিকাংশ সময় পরদেশী দ্বারা শাসিত ও শোষিত হয়েছে। বিশেষ করে দেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে অবস্থিত দেশের এক দশমাংশ এলাকা নিয়ে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক, ভূ-অর্থনৈতিক এবং কৌশলগত অঞ্চল হিসাবে পরিগণিত। অঞ্চলটি বিশ্বের তিনটি খুবই গুরুত্ববহ ভূ-রাজনৈতিক অঞ্চলের সংযোগস্থলে অবস্থিত। এক. দক্ষিণ এশিয়া বা সার্ক অঞ্চল। দুই. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বা আসিয়ান অঞ্চল। তিন. উত্তর-পূর্বের বিশাল চীন অঞ্চল। চীন ইতিমধ্যে পরাশক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং ভারত নিকট ভবিষ্যতে পরাশক্তি হ'তে যাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতার ঊর্ধ্বে এরা কেউ নয়। বিশেষ করে ভারতের কোন প্রতিবেশী তার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত নয়। ফলে তাদের কারু সাথে তার সদ্ভাব নেই। চীন ও ভারতের মধ্যকার বৈরিতা সুস্পষ্ট। অথচ উভয়েই চায় ভারত মহাসাগরে তাদের প্রভাব বলয় বৃদ্ধি করতে। ভারত তো

নেহরুর 'ইণ্ডিয়া ডকট্রিন' অনুযায়ী মধ্যপ্রাচ্যের বিস্তীর্ণ তৈলক্ষেত্রসহ সুদূর মক্কা-মদীনা পর্যন্ত তার সাম্রাজ্যসীমা বিস্তৃত করার স্বপ্ন দেখে। হাতে শক্তি পেলে সে যে তার স্বপ্ন বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে না, একথা হলফ করে বলার উপায় নেই।

ভারত, চীন ও যুক্তরাষ্ট্র চট্টগ্রামকে এতদঞ্চলে অতীব প্রয়োজনীয় ভূ-কৌশলগত এলাকা হিসাবে বিবেচনা করে। কারণ ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের 'সাতবোন রাজ্যমালা' (Seven Sisters States) তথা মণিপুর, আসাম, মেঘালয়, নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম, ত্রিপুরা, অরুণাচল সহ সাতটি রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী উলফা, বোড়ো, মিজো, নাগা, গুর্খা, কুকি প্রভৃতি মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপগুলি তাদের সশস্ত্র তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। তাদের ওপারেই রয়েছে বিশাল চীনের সশস্ত্র অবস্থান। ১৯৬২ সালের যুদ্ধে তারা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রায় অর্ধাংশ দখল করে নেয় এবং তারা আজও বৃটিশদের দ্বারা চিহ্নিত ম্যাকমোহন লাইন (Mc Mohon Line)-কে স্বীকৃতি দেয়নি। তাই চীনকে ভারত সব সময় সন্দেহের নযরে দেখে। এই রাজ্যগুলির স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করার জন্য বাংলাদেশের বুক চিরে দ্রুত ও সরাসরি সমর সম্ভার প্রেরণের স্বার্থে ভারতের জন্য চট্টগ্রাম বন্দর ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সড়ক পথ খুবই যরূরী। অপরদিকে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের এই ৫০/৬০ মাইল চওড়া এক ফালি ভূমি পেরুতে পারলেই চীন সরাসরি পৌঁছতে পারে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরে, যা তাকে নিয়ে যাবে বঙ্গোপসাগর দিয়ে ভারত মহাসাগরের নীল দরিয়ায়। যার মাধ্যমে সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ভারত মহাসাগরীয় বিশাল পানি সীমাকে। যেভাবে ভূমধ্যসাগরে নৌবহর পাঠিয়ে আমেরিকা সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যের উপরে ছড়ি ঘুরাচ্ছে। একইভাবে তখন ভারত মহাসাগরে সামরিক নৌবহর পাঠিয়ে চীন সমগ্র দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একক পরাশক্তি হিসাবে ছড়ি ঘুরাতে সক্ষম হবে।

অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার পর একক বিশ্বশক্তি হিসাবে আমেরিকা এখন একবিংশ শতাব্দীতে চীনকেই তার সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে মনে করছে। আর সেকারণেই সে চীনের বৈরীশক্তি হিসাবে ভারতকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে চীনকে ভারত মহাসাগরের

প্রবেশদ্বার চট্টগ্রাম থেকে দূরে রাখার জন্য বাংলাদেশের উপরে চাপ সৃষ্টি করে ভারতের সাথে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর করিয়ে নিয়েছে। তাছাড়া ইতিমধ্যেই সেখানে এনজিও তৎপরতার মাধ্যমে টাকা-পয়সার লোভ দেখিয়ে চাকমা ও অন্যান্য উপজাতীয়দের খ্রিষ্টান বানানোর চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে। যাতে অদূর ভবিষ্যতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রিষ্টান রাজ্য হিসাবে ঘোষণা ও স্বীকৃতি দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের বুকে ইস্রাঈলের ন্যায় এবং ইন্দোনেশিয়ার বুকে পূর্ব তিমুরের ন্যায় এখানে একটি বিষফোঁড়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যায়। যার কাজ হবে আমেরিকার স্বার্থ রক্ষা করা। সাথে সাথে চীন ও তার প্রতিবেশী তথা সমগ্র এশিয়ার উপরে আমেরিকা চোখ রাঙাতে সক্ষম হয়। সাথে সাথে সক্ষম হয় এতদঞ্চলের সম্পদরাজির অবাধ লুণ্ঠনের। মার্কিন কোম্পানী ইউনিকলের সাথে সম্প্রতি গ্যাস চুক্তি স্বাক্ষর ও চট্টগ্রামে বেসরকারীভাবে আমেরিকান পোর্ট নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে যার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে।

অন্যদিকে ভারতের সাথে পানি চুক্তি, ট্রানজিট চুক্তি, বাস চলাচল চুক্তি, অসম বাণিজ্য এবং অঘোষিতভাবে সীমান্ত উন্মুক্ত করে দেওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের উপরে ভারতের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এখন ভারত, আমেরিকা ও চীনের ত্রিমুখী হামলার সম্মুখীন। অতএব মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি, স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী ইত্যাকার লকব ছুঁড়ে ফেলে সত্যিকারের দেশপ্রেমিক শক্তিকে ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

ইতিমধ্যে নতুন এক খবর আমাদেরকে ভাবিয়ে তুলেছে। গত ৮ই মার্চ সোমবার তথাকথিত বিশ্ব নারী দিবসে দিনাজপুরের হিলি চেকপোস্টের নিকটে হাকিমপুর কলেজ ময়দানে বাংলাদেশের ২৫টি এনজিও এবং পশ্চিমবঙ্গের ২টি এনজিও নারী সংগঠনের ব্যানারে উভয় দেশের প্রায় দু'হাযার মহিলা মিছিল করে হিলি চেকপোস্টে সমবেত হয় এবং এ সময় তারা নারী মুক্তির শ্লোগানের বদলে 'দু' বাংলা এক হও' শ্লোগান দেয়। বাংলাদেশের 'প্রশিকা' এনজিও-র কেন্দ্রীয় নারী-পুরুষ সমন্বয় কোষ-এর প্রধান ফৌযিয়া খন্দকার ইভার সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত নারী সম্মেলনে উভয় বাংলাকে এক করার

দাবীতে বক্তৃতা করেন, পল্লীশ্রী-র শামীম আরা বেগম, মহিলা পরিষদের মুনীরা খান, এডাব-এর কেন্দ্রীয় সদস্য শাহ-ই মুবীন জিন্নাহ, তৃণমূল নেত্রী মাকছূদা বেগম ও দিনাজপুর যেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা গুলনাহার মোহসিন। উক্ত সম্মেলনের পূর্বে কলিকাতা কেন্দ্রিক নারী মুক্তি সংগঠন 'স্বয়াস' ও 'মৈত্রী'র সভানেত্রী যথাক্রমে অনুরাধা কঙ্কর ও অচিন্তা পাঠকের নেতৃত্বে সকালে ভারত সীমান্তের মধ্যে নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর উভয় দেশের দু'হাযারের অধিক নারী উভয় দিক থেকে এসে চেকপোস্টে সমবেত হয়ে ফুলের তোড়া বিনিময় করে। ... এ সময় হিলি চেকপোস্ট উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং সকলে এসে হাকিমপুর কলেজ মাঠে সমাবেশে যোগদান করে। উক্ত নারী সম্মেলনকে সফল করার জন্য প্রশিকা, তৃণমূল ও এডাব ছাড়াও দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, গাইবান্ধা ও জয়পুরহাট যেলার পঁচিশটির মত এনজিও থেকে পাঁচ হাযারেরও অধিক নারীর সমাবেশ ঘটে।

প্রশ্ন হ'ল : প্রকাশ্যভাবে সারাদিন স্বচ্ছন্দে বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থল বন্দরে এতবড় একটা রাষ্ট্রঘাতী সম্মেলন হ'ল, তুখোড় বক্তৃতা হ'ল, 'দিলে দিলে দিল লাগি' হ'ল, তার কোন খবরই কি সরকার রাখেন না? স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী, মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি, সরকারী গোয়েন্দা বাহিনী, নিদেনপক্ষে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সদস্যদের কারও নযরে পড়ল না? কি সরকারী দল কি বিরোধী দল এযাবত এর বিরুদ্ধে কোন বিবৃতি কিংবা তারা কোনরূপ ব্যবস্থা নিয়েছে বলে জানা যায়নি। সমাজকল্যাণের নামে এইসব এনজিওগুলো বছরের পর বছর ধরে এদেশে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে, সরকার কি তা মোটেই বুঝতে পারেন না? গত ২০শে মার্চ থেকে সপ্তাহব্যাপী আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের সফর উপমহাদেশে একটি অনাসৃষ্টি কাণ্ড ঘটিয়ে গেল। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে গেলেন যে, আমেরিকা এখন ভারতের সাথে। অতএব উপমহাদেশের যেসব দেশ ভারতের সাথে থাকবে, আমরা তাদের সাথে আছি। বাংলাদেশে তিনি এলেন মাত্র ১০ ঘণ্টার জন্য স্রেফ সৌজন্য সফরে। আর পাকিস্তানে গেলেন ৫ ঘণ্টার জন্য কেবল তাদেরকে শাঁসিয়ে দিতে যে, সাবধান! কাশ্মীর নিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করো না। মানবাধিকারের স্বঘোষিত এই সোল এজেন্ট কাশ্মীরে মানবাধিকার লংঘনকারী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করেননি।

গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী নামাংকিত আমেরিকার উদ্যোগেই ১৯৪৮-৪৯ সালে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীরে গণভোট অনুষ্ঠানের প্রস্তাব গৃহীত হয়। অথচ আজ সেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে খ্যাত ভারতের জন্ম থেকে বিতর্কিত কাশ্মীর রাজ্যে গণভোট অনুষ্ঠানের কথা বলতে সাহস পেলেন না। অথচ পাকিস্তানী সামরিক নেতাকে সেদেশে তাড়াতাড়ি নির্বাচন দেওয়ার অঙ্গীকার আদায় করে ছাড়লেন। কাশ্মীরী মুক্তিযুদ্ধকে তিনি বলে গেলেন 'সন্ত্রাস'। আফগান জনগণ দীর্ঘ ১০ বছর যাবত হানাদার রুশদের বিরুদ্ধে আমেরিকার সহায়তায় যখন যুদ্ধ চালিয়েছিল, তখন তারা ছিল আমেরিকার ভাষায় 'ফ্রীডম ফাইটার' বা 'মুক্তিযোদ্ধা'। কিন্তু সোভিয়েতের পতনের পর ঐ মুক্তিযোদ্ধারাই এখন আমেরিকার চোখে হয়ে গেছে মৌলবাদী সন্ত্রাসী। আমেরিকার এই দ্বৈত নীতি সম্পর্কে হুঁশিয়ার থেকেই দেশের নেতৃবৃন্দকে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের গ্যারান্টি বহাল রাখার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে যোগ্য নেতৃবৃন্দ দান করুন- যারা দেশের স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হবেন। আমীন![১০৬]

৫৬. ভৌগলিক ও ঈমানী প্রতিরক্ষা চাই

দেশের প্রতিরক্ষা খাত ও মাদরাসা শিক্ষা খাতে বাজেট হ্রাসের প্রস্তাব এসেছে এদেশেরই কিছু বুদ্ধিজীবী ও এনজিও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে। সরকারী পদক্ষেপ শুরু হয়েছে অনেক আগে খানিকটা অঘোষিতভাবেই। ১৯৯৭ সাল থেকে ২৫১টি মাদরাসার এমপিওভুক্তি বাতিল করা হয়েছে। আর এখন যোগ হচ্ছে মাদরাসা শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ হ্রাসের সুফারিশ। শোনা যাচ্ছে উপমহাদেশের ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শিক্ষাগার কলিকাতা আলিয়া মাদরাসাটিও বন্ধের পাঁয়তারা চলছে। ওদিকে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যয় কমানোর জন্য যুক্তি দেখানো হচ্ছে যে, আমরা বিশ্বের ৪র্থ সমরশক্তির অধিকারী ভারতবেষ্টিত একটি ছোট্ট দুর্বল দেশ। ভারতের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ করে টিকে থাকার প্রশ্নই ওঠেনা। অতএব সামরিক বা প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি স্রেফ অপচয় ছাড়া কিছু নয়। যদি সেনাবাহিনী রাখতেই হয়, তাহলে ছোট আকারে রাখলেই চলে। যারা বন্যা ইত্যাদি দুর্যোগকালীন সময়ে জাতির সেবা করবে'...।

---

১০৬. ৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, এপ্রিল ২০০০।

বিশ্বের অভুক্ত মানুষের অর্ধেকেরই বসবাস যে ভারতে, সেই দরিদ্রতম দেশটির নেতারা যখন নিজেদের জনগণকে অভুক্ত রেখে এবারের প্রতিরক্ষা বাজেট ২৮% বৃদ্ধি করেছে, তখন আমাদের নেতারা প্রতিরক্ষা বাজেট হ্রাসের চিন্তায় ব্যাকুল। চার্চিলের ভাষায় 'যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকাই হ'ল শান্তিতে বসবাসের অন্যতম গ্যারান্টি'। ভারত বড় সমরশক্তি বলে আমাদের হাত-পা গুটিয়ে তাদের করুণা ভিক্ষা করে জীবন কাটাতে হবে, এরূপ চিন্তা যারা করেন, তাদের জানা উচিত যে বদ্ধ ঘরে একটি বিড়ালকে আক্রমণ করলেও সে তীব্রভাবে রুখে দাঁড়ায় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে জয়ী হয়। ভারত তার চারপাশে শত্রুবেষ্টিত। পাকিস্তান, নেপাল, মহাচীন, মায়ানমার ছাড়াও তার ঘরেই রয়েছে কাশ্মীর, পাঞ্জাব এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সাত বোন রাজ্য সমূহে স্বাধীনতার তৎপরতা। এসবের জন্য সে সদা সন্ত্রস্ত। এরপরে আবার বাংলাদেশকে গ্রাস করার দুঃসাহস সে পাবে কোথায়? তবে হ্যাঁ, যদি আমাদের শক্তিশালী সামরিক অবকাঠামো না থাকে, তাহ'লে সে হায়দরাবাদ, জুনাগড়, মানভাদর ও সিকিম দখলের মত ভীতি সৃষ্টিকারী কূটনীতির মাধ্যমে যেকোন সময়ে বাংলাদেশকে গ্রাস করে নিতে পারে। বলা বাহুল্য এই পলিসিই সে শুরুতে নিয়েছিল যুক্তিযুদ্ধকালীন গোপন সাতদফা চুক্তির মাধ্যমে। তৎকালীন প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ভারতের সাথে গোপনে ২৫ বছরের এই গোলামী চুক্তি প্রণয়ন করেন। যাতে স্বাক্ষর দিয়ে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। এ চুক্তির ধারায় বলা হয়েছিল যে, বাংলাদেশের কোন নিজস্ব সেনাবাহিনী থাকবে না। মুক্তিবাহিনীকে কেন্দ্র করে একটি প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা হবে। যারা আভ্যন্তরীণ আইন-শৃংখলা রক্ষা করবে। আর পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সর্বদা ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে চলবে। এই ধরনের অধীনতামূলক চুক্তির কারণেই বাংলাদেশ স্বাধীনভাবে তার প্রতিরক্ষা নীতি আজও গড়ে তুলতে পারেনি।

আমরা বলতে চাই যে, বাংলাদেশকে তার ভৌগলিক ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে। এর পাশাপাশি দ্বিতীয় ডিফেন্স লাইনে থাকবে সুপ্রশিক্ষিত বিডিআর, আনছার, কোস্টগার্ড ইত্যাদি বাহিনী। তৃতীয়তঃ সেনাবাহিনী থেকে

অবসরপ্রাপ্তদেরকে রিজার্ভ ফোর্স হিসাবে তালিকাভুক্ত করে তাদের মাধ্যমে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও সাধারণ যুবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। এরপরেও থাকবে ক্যাডেট, এনসিসি, জুডো-কারাতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এবং সর্বোপরি ঈমানী চেতনা বৃদ্ধি ও জিহাদী জাযবা সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণকে সদা সচেতন ও সুদক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। যাতে হামলা এলেই ব্যাপক জনযুদ্ধের মুখে শত্রু লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যায়। যেভাবে পালিয়েছে ভিয়েতনাম থেকে আমেরিকা এবং আফগানিস্তান থেকে রাশিয়া। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে তাই নিজ দেশের সীমান্ত রক্ষার সাথে সাথে আর্থ-সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিজয়ের কৌশলও অবলম্বন করতে হবে।

দ্বিতীয় বিষয় হ'ল মাদরাসা শিক্ষার বাজেট হ্রাস প্রস্তাব। কিন্তু কারণ কি? এর প্রস্তাবক কারা? প্রস্তাবক হ'ল প্রশিকা, এডাব, সমন্বয় নামক চিহ্নিত কতগুলি এনজিও এবং ঐ অনুষ্ঠানে যোগদানকারী কয়েকজন সংসদ সদস্য। অর্থমন্ত্রীর কাছে তাদের একটি প্রতিনিধিদল গিয়ে নাকি সরাসরি প্রস্তাবও দিয়ে এসেছেন। শুধু এ সরকার নয়, বিগত সরকারের আমলেও আমরা এ ধরনের তৎপরতা লক্ষ্য করেছি। কেন জানি সরকারী লোকেরা মাদরাসা শিক্ষাকে 'জাল' বলতে আনন্দ পান। এটার মধ্য দিয়ে ১৯৩৬ সালে লর্ড মেকলের সেই বক্তব্যের বাস্তব প্রমাণ মেলে। যেখানে তিনি বলেছিলেন, We must at present do our best to form a class, who may be interpreters between us and millions, whom we govern, a class of persons, Indian in blood and colour but English in taste, in openion, in morals and intellect. অর্থাৎ বর্তমানে আমাদের সর্বাধিক চেষ্টা করতে হবে, যাতে এমন একটি গোষ্ঠী সৃষ্টি করা যায়, যারা আমাদের ও আমাদের লক্ষ লক্ষ প্রজার মধ্যে দূত হিসাবে কাজ করতে পারে। এরা রক্তে ও বর্ণে হবে ভারতীয়। কিন্তু মেযাজে, মতামতে, নৈতিকতা ও বুদ্ধিবৃদ্ধিতে হবে ইংরেজ'। বৃটিশ মন্ত্রী গ্লাডস্টোন স্পষ্ট করেই বলেছিলেন, So long as the Muslims have the Quran, We shall be unable to dominate them. We must either take it from them or make them lose their love at it. অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানেরা কুরআনকে আঁকড়ে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে দমানো বা পরাভূত করা সম্ভব হবে না। তাই হয় তাদের থেকে কুরআনকে কেড়ে নিতে হবে, না হয় তাদের হৃদয় থেকে কুরআনের প্রতি ভালোবাসাকে মুছে দিতে হবে'।

মুসলমানের ঈমানী শক্তির মূল উৎস তারা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই তাদের বশংবদ গোলাম বানানোর ও জাতিকে স্থায়ীভাবে বিভক্ত করার জন্য ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষা নামে তারা দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেন। যা আজও এদেশে চালু আছে। সেই সঙ্গে সমাজকল্যাণের নামে গরীব জনসাধারণকে ঋণের জালে আটকিয়ে ও ঋণদানের টোপ দিয়ে তাদেরকে খ্রিষ্টান বানানোর দূরদর্শী পরিকল্পনা বেশ সফলভাবেই এগিয়ে চলেছে। বলা আবশ্যক যে, মুসলমানের ঈমানী শক্তিকে উজ্জীবিত রাখার কেন্দ্র হ'ল মাদরাসা সমূহ। আর একারণেই ইসলাম বিরোধীদের টার্গেট হ'ল 'মাদরাসা'। দেশের স্বাধীনতার গ্যারান্টি হ'ল ঈমানী শক্তি। আর সেই শক্তিকেন্দ্রকে ধ্বংস করার অর্থই হ'ল দেশের স্বাধীনতা যারা চায়না, তাদের হাতকে শক্তিশালী করা।

দেশের নেতাদের পিছনের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। কামাল পাশা যখন আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা নিয়ে বিব্রত, সেই অবস্থায় বৃটিশ নেতা লর্ড কার্জন প্রস্তাব করেন, 'যদি তুরস্ক নিজ হাতে ইসলামের সাথে তার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং সমস্ত মূল্যবোধ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়, তবেই তারা আমাদের সাথে যথার্থভাবে একাত্ম হবে... এবং এরপরে তারা যা চায় তাই-ই পাবে'। মোস্তফা কামাল তাতেই সায় দিলেন। লর্ড কার্জন খুশীতে গদগদ হয়ে সেদিন বলেছিলেন, 'আসল কথা হ'ল তুর্কীরা আর কোনদিনও তাদের আগের শক্তি ফিরে পাবে না। কেননা তাদেরকে আমরা ভিতর থেকে হত্যা করেছি'। যে ওছমানী খেলাফত (১৩০০-১৯২৪ খৃঃ) সোয়া ছয়শত বছর ক্ষমতায় থেকে ভিয়েনা পর্যন্ত দখল করে ইউরোপের অন্তঃস্থলে পৌঁছে গিয়েছিল, সেই মহাশক্তিধর একটি শাসনশক্তিকে ধর্মনিরপেক্ষতার বিষ দিয়ে চিরদিনের মত ইতিহাস থেকে মুছে দিয়েছিল ইংরেজরা কোনরূপ সামরিক শক্তি প্রয়োগ ছাড়াই নামধারী মুসলিম নেতা মোস্তফা কামালের মাধ্যমে। এই ব্যক্তিকেই আবার উপাধি দেওয়া হ'ল 'আতাতুর্ক' বলে। যার অর্থ 'তুর্কী জাতির পিতা'। অথচ তিনি ছিলেন তুর্কী খেলাফত ধ্বংসকারী ব্যক্তি। আমাদের সেই ফেলে আসা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিৎ।

পরিশেষে বলব, ভৌগলিক প্রতিরক্ষার জন্য যেমন শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রয়োজন, জাতির ঈমানী চেতনা উজ্জীবিত রাখার জন্য তেমনি প্রয়োজন উন্নত মাদরাসা শিক্ষার। সেই সাথে প্রয়োজন কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক

সমন্বিত সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা। আল্লাহ আমাদের ঈমানী চেতনা ও ভৌগলিক স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখুন- আমীন![১০৭]

৫৭. অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ!

সম্প্রতি বিভিন্ন বুদ্ধিজীবীর লেখায় এবং রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের বক্তৃতায় সাম্প্রদায়িকতামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার শোনা যাচ্ছে। এর দ্বারা তারা ইসলাম মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার পরোক্ষ ইঙ্গিত দিতে চান। তাঁদের বক্তৃতা ও লেখনী দৃষ্টে একথা খোলামেলা হয়ে গেছে যে, যেহেতু ইসলামী নৈতিকতা মানুষকে স্বেচ্ছাচারে বাধা দেয়, সেহেতু ইসলামকে ব্যক্তি ও বৈষয়িক জীবন থেকে বিদায় করতে পারলেই যা ইচ্ছা তাই করার অবাধ লাইসেন্স পাওয়া যায়। কিন্তু কে না জানে যে, নিয়ন্ত্রণহীন মোটরগাড়ী খাদে পড়ে এক্সিডেন্ট করতে বাধ্য। অনুরূপভাবে নিয়ন্ত্রণহীন জীবন নিশ্চিত ধ্বংস ও অশান্তির কারণ হ'তে বাধ্য। অবশ্য এখানে গিয়ে তারা মানবিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখার কথা বলেছেন। যদিও 'মানবিক মূল্যবোধ' বলতে কি বুঝায়, তার যথার্থ মানদণ্ড কি এবং এই মূল্যবোধ টিকিয়ে রাখার জন্য চিরন্তন নীতিমালা কি- এসবের কোন জবাব তাদের কাছে নেই। সেজন্যই দেখা যায় এইসব কথিত অতি উদার ও অসাম্প্রদায়িক লোকেরা স্ব স্ব চিন্তা মতে কিংবা অপরের অনুকরণে নানাবিধ অযৌক্তিক কর্মকাণ্ড করে থাকেন। যার প্রায় সবটুকুই বিলাস কল্পনার ফসল ছাড়া কিছুই নয়। উদাহরণ স্বরূপ অতি পরিচিত কিছু বিষয় পেশ করা যেতে পারে। যেমন- বিগতদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নামে ও ভাস্কর্যের বা শিল্পের নাম করে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ, শিখা অনির্বাণ, শিখা চিরন্তন, স্বাধীনতা সৌধ, অপরাজেয় বাংলা, 'সাবাস বাংলাদেশ' নির্মাণ, নেতা-নেত্রীদের ছবি ও চিত্র অংকন ও তা অফিসে-আদালতে, ঘরে-বৈঠকখানায় ও দর্শনীয় স্থানে টাঙ্গিয়ে রাখা, তাতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, তার সম্মানে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন, নগ্নপদ প্রভাত ফেরী, পহেলা বৈশাখে বানর-হনুমান, সাপ-হুতোম পেঁচার মুখোশ পরিধান, রাস্তায় বসে শানকিতে করে ইলিশ-পান্তা ভক্ষণ, প্রগতির নামে নারী-পুরুষের স্বাভাবিক লজ্জার বাঁধন ছিন্ন করার যাবতীয় কলা-কৌশল অবলম্বন,

১০৭. ৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, জুন ২০০০।

মেয়েদেরকে পুরুষের পাশাপাশি সকল কাজে অংশগ্রহণে প্ররোচনা দান, ক্ষমতায়নের নামে তাদেরকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ও শাসন বিভাগের বিভিন্ন স্তরে পুরুষের পাশাপাশি সংখ্যানুপাতিক সুযোগ দানের ব্যবস্থাকরণ, যেনা-ব্যভিচারের মত চিরন্তন ঘৃণ্য বিষয়টিকেও 'ফ্রি সেক্স' বা অবাধ যৌনাচারের নামে এবং দেহ ব্যবসায়ে নিয়োজিত পতিতাদেরকে 'যৌনকর্মী' আখ্যায়িত করে এটাকেও মর্যাদাকর বৈধ ব্যবসার সম্মান প্রদানের চেষ্টা, আধুনিক সাহিত্যের নামে যৌন সুড়সুড়িমূলক গান, নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি পর্ণো ও কু-সাহিত্য রচনা, ছবি ও চলচ্চিত্র শিল্পের নামে সিনেমা-থিয়েটার ও টিভি পর্দায় নারী-পুরুষের ঢলাঢলি ও আদিম রসের ছড়াছড়ি, বাসে-ট্রেনে ও বৈঠকাদিতে বসে বিলাসভঙ্গিতে বিড়ি-সিগারেটের বঙ্কিম ধোঁয়া উদগীরণ, রাজধানীর ও বড় বড় শহরের বিশেষ হোটেলগুলিতে কিংবা তথাকথিত মডেল টাউনগুলির কারুকার্যখচিত প্রাসাদোপম অট্টালিকা সমূহের হল রুমের নিয়নবাতির আলো-আঁধারীর নীচে অনুষ্ঠিত 'জংলী রাত'গুলিতে পারস্পরিক বধু বিনিময়, বলড্যান্স ও অবশেষে মদে চুর হয়ে অবাধ যৌনাচারে লিপ্ত হওয়া ছাড়াও রয়েছে বলতে না পারা বহু কিছু পশ্বাচরণ।

প্রশ্ন ওঠে সাম্প্রদায়িকতা বলতে কি বুঝায়? এর অর্থ যদি নির্দিষ্ট ধর্মীয় দলীয়তা হয়, তাহ'লে মুসলমান সহ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়কে বাংলাদেশ ছাড়তে হবে। অথবা তাদেরকে স্ব স্ব ধর্ম ত্যাগ করে ধর্মহীন হ'তে হবে। আর যদি সাম্প্রদায়িকতা বলতে রাজনৈতিক দলীয়তা বুঝানো হয়, তাহ'লে তো বন্ধুদের দিন-রাতের সাধনা তথাকথিত গণতন্ত্রের জয়গান বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ গণতন্ত্রের নামে সরকারী ও বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক সন্ত্রাসে সমাজ রসাতলে যেতে বসেছে। প্রচলিত দলতান্ত্রিক সাম্প্রদায়িকতার হিংস্র ছোবল থেকে বাঁচার জন্য মানুষ অন্যত্র পথ খুঁজছে। তাহ'লে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ কি কেবলই একটা শ্লোগান মাত্র? কেবলই ইউটোপিয়া? আসলে বন্ধুরা কি চান তারা নিজেরাই জানেন না। সাম্প্রদায়িকতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা ইত্যাকার শব্দগুলি কম্যুনিস্ট নামধারীরা এক সময় খুবই বলতেন। অথচ এটা যে স্রেফ ধোঁকাবাজি ছিল, সেকথা আজ প্রমাণিত সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে কম্যুনিজমের স্বর্গভূমি রাশিয়া, চীন ও তাদের সমগোত্রীয় রাষ্ট্রগুলিতে।

প্রত্যেক ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া আছে। আগুনে হাত দেওয়াটা ক্রিয়া, পুড়ে যাওয়াটা প্রতিক্রিয়া। পানিতে হাত দেওয়াটা ক্রিয়া, ভিজে যাওয়াটা প্রতিক্রিয়া। লোহার প্রতি চুম্বকের আকর্ষণ তার স্বাভাবিক ক্রিয়া, দু'য়ের মিলন হ'ল প্রতিক্রিয়া। নারী ও পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণ লোহা ও চুম্বকের ন্যায় স্বাভাবিক ক্রিয়া। দূরে রাখলে বা পর্দার মাধ্যমেই কেবল এর প্রতিক্রিয়া হ'তে মুক্ত থাকা সম্ভব। যেমন নেগেটিভ-পজেটিভ দু'টি ক্যাবলের একত্র ব্যবহার তখনই সম্ভব হয়, যখন উভয় ক্যাবলে লাল বা কালো নিরাপদ কভার দিয়ে মুড়ে রাখা হয়। নইলে উভয়ের স্পর্শের প্রতিক্রিয়ায় সাথে সাথে এক্সিডেন্ট সুনিশ্চিত।

তথাকথিত উদারতাবাদী অসাম্প্রদায়িক ভাইয়েরা উপরোক্ত স্বভাবজাত বিষয়গুলিকে বিশেষ করে নারী-পুরুষের পারস্পরিক লজ্জাবোধ ও পর্দা-পুশীদার বিষয়টিকে কঠিনভাবে অস্বীকার করতে চান এবং এটাকে দারুণ প্রতিক্রিয়াশীলতা বলতে চান। যদিও তাঁরা নিজেরাও পারেন না নিজের স্ত্রী ও যুবতী কন্যাকে এক করে দেখতে। স্বভাবজাত প্রতিক্রিয়া তাদের মধ্যেও হয়ে থাকে। কেননা চেতনাহীন বা প্রাণহীন লাশেরই কেবল প্রতিক্রিয়া হয় না। বাকী সবেরই মধ্যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া থাকবে-এটাই স্বাভাবিক। জগত সংসারের এই স্বাভাবিক বিষয়টি অস্বীকার করে কোন মতবাদ চলতে পারে না। বিশ্বচরাচরের সৃষ্টিকর্তা হ'লেন আল্লাহ। বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যকার স্বভাবের ভিন্নতা সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ। মানুষের মধ্যে চেতনা, জ্ঞান ও কর্মশক্তির দ্যোতনা সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ। মানুষের সমাজ পরিচালনার বিশ্বজনীন বিধান প্রেরণ করেছেন আল্লাহ। 'লওহে মাহফূযে' সংরক্ষিত সর্বশেষ সেই বিশ্ববিধান নাযিল হয়েছে 'কুরআন' রূপে। যার বাস্তব ধর্মীয় ও সামাজিক রূপ হ'ল 'ইসলাম'। ইসলামী শরী'আত অনুযায়ী জীবন যাপন করার মধ্যেই রয়েছে মানুষের পারস্পরিক অধিকার রক্ষার গ্যারান্টি। রয়েছে সামাজিক স্থিতিশীলতা ও শান্তি-সমৃদ্ধির চাবিকাঠি। রয়েছে স্বাভাবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যকার সামঞ্জস্য বিধানের চিরন্তন মূলনীতি।

বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায় আল্লাহ্রই সৃষ্টি। এই সৃষ্টির উদ্দেশ্য হ'ল পারস্পরিক পরিচিতি *(হুজুরাত ৪৯/১৩)*। মানুষ হিসাবে সকলের অধিকার সমান। সকলেই এক আদম ও হাওয়ার সন্তান। মর্যাদার মানদণ্ড হ'ল স্রেফ তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি। কেননা আল্লাহভীতিই হ'ল প্রকৃত মানবিক মূল্যবোধ সমুন্নত

রাখার একমাত্র হাতিয়ার। তাই অসাম্প্রদায়িক বলতে যদি সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল বনু আদমের প্রতি সমান ব্যবহার ও ন্যায়বিচার বুঝায়, তবে তা কেবল আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধান নিঃশর্তভাবে মেনে চলার মাধ্যমেই সম্ভব। আল্লাহ সৃষ্ট আলো বাতাস যেমন সবার জন্য মঙ্গলময়, আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধান তেমনি সবার জন্য কল্যাণকর। আল্লাহ সৃষ্ট প্রাকৃতিক বিধান আমরা ইচ্ছায়–অনিচ্ছায় মেনে চলতে বাধ্য হচ্ছি। কিন্তু ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকায় আমরা তাঁর প্রেরিত অহি-র বিধান আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মেনে চলতে ব্যর্থ হচ্ছি। আর সেকারণেই মানুষের জীবনে নেমে আসছে ক্রমাগত অশান্তির দাবদাহ। সৃষ্টি হয়েছে সাম্প্রদায়িক-অসাম্প্রদায়িকের অবান্তর বিতর্ক। আমরা কি আল্লাহ্র বান্দা হিসাবে সকল মানুষকে মানুষ হিসাবে ভাবতে পারি না? আমরা কি পারিনা নেককার বান্দাদেরকে ভাই হিসাবে বুকে টেনে নিতে? আল্লাহভীরু সৎ মানুষগুলোই কি সমাজের স্তম্ভ নয়? হৌক সে বাঙ্গালী, হৌক সে বিহারী-পাঞ্জাবী, হৌক সে আফগান বা আমেরিকান, আল্লাহভীরু হ'লে সে আমার ভাই। এই দর্শনই কেবল মানব সমাজের ভেদাভেদ দূর করতে পারে। তাই অসাম্প্রদায়িক নয়, চাই তাক্বওয়াশীল বাংলাদেশ। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন![১০৮]

৫৮. দেশ ধ্বংসে সর্ববৃহৎ অস্ত্রের চালান : হিংসাত্মক রাজনীতির ফল

গত ১লা এপ্রিল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে চট্টগ্রামে ইউরিয়া সার কারখানার জেটিতে নোঙর করা দু'টি ট্রলারে ৫০০০ আগ্নেয়াস্ত্র, ২৫০০০ গ্রেনেড , সাড়ে ১১ লাখ গুলীসহ সর্বসাকুল্যে ১০ ট্রাক সর্বাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদের বিশাল একটি অবৈধ চালান ধরা পড়েছে। যা শুধু বাংলাদেশের ইতিহাসে নয়, বরং পৃথিবীর ইতিহাসে নযীরবিহীন বলে মন্তব্য করেছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ। গত বছর বগুড়ার কাহালুতে ধরা পড়েছিল লক্ষাধিক গোলাবারুদের একটি বিশাল চালান। সেটাও ছিল স্মরণকালের বৃহত্তম। সেটা পাওয়া গিয়েছিল স্থানীয় এক রাজনৈতিক নেতার বাড়ীতে। হয়তোবা সেখানে কোন বড় মাপের শক্তিশালী নেতার গোপন কানেকশন ছিল, কিংবা ভয়ংকর কোন বিদেশী শক্তির রক্তচক্ষুর ভয় ছিল। ফলে ওটা ধামাচাপা পড়ে গেছে। জাতীয় দৈনিকগুলিও কোন অদৃশ্য সুতোর টানে ঐ ব্যাপারে এখন মুখে কুলুপ

১০৮. ৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জানুয়ারী ২০০২।

এঁটে বসেছে। সেদিন সঠিক তদন্ত ও সুষ্ঠু বিচার হ'লে সম্ভবতঃ আজকের এ ঘটনা ঘটতো না। এবারও দেখা যাচ্ছে অস্ত্রবাহী দু'টি ট্রলারের একটির মালিক স্থানীয় এক রাজনৈতিক নেতা। এর আগেও তারা হয়তোবা কয়েক চালান এনেছে। নিশ্চয়ই সব দিক ম্যানেজ করেই তারা একাজ করেছিল। নইলে এত অস্ত্র এত ভিতরে নির্দ্বিধায় আনার সাহস কিভাবে হ'ল? উদ্ধারকৃত অস্ত্রের অংশ মাত্র ব্যবহার করেও অন্যান্য দেশে ইতিপূর্বে সহিংসভাবে সরকার পতন ঘটানো হয়েছে। যেমন ১৯৫৯ সালে কিউবার সরকার পতন ঘটানো হয়েছিল। তবুও দেশপ্রেমিক সাধারণ জনগণের দো'আ ও আল্লাহ্র বিশেষ রহমত আছে বলেই স্থানীয় কোস্টগার্ড ও পুলিশ বাহিনী এ চালানটি ধরতে সক্ষম হয়েছে। অতএব সর্বপ্রথম সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। যিনি তাঁর এক বান্দার মাধ্যমে গোপন সংবাদ দিয়ে এ বিরাট বিপর্যয় থেকে দেশকে রক্ষা করেছেন। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ*। এর দ্বারা আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, পুলিশ বাহিনীকে দুর্নীতির শীর্ষে বলা হ'লেও তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে দেশপ্রেমিক ও আল্লাহভীরু কিছু সদস্য ও কর্মকর্তা আছেন, যারা নিজেদের জীবনের বিনিময়ে হ'লেও দেশ ও জাতির স্বার্থে কাজ করেন। যেসকল কোস্টগার্ড ও পুলিশ সদস্য এ মহতী ও দুঃসাহসিক কাজে খালেছ অন্তরে কাজ করেছেন, আমরা তাদের জন্য খাছ দো'আ করি। আল্লাহ যেন তাদেরকে পরকালে উত্তম জাযা দান করেন। সরকারকেও বলব তাদেরকে পুরস্কৃত করার জন্য, যাতে তারা উৎসাহিত হন। পক্ষান্তরে কর্ণফুলী থানার ওসি ও তার সহযোগী বাহিনী যারা দাঁড়িয়ে থেকে অস্ত্র খালাস করাচ্ছিল, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হৌক।

প্রশ্ন ওঠে, দেশকে এভাবে বারবার হুমকির মুখে ফেলা হচ্ছে কেন? কারা এগুলি করছে? সম্ভাবনার কথা শোনা গেলেও কতগুলি মৌলিক বিষয়ে আমরা একমত হতে পারি। সেটি এই যে, দেশকে হুমকির মুখে ফেলছে তারাই যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে মেনে নিতে পারেনি। দ্বিতীয় প্রশ্ন : কারা এগুলি করছে? এর সোজা জবাব এই যে, একাজ তারাই করছে, যারা সরকারের বৈরী শক্তি। যারা সরকারের ভিতরেরও হ'তে পারে, বাইরেরও হ'তে পারে। তবে এটা যে দেশের বর্তমান হিংসাত্মক রাজনীতির ফল, এটা নিশ্চিতভাবেই বলা চলে।

এক্ষণে এইসব রাজনৈতিক হিংসা-প্রতিহিংসা থেকে বাঁচার উপায় কি? এর জবাব এই যে, এসব থেকে বাঁচার উপায় কারু নেই। শয়তান যেহেতু মানুষের

রগ-রেশায় বিচরণ করে, সেহেতু ষড় রিপুর হামলা থেকে ব্যক্তি ও দেশ মুক্ত হবে না কখনোই। তবে একে দমিয়ে রাখার ব্যবস্থা ইসলামে রয়েছে। প্রথমতঃ যেসব কাজ করলে হিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে, তা থেকে বিরত থাকতে হবে। দ্বিতীয়তঃ নাশকতা সৃষ্টিকারী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আইন প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু এগুলি কিভাবে সম্ভব?

এ বিষয়ে আমাদের পরামর্শ : মেয়াদভিত্তিক ক্ষমতা দখলমুখী রাজনীতির পরিবর্তে নৈতিকতা ও ন্যায়নিষ্ঠা ভিত্তিক জনকল্যাণমুখী রাজনীতি চালু করতে হবে। যাতে সর্বোচ্চ আদালতে অপরাধী প্রমাণিত হ'লে মেয়াদ পূর্তির আগেই সরকার পদত্যাগে বাধ্য হয়। কোনরূপ হরতাল, গণঅভ্যুত্থান বা সশস্ত্র অভ্যুত্থান প্রয়োজন না হয়। একই সাথে সরকারী ও বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে। যাতে একজন ক্ষমতায় গেলে অন্যজন হিংসায় জ্বলতে না পারে এবং সশস্ত্র নাশকতায় লিপ্ত না হ'তে পারে। ২- দেশের পুলিশ ও বিচার বিভাগকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ রাখতে হবে। যাতে তারা যেকোন সময় যেকোন অপরাধীকে নির্দ্বিধায় ধরতে ও বিচার করতে সমর্থ হয়।

সবশেষে দেশের প্রশাসনের প্রতি অনুরোধ : আল্লাহভীরু হৌন, বিদেশভীরু হবেন না। দেশ ও জনগণের স্বার্থেই আপনারা প্রশাসনে আছেন, বিদেশীদের স্বার্থ দেখার জন্য নয়। জন্মেছেন একদিন, মরবেনও একদিন। দেশ ও জনগণের স্বার্থে কাজ করতে গিয়ে যদি বিদেশী চক্রের গুলীর খোরাক হ'তে হয়, তবুও চিরকাল আপনারা জনগণের হৃদয়ের মুকুট হয়ে থাকবেন। মনে রাখবেন, 'ক্বিয়ামতের দিন সবচেয়ে বড় খেয়ানতের পতাকা উড়ানো হবে, বিশ্বাসঘাতক শাসকের জন্য'।[১০৯] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'মুসলমানদের কোন কর্তৃপক্ষ তাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়ে যদি খেয়ানতকারী হিসাবে মৃত্যুবরণ করে, তবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেন'।[১১০] পক্ষান্তরে 'ন্যায়পরায়ণ শাসকগণ আল্লাহ্র নিকটে তাঁর ডান পার্শ্বে নূরের আসনে বসবেন'।[১১১]

---

১০৯. মুসলিম হা/১৭৩৮; মিশকাত হা/৩৭২৭ 'নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায়।
১১০. মুসলিম হা/১৪২; বুখারী হা/৭১৫১; মিশকাত হা/৩৬৮৬ 'নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায়।
১১১. মুসলিম হা/১৮২৭; মিশকাত হা/৩৬৯০ 'নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায়।

পরিশেষে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব এবং সর্বোপরি ইসলামের এ নিরাপদ দুর্গটিকে রক্ষায় জীবন বাজি রেখে দাঁড়িয়ে যাবার জন্য আমরা সরকার ও জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাই। আল্লাহ আমাদের দেশকে হেফাযত করুন- আমীন![১১২]

৫৯. বিরোধী নেত্রীর জনসভায় গ্রেনেড হামলা : দেশপ্রেমিকগণ সাবধান!

গত ২১শে আগস্ট শনিবার বিকাল ৫.২২ মিনিটে ঢাকায় আওয়ামী লীগ আয়োজিত বিক্ষোভ-পূর্ণ সমাবেশে বিরোধী দলীয় নেত্রীর* বক্তৃতা শেষে তাঁর ট্রাক-মঞ্চ লক্ষ্য করে পরপর ১২/১৪টি শক্তিশালী গ্রেনেড হামলায় ১৪ জন নিহত ও তিন শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছেন। দুই পা হারিয়ে মর্মান্তিকভাবে আহত মহিলা আওয়ামীলীগ সভানেত্রী ও প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা জিল্লুর রহমানের স্ত্রী মিসেস আইভি রহমান সহ এ যাবত নিহতের সংখ্যা ১৮ জন বলে পত্রিকান্তরে প্রকাশ। যে স্থানের নাম 'গুলিস্তান' অর্থাৎ ফুল বাগিচা, তা সেদিন রক্তের নহরে পরিণত হয়েছিল। চোখের পলকে এতগুলো প্রাণ ঝরে পড়লো, এতগুলো মানুষ রক্তাক্ত ও পঙ্গু হ'ল, কত মায়ের বুক খালি হ'ল, কত স্ত্রী তার প্রাণপ্রিয় স্বামীকে হারালো, কত স্বামী তার প্রাণাধিক প্রিয়া স্ত্রীকে হারালো, কত বোন তার ভাইকে হারালো, কত সন্তান তার পিতাকে হারিয়ে পাগলপারা হ'ল, কত সংসার তাদের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে পথে বসলো, কত পঙ্গু প্রয়োজনীয় চিকিৎসার অভাবে ধুঁকে ধুঁকে মরবে ও সেই সাথে নিজের সংসারকে পঙ্গু করবে, ভিটে-মাটি বেঁচে নিঃশেষ হয়ে যাবে, তার হিসাব কে করবে? নিঃসন্দেহে এটি বাংলাদেশের রাজনীতিতে ১৯৭৫ পরবর্তী যুগের সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা। আমরা এই নারকীয় ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। আমরা দুঃখিত, মর্মাহত ও বেদনাহত। আমরা নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। সাথে সাথে প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদের অবিলম্বে চিহ্নিত করে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করছি। একই সাথে আমরা সরকারের অসতর্ক গোয়েন্দা বিভাগ ও দুর্বল নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করছি।

---

১১২. ৭ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা এপ্রিল ২০০৪।

কিন্তু জনমনে প্রশ্ন, কেন এমনটি হ'ল? বিরোধী নেত্রীর তাৎক্ষণিক জবাব, 'সরকার একাজ করেছে, প্রধানমন্ত্রী এক নম্বর খুনী। আমরা সরকারের পদত্যাগ চাই'। কারু বক্তব্য, দেশবিরোধী চক্রান্তে এটা ঘটেছে। প্রথমটি বিশ্বাস করা কঠিন এজন্য যে, কোন সরকারই দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চায় না। বিশেষ করে বিরোধী নেতৃবৃন্দকে একত্রে একই মঞ্চে প্রকাশ্য দিনমানে গ্রেনেড মেরে হত্যা করার মত নির্বুদ্ধিতা সরকার দেখাতে যাবে না বা এমন অকল্পনীয় রিস্ক নেবার দুঃসাহস সরকার দেখাবে না। বিশেষ করে সরকার যখন সিলেটে উপর্যুপরী বোমা হামলার কুল-কিনারা করতে না পেরে বিব্রতকর অবস্থায় রয়েছে এবং প্রলয়ংকারী বন্যার ক্ষত কাটিয়ে উঠতে রীতিমত হিমশিম খাচ্ছে। তবে শাসক হিসাবে সরকার উক্ত ঘটনার দায়-দায়িত্ব এড়াতে পারে না। সে হিসাবে অবশ্যই সরকারকে দায়ী করা চলে।

২য় বিষয়টি সত্য হওয়ার ব্যাপারে সচেতন মহলের ধারণা ক্রমেই প্রবলতর হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, এই দেশবিরোধী চক্রটি কে? কোন্ সে অপশক্তি, যে বাংলাদেশের স্বাধীন ও শক্তিশালী অস্তিত্বকে সহ্য করতে পারে না? কিছু লোক কথায় কথায় বলেন, ওরা হ'ল মৌলবাদী চক্র, যারা শুরু থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী ছিল। অথচ যারা একথা বলেন, তারা ভালভাবেই জানেন যে, পার্থ সাহাদের সৃষ্ট তথাকথিত মৌলবাদী বা জঙ্গীবাদী চরমপন্থীরা নয়, বরং সত্যিকারের ইসলামপন্থীরাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী। তারা ইসলামের স্বার্থেই এদেশের এক ইঞ্চি মাটির জন্য জীবন দেবে হাসিমুখে। যা অন্যদের দ্বারা সম্ভব নয়। এর দ্বিতীয় কারণ হ'ল এই যে, ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিদের জন্য পৃথিবীর সর্বত্র দুয়ার খোলা রয়েছে। কিন্তু প্রকৃত ইসলামপন্থীদের জন্য সকল দুয়ার বন্ধ। বিশেষ করে উপমহাদেশের কোথাও তাদের স্থান হবে না। তাই জানমাল সবকিছু কুরবানী দিয়ে হ'লেও এদেশের স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখা ও তাকে নিরংকুশ ও শক্তিশালী করা ভিন্ন তাদের সামনে আর কোন পথ খোলা নেই। ভুলে যাওয়া ঠিক নয় যে, স্বাধীন বাংলাদেশের মানচিত্র ইসলামের নামে অর্জিত পাকিস্তানের পূর্ব অংশের মানচিত্রের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এই মানচিত্রকে শুরু থেকেই মেনে নেয়নি উপমহাদেশের সেই আধিপত্যবাদী শক্তিটি, যে স্বাধীন বাংলাদেশকে তাদের

কথিত ‘মায়ের অঙ্গহানি’ বলে মনে করে। যারা বাংলাদেশের জন্মলগ্নেই পাকিস্তানীদের ফেলে যাওয়া হাযার হাযার কোটি টাকা মূল্যের সমরাস্ত্র সমূহ এবং দেশের বড় বড় শিল্প কারখানার মূল্যবান যন্ত্রপাতি সমূহ লুট করে নিয়ে শুরুতেই দেশটিকে পঙ্গু করে দেয়। অতঃপর ২৫ বছরের গোলামী চুক্তি করে এদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে দেয়।

অতঃপর অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে রাখার জন্য গঙ্গা ও তিস্তা সহ ৫৪টি অভিন্ন নদীর উজানে বাঁধ দিয়ে বাংলাদেশকে ইচ্ছামত বন্যায় ডুবিয়ে ও খরায় শুকিয়ে মারার ব্যবস্থা করেছে এবং বর্তমানে ‘আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প’ বাস্তবায়ন করলে দেশটিকে পুরোপুরি মরুভূমি বানিয়ে ফেলার চক্রান্ত পাকাপোক্ত হয়ে যায়। অতঃপর যার মর্মান্তিক ফল হিসাবে ভূগর্ভস্থ পানি আর্সেনিক দুষ্ট হবে ও তা পান করে দেশের কোটি কোটি মানুষ ধুঁকে ধুঁকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে। শুধু এতে তারা ক্ষান্ত নয়, প্রকাশ্য বাণিজ্য দস্যুতা ও চোরাচালানের মাধ্যমে বাংলাদেশকে বর্তমানে তাদের একচেটিয়া বাজার বানিয়ে ফেলেছে এবং এদেশের কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংস হ’তে চলেছে। বঙ্গোপসাগরে জেগে ওঠা দেশের সিকি আয়তন বিশিষ্ট বিশাল চরটি তারা স্রেফ গায়ের জোরে দখল করে রেখেছে ও বাংলাদেশকে চারদিক দিয়ে বেষ্টন করে ফেলেছে। এখন তাদের প্রয়োজন এদেশে একজন লেন্দুপ দর্জির, যার আহ্বানে তারা রাতারাতি আর্মি মার্চ করিয়ে সিকিমের ন্যায় দেশটিকে তাদের মানচিত্রভুক্ত করে নিতে পারে। এদেশে লুকিয়ে থাকা দেশবিরোধী চক্রের এজেন্টরাই যাবতীয় সন্ত্রাসের মূল নায়ক। নইলে গ্রেনেড হামলার পরপরই ঢালাওভাবে জ্বালাও-পোড়াও, ভাঙচুর, সরকারী ও ব্যক্তি মালিকানাধীন মূল্যবান জীপ, বাস, প্রাইভেট কার, এমনকি গার্ড সহ চলন্ত ট্রেনের মূল্যবান বগি সমূহ জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে দেওয়া, তার কিছু দিন পূর্বে হরতালের পূর্ব রাতে দোতলা বিআরটিসি বাসে আগুন ধরিয়ে ১০ জন যাত্রীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা নিশ্চয়ই কোন দেশপ্রেমের পরিচয় নয়। বিক্ষুব্ধ জনগণের অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে এগুলি নিঃসন্দেহে দেশবিরোধী চক্রের পরিকল্পিত সন্ত্রাস। বিরোধী নেতৃবৃন্দকে আহত বা হত্যা করে তারা জনগণকে সরকারের বিরুদ্ধে উত্তাল করে তুলতে চায়। অতঃপর সেই ঘোলা পানিতে তারা মাছ শিকার করতে চায়।

আমরা মনে করি, এই নারকীয় ঘটনার জন্য সরকারী বা বিরোধী দল নয়, বরং প্রকৃত দায়ী হ'ল দেশী ও বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীরা। যারা এদেশেই ঘাপটি মেরে থেকে বিদেশী নীল নকশা বাস্তবায়নে তৎপর রয়েছে। অতএব দেশের স্বাধীন অস্তিত্বের স্বার্থে দেশপ্রেমিক সকল নাগরিককে সদা সতর্ক প্রহরী হিসাবে কাজ করতে হবে। নইলে সেদিন দূরে নয়, যেদিন পুনরায় মীরজাফর ও ঘসেটি বেগমদের ষড়যন্ত্রে স্বাধীন বাংলাদেশ পুনরায় পরাধীন বঙ্গদেশে পরিণত হবে। কেননা ভয়ের কথা এই যে, বিগত সরকারের আমলে ৮টি এবং এ সরকারের আমলে এযাবৎ ৮টি বোমা হামলার কোনটারই প্রকৃত দোষীরা আজও ধরা পড়েনি। এসব হামলার পিছনে বিদেশী চক্রান্ত থাকলে প্রকৃত আসামীরা কোন দিন ধরা পড়বে বলে বিশ্বাস নেই। আমরা আন্তর্জাতিক তদন্তের নামে আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থাকে এদেশে ঢুকতে দেওয়াকে ভাল চোখে দেখছি না। যারা নিজ দেশের টুইন টাওয়ারে হামলাকারীদের আজও চিহ্নিত করতে পারেনি, তারা এখানে এসে কি পাবে? মাঝখানে তারা সরকারকে বাধ্য করার সুযোগ নিতে পারে এদেশে তাদের দীর্ঘমেয়াদী হীন স্বার্থ আদায়ের জন্য। অতএব সরকারী প্রশাসন ও দেশপ্রেমিক জনগণ সাবধান হৌন। হে আল্লাহ! আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে তুমি হেফাযত কর- আমীন![১১৩]

৬০. ভারতীয় চেতনা বনাম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

গত ১১ই ডিসেম্বরের 'গণ অনাস্থা' প্রাচীরকে সামনে রেখে দেশের খ্যাতনামা ট্রাম্পকার্ড ব্যক্তিত্ব[১১৪] হঠাৎ গোপনে গত ৩০শে নভেম্বর মঙ্গলবার নয়াদিল্লী সফরে গিয়ে সেদেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ও গোয়েন্দা প্রধান সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাত শেষে ৪ঠা ডিসেম্বর'০৪ শনিবার দেশে ফিরলেন।

১১৩. ৭ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০০৪। * শেখ হাসিনা।

১১৪. আওয়ামী লীগ-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী নওগাঁর আব্দুল জলীল (১৯৩৯-২০১৩খৃ.)। ২০০৪ সালে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল ঘোষণা করেন যে ৩০ এপ্রিল'০৪-এর মধ্যে সরকারের পতন ঘটানো হবে। তাঁর হাতে ট্রাম্প কার্ড (Trump card) রয়েছে। এই ট্রাম্প কার্ড কী তা কখনো প্রকাশ করা হয় নি। এটি এখনো রহস্যাবৃত। তবে ৩০শে এপ্রিলে তৎকালীন বিএনপি সরকারের পতন ঘটেনি। এই ট্রাম্পকার্ড তত্ত্বের জন্য আব্দুল জলিল দলের ভিতরে ও বাইরে সমালোচিত হন। ট্রাম্প কার্ড অর্থ তুরুপের তাস। যা লক্ষ্য অর্জনে সর্বশেষ প্রচেষ্টা হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

অতঃপর বিজয় দিবস উপলক্ষে ১৫ই ডিসেম্বর বুধবার ঢাকায় 'বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতি' আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে বললেন, ১৯৭১-এ আমরা পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলাম। বাংলাদেশকে একটি উদার মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য স্বাধীনতাযুদ্ধ করিনি। অথচ বাংলাদেশকে এখন একটি মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সেই চেতনাকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে। আর এর ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বর্তমানে ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে'। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার শরীক ভারতও। কারণ ভারতের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ও আদর্শিক চেতনা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূলনীতি ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এক ও অভিন্ন। একারণেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত সহায়তা দেয়। তাই মুক্তিযুদ্ধের এ চেতনাকে রক্ষা করতে এখন ভারতকে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে'। তিনি বর্তমান জোট সরকারের সাথে নীতিগত কোন সম্পর্ক না রাখার জন্য ভারতের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনার সর্বজিত চক্রবর্তী বলেন, বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে ট্রানজিটের জন্য আমরা আর বেশীদিন অপেক্ষা করতে পারি না'। বিরাজমান পানি সমস্যা সম্পর্কে তিনি বলেন, বাংলাদেশকে ভারত প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী পানি দিচ্ছে। বাণিজ্য বৈষম্য সম্পর্কে তিনি বলেন, দু'টি দেশের বাণিজ্য ভারসাম্যহীনতা ভবিষ্যতে খুব একটা কমার সম্ভাবনা নেই'।

উপরোক্ত বক্তব্যগুলি একটি স্বাধীন দেশের রাজধানীতে বসে কোন বিদেশী কর্মকর্তা বলতে পারেন, ইতিপূর্বে আমাদের জানা ছিল না। তার চেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হ'ল এই যে, তাকে এসব কথা বলার সাহস যুগিয়েছেন এদেশেরই কিছু দলনেতা। যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা টিকে থাকার মূল চেতনায় আঘাত করেছেন। যে চেতনা ধ্বংস করা ব্যতীত এপার বাংলা-ওপার বাংলা মিলে গিয়ে ভারতের মধ্যে একীভূত হওয়া কিংবা নিদেন পক্ষে তার আশ্রিত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া সম্ভব নয়। সে চেতনার নাম হ'ল 'ইসলাম'। ইসলামী চেতনাই পূর্ববঙ্গকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে পৃথক রাজনৈতিক মর্যাদা দিয়েছে এবং আজকের পৃথিবীর অন্যতম ঈর্ষণীয় স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার

সুযোগ দান করেছে। আজ আমরা ভারতের একটি প্রদেশ থাকলে যেসকল ব্যক্তি এখন জাতীয় নেতা বনেছেন, তারা তখন পাতি নেতা হবারও সুযোগ পেতেন না। যারা এখন একটি জাতীয় সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ পদে এসেছেন বা মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী ও বড় আমলা হয়েছেন, তারা তখন কত দর্জা নীচে থাকতেন, তার হিসাব থাকতো না।

যে চেতনাকে বাঁচাতে গিয়েই নবাব সলিমুল্লাহ, ফযলুল হক, সোহরাওয়ার্দী ও সবুর খানের মত নেতাগণ সেদিন জান বাজি রেখে গোঁড়া সাম্প্রদায়িক হিন্দু নেতাদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। ১৯৪৬ সালে কলিকাতা রায়টের রক্তাক্ত দিনগুলিতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সামনে বুক পেতে না দিলে আরও হাযার হাযার মুসলমান সেদিন শহীদ হয়ে যেত। মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ্র রাজনৈতিক প্রজ্ঞার কারণেই আমরা পূর্ব পাঞ্জাবের বিনিময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম পেয়েছিলাম। খান এ, সবুর না থাকলে আমরা বৃহত্তর খুলনা-যশোরকে হারাতাম। তবুও গান্ধী-নেহরু-প্যাটেলের ষড়যন্ত্রে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীর পাকিস্তানের হাতছাড়া হয়েছে। হাতছাড়া হয়েছে মুর্শিদাবাদ-মালদহ এবং সিলেটের করিমগঞ্জ যেলাসহ বহু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা, যা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের প্রাপ্য। বাংলাদেশ আজ সেই মানচিত্রের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে।

সেদিন শেরে বাংলা ফযলুল হকের পেশকৃত লাহোর প্রস্তাবের আলোকে 'পূর্ব পাকিস্তান' স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা পেলে আমাদেরকে ১৯৭১-এর রক্তাক্ত ইতিহাসের সম্মুখীন হ'তে হ'ত না। সেই প্রস্তাবই অবশেষে বাস্তবায়িত হয়েছে। তবে তাঁদের মৃত্যুর পরে অনেক ত্যাগের বিনিময়ে। পশ্চিম পাকিস্তানের অদূরদর্শী ও হঠকারী নেতারাই ছিল পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্য দায়ী। তাদের যুলুম ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ এদেশের মানুষের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ ও অন্তর্জ্বালাকে সুযোগমত ব্যবহার করেই ভারত তার জনম শত্রু পাকিস্তানকে ভেঙ্গে ফেলতে চেয়েছিল। '৭১-য়ে তারা ত্রাণকর্তা সেজে অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে অবশেষে নিজ দেশের সেনাবাহিনী দিয়ে সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং অপ্রস্তুত ও অসহায় আমাদের নেতাদেরকে লজ্জাকর গোলামী চুক্তিতে বাধ্য করেছিল। পাকিস্তানীদের সকল অস্ত্রশস্ত্র এবং এদেশের বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের কয়েক

হাযার কোটি টাকার কল-কব্জা ও যন্ত্রপাতি সব তারা লুটে নিয়েছিল। প্রতিবাদ করায় ৯নং সেক্টর কম্যাণ্ডার মেজর জলিল গ্রেফতার হলেন। এভাবে তিনিই হ'লেন স্বাধীন দেশের প্রথম রাজবন্দী। মাওলানা ভাসানী মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস কার্যতঃ গৃহবন্দী থাকলেন। প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিব ১৯৭৪ সালে ভারতের আকাশ দিয়ে উড়ে গিয়ে তাদের রক্তচক্ষুকে তোয়াক্কা না করেই লাহোরে অনুষ্ঠিত 'ইসলামী সম্মেলন সংস্থা'র বৈঠকে যোগদান করলেন। তাঁকে বাগে ফেরানো মুশকিল বুঝলো ষড়যন্ত্রকারীরা। অতএব, তখনকার টালমাটাল রাজনৈতিক অবস্থার সুযোগে সেনাবাহিনীর কিছু ক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে কাজে লাগালো তারা। প্রতিফল তিনি পেলেন মর্মান্তিকভাবে। সেদিন তাকে কোন 'রাজাকার' (রেযাকার) মারেনি। মেরেছিল তাঁরই বিশ্বাসী লোকেরা। সেদিন এর প্রতিবাদে বর্তমান নেতারা টুশব্দটি পর্যন্ত করেননি; বরং নেতার লাশ সিঁড়িতে ফেলে রেখে দৌড়ে গিয়ে মন্ত্রীত্বের শপথ নিয়েছিলেন। তারাই এখন নেতাপ্রেমে গদগদ হয়ে অযথা দেশটাকে রাজাকার ও মুক্তিযোদ্ধা, স্বাধীনতার পক্ষ ও বিপক্ষ শক্তিতে ভাগাভাগি করে 'বিভক্ত কর ও রাজনীতি কর' এই নোংরা ও পিচ্ছিল পথ ধরে এগিয়ে চলেছেন। অথচ বিশাল হৃদয় শেখ মুজিব ও জিয়াউর রহমান এসব বিভক্তি শেষ করে দিয়ে গেছেন।

ঐসব নেতারা মুক্তিযুদ্ধ করেছেন হয়তবা কলিকাতার হোটেলে বসে। আর আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি গ্রামে-গঞ্জে নির্যাতিত মানুষের মধ্যে থেকে। এদেশের মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানীদের যুলুমের বিরুদ্ধে ছিল। কিন্তু ইসলামী আদর্শের বিরুদ্ধে ছিল না। আমরা কখনোই করাচীর গোলামী ছিন্ন করে দিল্লীর দাসত্বের শৃংখলে বন্দী হ'তে চাইনি। একটা সাধারণ কুলি-মজুর পর্যন্ত এতে বিশ্বাসী ছিল না। 'জয় বাংলা'-র বদলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলায় অসংখ্য তরুণকে সেদিন পাখির মত গুলি খেয়ে মরতে দেখেছি। অথচ ট্রাম্পকার্ড নেতারা এখন ভারতীয় চেতনা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে এক করে দেখছেন। যার সহজ-সরল অর্থ হ'ল ভারতীয় চেতনা ও রাষ্ট্র সত্তার মধ্যে স্বাধীন দেশটি বিলীন হয়ে যাওয়া।

তারা বলেছেন, বাংলাদেশকে একটি উদার মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধ করিনি; তাহ'লে কি নেতারা এদেশটিকে গোঁড়া হিন্দুরাষ্ট্র

বানাতে যুদ্ধ করেছিলেন? যারা প্রতিদিন ভারতে মুসলমানদের রক্ত ঝরাচ্ছে। যাদের ভয়ে সেখানকার মুসলমানরা মসজিদে মাইকে আযান দিতে পারে না, কুরবানীতে গরু যবেহ করতে পারে না। যাদের কথিত ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের আগ্রাসনে সেদেশের শিক্ষা-দীক্ষা, চাকুরী-বাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য সকল ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে অধিকার বঞ্চিত করা হচ্ছে। যে 'বঙ্গভঙ্গ' রদ করে দুই বাংলাকে এক করার অভিলাষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বাংলা' মায়ের বন্দনা গেয়ে কবিতা লিখে হিন্দু নেতাদের উত্তেজিত করলেন, সেই গানটিকে সেদিন নেতারা বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত বানালেন। যে গান এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের তাওহীদী চেতনার বিরোধী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতার বিরোধী। নেতারা এখন তাই ভারতকে ডেকে আনতে চাচ্ছেন 'চেতনা' উদ্ধার করার জন্য। ভারত এখানে এলে এবার চেতনা উদ্ধার করবে না, দেশের স্বাধীনতা উদ্ধার করে ছাড়বে। ঠিক যেভাবে আফগানিস্তান ও ইরাকে আমেরিকা 'গণতন্ত্র' উদ্ধার করতে এসেছে। যেভাবে লেন্দুপ দর্জির আহ্বানে ভারত সিকিমকে গ্রাস করে নিয়েছে। নেতারা যদি সেটা করতে চান, তবে মারাত্মক ভুল করবেন। যেমন ভুল করেছিল মীরজাফর ক্লাইভকে ডেকে এনে নিজের নবাবীর স্বার্থে।

বাংলাদেশকে যারা প্রতিবছর শুকিয়ে ও ডুবিয়ে মারছে এবং পর্বত প্রমাণ বাণিজ্য বৈষম্য ও চোরাচালানীর মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিচ্ছে, সেই চিহ্নিত প্রতিবেশীর একজন ডেপুটি হাই কমিশনার আমাদের নেতাদের সামনে আমাদের রাজধানীতে বসে হুমকি দিচ্ছে 'ট্রানজিটের জন্য আমরা আর বেশীদিন অপেক্ষা করতে পারি না'। 'বাংলাদেশকে ভারত প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী পানি দিয়েছে'। তাহলে তাঁরা কি যবরদস্তি ট্রানজিট আদায় করবেন? তারা কি তাহলে পানি একেবারেই বন্ধ করে দিবেন? এভাবে বাণিজ্য শোষণ চালিয়েই যাবেন? এগুলো শুনেও যেসকল নেতা চুপ করে থাকেন, তাদের দেশপ্রেমকে আমরা সন্দেহ করি। যদি বলি, ১৯৭৪-এর মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির ফলে তারা বেরুবাড়ী নিয়ে নিল। কিন্তু বিনিময়ে তিন বিঘা করিডোর কেন আজও পুরোপুরি দিল না? কেন তারা বাংলাদেশের সীমানায় জেগে ওঠা বিশাল চর দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ দখল করে রেখেছে? আমাদের নেতারা কি কখনো তাদের কাছে এসব বিষয়ে কৈফিয়ত চেয়েছেন?

তাই বলি, ভারতের নেতাদের আদর্শিক চেতনা হ'ল নিজ দেশের অহিন্দুদের নির্যাতন ও বঞ্চিত করা এবং প্রতিবেশী দেশগুলোকে শোষণ, লুণ্ঠন ও দখল করা। আর আমাদের জনগণের আদর্শিক চেতনা হ'ল আল্লাহ্‌র গোলামীর অধীনে হিন্দু-মুসলিম সকল নাগরিকের সমানাধিকার নিশ্চিত করা ও নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্ব নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা। ভারতীয় নেতাদের আদর্শিক চেতনা হ'ল 'বন্দে মাতরম' 'জয় হিন্দ' ও 'জয় বাংলা। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আদর্শিক চেতনা হ'ল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। এই চেতনাকে বোমা মেরে হত্যা করা যাবে না। নিঃসন্দেহে মুক্তিযোদ্ধা মেজর জলিলের চেতনা ও নেতা আব্দুল জলিলের চেতনা এক নয়। যেমন এক ছিল না মুক্তিযোদ্ধা মেজর জিয়ার চেতনা ও খালেদ মোশাররফের চেতনা। এক ছিল না মাওলানা ভাসানীর চেতনা ও চিহ্নিত রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের চেতনা। আমরা উভয় দেশের নেতাদেরকে উভয় দেশের স্বাধীনতা ও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আদর্শিক চেতনার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আহ্বান জানাই। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন![১১৫]

আন্তর্জাতিক

৬১. ভারতের পারমাণবিক পরীক্ষা

প্রতিবেশী ভারত গত ১১ ও ১৩ই মে'৯৮ যথাক্রমে ২+৩= ৫টি পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা চালিয়েছে। এই বোমাগুলির সম্মিলিত ধ্বংসকারী ক্ষমতা ছিল ৫৬ কিলোটন টিএনটি (১ কিলোটন= ১০,০০০ টন টিএনটি➡৫৬= ৫ লাখ ৬০ হাযার টন টিএনটি)। যা ১৯৪৫ সালে জাপানের হিরোশিমায় ২য় মহাযুদ্ধে মিত্র বাহিনীর নিক্ষিপ্ত আণবিক বোমার চেয়ে তিনগুণ বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন। একই সাথে ভারত গর্বের সাথে ঘোষণা করেছে যে, সে মাঝারি পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র তৈরীর কাজ সম্পন্ন করেছে, যা পারমাণবিক বোমা বহনে সক্ষম। 'অগ্নি' নামক এই ক্ষেপণাস্ত্র ১৫০০ কিঃ মিঃ (৯৩০ মাইল) দূরবর্তী স্থানে বোমা বহন করে নিয়ে যেতে সক্ষম। এছাড়াও নতুন হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিজেপি কোয়ালিশন সরকার ক্ষমতায় এসেই 'অগ্নি'-র আরো একটি উন্নত পদ্ধতি অনুমোদন করেছে, যার পাল্লা হবে ২৫০০ কিঃ মিঃ

১১৫. ৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জানুয়ারী ২০০৫।

(১৫৫০ মাইল)। ভারতের এই পারমাণবিক প্রকল্পের যিনি রূপকার, তিনি হ'লেন প্রধানমন্ত্রীর প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা এককালে পত্রিকার হকার জনাব এ.পি.জে. আব্দুল কালাম (৬৬)। তিনি নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করেন। তিনি চিরকুমার, নিরামিষভোজী ও অত্যন্ত মিতব্যয়ী জীবন যাপন করেন এবং মাত্র দু'কক্ষ বিশিষ্ট একটি বাড়ীতে বসবাস করেন। ওদিকে পাকিস্তানী পারমাণবিক প্রকল্পের রূপকার হ'লেন ড. আব্দুল কাদির খান।

প্রশ্ন হ'ল ভারতের মত একটি উন্নয়নশীল দেশ হঠাৎ পারমাণবিক শক্তিধর দেশে পরিণত হবার দুঃস্বপ্নে বিভোর হ'ল কেন? যে নাগরিকদের পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, শিক্ষার হার বহু নিম্নে, তাদের এমন কি হ'ল যে পারমাণবিক বোমার অধিকারী হ'তেই হবে? বিশ্বের পরাশক্তিগুলি যখন তাদের স্ব স্ব পারমাণবিক অস্ত্রের ভাণ্ডার ধ্বংস করছে, তখন ভারতের এত সাধ হ'ল কেন? তাদের তো নিশ্চয়ই জানা আছে যে, তাদের প্রধান মুরব্বী রাশিয়ার ভাণ্ডারে অস্ত্রের ডিপো থাকা সত্ত্বেও কোন ফায়েদা হয়নি। এক কালের দোর্দণ্ড প্রতাপ পরাশক্তি সোভিয়েত রাশিয়া এখন ভেঙ্গে খান খান হয়ে পৃথক পৃথক ১৫টি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। পুরানো অস্ত্রের ভাণ্ডার সে এখন বেঁচে দিয়ে খাদ্য জোগাড়ে ব্যস্ত রয়েছে। পুরানো অস্ত্রের খরিদ্দারও সে পাচ্ছে না। পারমাণবিক বোমার অধিকারী যেই-ই হৌক না কেন, বোমা ফাটানো তার দ্বারা কখনোই সম্ভব হবে না বলে এক প্রকার ধরে নেওয়া যায়। কেননা ভারত বোমা মারবে পাকিস্তানে বা চীনে। হাযার বা দেড় হাযার মাইল দূরে যেখানেই সে বোমা মারুক না কেন, তার ধ্বংসকারিতা শুধু ঐখানেই কেন্দ্রীভূত থাকবে না; বরং তেজস্ক্রিয়তা ও বায়ু দূষণের মাধ্যমে তা উল্টা ভারত ও অন্যদেরকেও গ্রাস করবে। লাখ লাখ মানুষ বছরের পর বছর ধরে মরবে, পঙ্গু হবে, রোগে-শোকে শেষ হ'তে থাকবে। যেমন জাপানের নাগাসাকি-হিরোশিমার আণবিক বোমার তেজস্ক্রিয়তা আজও চলছে। গত ৫৩ বছর ধরে আজও সেখানে ঘাস পর্যন্ত জন্মেনি। আজও প্রতি বছর হাযার হাযার লোক ঐ বোমা জনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে। যারা বোমা মেরেছিল ও যাদেরকে মেরেছিল, কেউ আজ বেঁচে নেই। কিন্তু মরছে নিরীহ নির্দোষ মানুষ, যারা সে সম্পর্কে কিছুই জানেনা। এসব ইতিহাস নিশ্চয়ই

ভারত সরকারের জানা আছে। রাশিয়ার চেরনবিল ও ভারতের ভূপালের পারমাণবিক দুর্ঘটনার খবর সবারই জানা আছে। জানা আছে পাকিস্তান সরকারের। তবু যদি ভারতের বোমা বিস্ফোরণের জওয়াবে পাকিস্তান বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়, তবে সেও আরেকটি ভুল করবে। কেননা বোমা ফাটানোর মধ্যে জনগণের কোন কল্যাণ নেই। বরং ভবিষ্যৎ অসংখ্য অজানা ক্ষতি এর মধ্যে লুকিয়ে আছে।

এক্ষণে ভারতের এই পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানোর মূল কারণ কি? কারণ একাধিক হ'তে পারে। যেমন- (১) দুনিয়াকে জানানো যে আমরা আজ থেকে পারমাণবিক শক্তিধর দেশ। (২) হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের খুশী করা ও দেশের মধ্যকার স্বাধীনতাকামী শক্তিগুলিকে ভয় দেখানো এবং প্রতিবেশী পাকিস্তান, চীন, বাংলাদেশ প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলিকে স্নায়বিক চাপের সম্মুখীন করা। (৩) ভগ্নপ্রায় কোয়ালিশন পরিচালনায় নিজেদের রাজনৈতিক ব্যর্থতা ঢাকা দেওয়া এবং দেশের পর্বত প্রমাণ সমস্যাবলী থেকে জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে দিয়ে উগ্র স্বাদেশিকতাবাদ জাগিয়ে তোলার আত্মঘাতী রাজনৈতিক মতলব হাছিল করা। আত্মঘাতী এজন্য বলছি যে, ভারত ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক অবরোধের শিকার হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে অর্থনৈতিকভাবে সে পঙ্গু হয়ে পড়বে। ভিক্ষুকের ঝুলি নিয়ে তাকে বিশ্ব দরবারে দৌঁড়াতে হবে। ক্ষুধার্ত ও ক্রুদ্ধ জনতার চাপে ধার্মিকের মুখোশধারী বিজেপি সরকার যেকোন সময় ক্ষমতা থেকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবে।

ইহূদী-নাছারা ও মুশরিক মুসলিম উম্মাহ্র স্থায়ী শত্রু। ইতিমধ্যে তারা ইরাককে পঙ্গু করে ইস্রাঈলকে শক্তিশালী করছে। এখন তাদের টার্গেট পাকিস্তান। অতএব পাকিস্তানকে সংযম প্রদর্শন করে ওআইসি ভুক্ত মুসলিম দেশগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি পারমাণবিক শক্তিধর ইসলামী শক্তিবলয় সৃষ্টি করার লক্ষ্যে কাজ করা উচিত। ভারতের বিরুদ্ধে বাফার স্টেট হিসাবে চীন পাকিস্তানকে সমর্থন করে যাবে। এটা একটা বাড়তি লাভ। ইসলামী বোমা যে পাকিস্তানের কাছে প্রস্তুত রয়েছে- এটা এক প্রকার Open secret যা সবাই জানেন। অতএব ফাটিয়ে শক্তি ক্ষয় করে লাভ কি? বরং প্রতিপক্ষকে ভীত রাখাই ভাল।

সম্পাদকীয় লেখা শেষ না হ'তেই হঠাৎ শোনা গেল পাকিস্তান আজকে ২৮.০৫.৯৮ ইং বিকাল সাড়ে ৩-টায় বেলুচিস্তানের চাগাই পার্বত্য এলাকার ভূগর্ভে ভারতের জবাবে একই সাথে পরপর পাঁচটি পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। পাকিস্তান এর মাধ্যমে বিশ্বের ৭ম ও মুসলিম বিশ্বের ১ম পারমাণবিক শক্তিধর দেশে পরিণত হ'ল। ইহূদী-খ্রিষ্টান ও হিন্দু বোমার পাশাপাশি প্রথম ইসলামী পারমাণবিক বোমার অধিকারী পাকিস্তানকে তাই ধন্যবাদ জানাবো না দুঃখ প্রকাশ করব তাই ভাবছি। আল্লাহ সকলকে রক্ষা করুন- আমীন![১১৬]

৬২. কাশ্মীর ট্রাজেডী

ভারতের প্রথম গবর্ণর জেনারেল মাউন্টব্যাটেন ও তৎকালীন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কূটচালের ফলশ্রুতি হিসাবে বিগত ৫২ বছর ধরে কাশ্মীরে যে রক্ত ঝরছে, গত কয়েক সপ্তাহে তা তীব্র আকার ধারণ করেছে। অতঃপর গত ২৬শে মে '৯৯ বুধবার সকাল সাড়ে ৭-টায় স্বাধীনতাকামী কাশ্মীরী মুজাহিদদের নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে ভারত পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ রেখা (LOC) বরাবর দ্রাস, কারগিল প্রভৃতি পাহাড়ী এলাকায় স্থল ও বিমান হামলা শুরু করেছে। মাত্র কয়েক শ' মুজাহিদকে বিতাড়িত করার জন্য পৃথিবীর ৪র্থ বিমান শক্তির অধিকারী পারমাণবিক শক্তিধর ভারত হঠাৎ চণ্ডমূর্তি ধারণ করে এমন সংহারী আক্রমণ শুরু করবে, তা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। যাকে রীতিমত মশা মারতে কামান দাগা বলা চলে। উল্লেখ্য যে, বিগত ৫২ বছরের মধ্যে এই প্রথম শান্তিকালীন সময়ে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তার বিমান শক্তি ব্যবহার করল। ফলে ভারতীয় বিমান ২৭ তারিখে পাকিস্তানী এলাকায় ঢুকে পড়লে তার দু'টি মিগ-২৭ জঙ্গী বিমান ভূপাতিত হয়। একটির পাইলট স্কোয়াড্রন লিডার অজয় আহুজা নিহত হন। অন্যটির পাইলট ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট নচিকেতা গ্রেফতার হন। ওদিকে মুজাহিদদের স্টিঙ্গার ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ২৮শে মে ভারতের ২টি এস আই-১৭ জঙ্গী হেলিকপ্টার ভূপাতিত হয় ও এর ৪ জন পাইলট নিহত হয়। কাশ্মীরের অন্যান্য সীমান্ত এলাকায় মুজাহিদদের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

---

১১৬. ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, জুন ১৯৯৮।

ফলে যুদ্ধ সারা কাশ্মীরে দ্রুত বিস্তৃত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যে উভয়পক্ষে বহু হতাহত হয়েছে। সাধারণ মুসলিম নর-নারী, শিশু-বৃদ্ধ ঘরবাড়ি ছেড়ে প্রাণভয়ে নিরাপদ স্থানে পালিয়ে যাচ্ছে। কসোভোর ন্যায় নিজের দেশেই কাশ্মীরী মুসলমানরা এখন উদ্বাস্তু হ'তে চলেছে।

উল্লেখ্য যে, অধিকৃত কাশ্মীরের ১ কোটির ঊর্ধে মুসলমানকে দমন করার জন্য গত কয়েক বছরে ভারত সেখানে তার ছয় লাখ সৈন্য নামিয়েছে এবং তাদের মাধ্যমে কাশ্মীরী মুসলমানদের উপর ইতিহাসের বর্বরতম নিষ্ঠুরতা চালিয়ে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত ৬০ হাযারের উপরে মুসলমান শহীদ হয়েছে। ভারতের ২৫টি রাজ্যের মধ্যে সবচাইতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম রাজ্য হচ্ছে কাশ্মীর। যার ৮২% মুসলমান। ভারত বিভাগের সময় নীতি অনুযায়ী এটা পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কাশ্মীরী সন্তান নেহরু ও কাশ্মীরের হিন্দু শাসক হরি সিংয়ের মধ্যে চুক্তির ফলে এবং সাথে সাথে গবর্ণর জেনারেল মাউন্টব্যাটেনের সমর্থনের কারণে কাশ্মীরী সংখ্যাগুরু মুসলিম জনগণের ইচ্ছা-আকাংখাকে পিষ্ট করে ভারত জোর করে কাশ্মীরকে নিজ অধিকৃত রাজ্যে পরিণত করে। অথচ হায়দারাবাদের মুসলিম শাসক নিযাম যখন পাকিস্তানে যোগ দিতে চান, তখন কিন্তু সেখানকার সংখ্যাগুরু হিন্দু প্রজাদের দোহাই দিয়ে ভারত সেটাকে নিজের দখলে নিয়ে নেয়। ১৯৪৮ সালে বিষয়টি জাতিসংঘে যায় ও সেখানে কাশ্মীরী জনগণের ইচ্ছার উপরে বিষয়টি ছেড়ে দিয়ে 'গণভোট' অনুষ্ঠানের পক্ষে প্রস্তাব পাস হয়। কিন্তু ভারত এযাবত তাতে কর্ণপাত করেনি। এভাবে বিভিন্ন ছলচাতুরী ও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে গোয়া, মানভাদর, জুনাগড় প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারত গ্রাস করে নেয়। তার সর্বশেষ আগ্রাসনের শিকার হয়েছে সিকিম। এভাবে বলদর্পী ভারতের পার্শ্ববর্তী ছোট বড় সকল রাষ্ট্র আজ সদা ভীত ও সন্ত্রস্ত।

ভারত তার বর্তমান হামলাকে পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে হামলা বলে আখ্যায়িত করতে চায়। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা কি তাই? বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে দমন করার সময় তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ভারতের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ করেছিল। ভারত বাঙ্গালী মুক্তিযোদ্ধাদেরকে তখন সার্বিক সহযোগিতা দিয়েছিল। এমনকি অবশেষে নিজ সেনাবাহিনী নামিয়েছিল। যার

ফলে দেশ দ্রুত স্বাধীন হয়েছে। অমনিভাবে কাশ্মীরী মুক্তিযোদ্ধাদের দমন করার সময় ভারত সরকার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে। এর জবাবে পাকিস্তানের সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান মির্যা আসলাম বেগ বলেছেন, 'কাশ্মীরীদের সাথে জিহাদে শরীক হওয়ার জন্য সারা পৃথিবী থেকে যেমন- সুদান, মিসর, ইয়েমেন, বাহরায়েন, আফগানিস্তান এবং অবশ্যই পাকিস্তান থেকে স্বেচ্ছাসেবকরা আসছেন। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী থেকে নয়'।

কিন্তু হঠাৎ করে ঠিক এই সময় ভারতের পক্ষ থেকে এই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি সৃষ্টি করার পিছনে উদ্দেশ্য কি? এটা পরিষ্কার যে, মাত্র এক ভোটের ব্যবধানে অনাস্থা প্রস্তাবে হেরে গিয়ে পাগলপারা বৃদ্ধ বাজপেয়ী আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনে আবার ক্ষমতা ফিরে পাবার জন্য মরিয়া হয়ে বিনা উসকানিতে এই অঘোষিত যুদ্ধ শুরু করেছেন। এবার আর 'রাম মন্দির' নয়, কাশ্মীর ইস্যুতেই তাঁকে নির্বাচনে জিততে হবে। অথচ গত নির্বাচনের সময় তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, আর নির্বাচন করবেন না। জানা গেছে যে, ইতিমধ্যে সোনিয়া গান্ধীও এই হামলাকে সমর্থন দিয়েছেন। নিশ্চয়ই সেখানেও উদ্দেশ্য রাজনীতি।

লণ্ডনের খ্যাতনামা সাপ্তাহিকী 'দি ইকনমিস্ট' ২২.৫.১৯৯১ইং সংখ্যায় বলেছিল যে, কাশ্মীরী জনগণকে গণভোটের সুযোগ দিলেই তারা পাকিস্তানের দিকে চলে যাবে। ভারতের তথাকথিত One nation theory বা 'এক জাতীয়তা মতবাদ' ধূলায় লুটাবে'। হয়তবা আসন্ন একবিংশ শতকে ভারতের জন্য নাটকীয় ভাঙ্গন ও অভিনব পরিবর্তন অপেক্ষা করছে। কেননা উক্ত আন্ত র্জাতিক সাপ্তাহিকীটির অভিমত হচ্ছে যে, 'ভারত মাঝে মাঝে নিজেও সন্দেহ করে যে, সে নিজে একটি অভিন্ন জাতি কি-না। কেননা অসংখ্য ভাষা ও বর্ণ, বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতিতে বিভক্ত ভারতের কয়েকটি রাজ্য এতই বড় যে, তারা নিজেরাই এক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা ও পরিচালনা করতে পারে'।

প্রশ্ন হচ্ছে, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের সোল এজেন্ট আমেরিকা ও তার মিত্র রাষ্ট্রগুলি থাকতে কাশ্মীরের ব্যাপারে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের গৃহীত ২৫৬ নং প্রস্তাবটি বিগত ৫০ বছরে কেন বাস্তবায়িত হ'ল না? কেন কাশ্মীরে তখন থেকেই দৈনিক রক্ত ঝরছে ও মা-বোনের ইযযত লুণ্ঠিত হচ্ছে? কেন মানবাধিকার নিয়মিতভাবে লংঘিত হচ্ছে?

Contents

ভুক্তভোগীরা বলেন, এর পিছনে আন্তর্জাতিক ইহূদী-খ্রিষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদী লবি গোপন আঁতাতে কাজ করে যাচ্ছে। যাতে কাশ্মীরে আরেকটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের উত্থান না ঘটে। যাতে একমাত্র পারমাণবিক শক্তিধর মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানকে ভারতের মাধ্যমে ধ্বংস কিংবা দুর্বল করা যায় এবং ইউরোপের মুসলিম দেশগুলোর মত দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমানদেরকেও চিরকাল উদ্বাস্তু করে কিংবা পাশ্চাত্যের দেওয়া খুদকুঁড়ো খেয়ে করুণার ভিখারী হয়ে বেঁচে থাকতে হয়।

কাশ্মীর পাকিস্তান ভুক্ত হৌক বা স্বাধীন রাষ্ট্র হৌক এটা তাদের ব্যাপার। আমরা চাই সেখানে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বন্ধ হৌক। জাতিসংঘ প্রস্তাব অনুযায়ী তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠিত হৌক। পূর্বের তিনটি যুদ্ধের ন্যায় পুনরায় কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ না বাঁধুক। দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হৌক![১১৭]

৬৩. বিশ্বায়ন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ

গ্লোবাল ভিলেজ বা বিশ্বপল্লী গড়ার স্বপ্ন নিয়ে সাম্প্রতিক কালের বিশ্বায়ন তত্ত্ব বর্তমান সময়ের একটি অতি আলোচিত বিষয়বস্তু। এ তত্ত্বের অন্তর্নিহিত বক্তব্য হ'ল সারা বিশ্বকে একই মোহনায় জমায়েত করা। আপাত মধুর এই তত্ত্বটি এসেছে পশ্চিমা পুঁজিবাদী বিশ্বের কাছ থেকে। ইতিপূর্বে গণতন্ত্রের নোসখা পেশ করে তারা যেমন দেশে দেশে দলাদলি সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য ছিন্নভিন্ন করেছে এবং এর মাধ্যমে অন্য দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে নিজেদের কব্জায় নিয়েছে, এবারে বিশ্বায়ন তত্ত্ব পেশ করে তাদের উদ্ভাবিত নব নব প্রযুক্তির আগ্রাসন, অর্থনৈতিক আগ্রাসন ও অপসংস্কৃতির আগ্রাসনকে বিশ্বায়ন করার মাধ্যমে ফেলে আসা সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণকে পুনরায় চালু ও পাকাপোক্ত করতে চলেছে। অবশ্য এর একটা ভাল দিক আছে এই যে, সংকীর্ণ আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা-ভাবনার বদলে কিছুটা হ'লেও উদারতাবাদের প্রসার ঘটে। ধর্মান্ধ ও গোষ্ঠীগত অসহিষ্ণুতার বদলে মানুষ একে অপরকে বনু আদম হিসাবে ভাবতে উদ্বুদ্ধ হয়। একে অপরের সভ্যতা ও অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হয়। এভাবে পারস্পরিক সৌহার্দ্য সৃষ্টি ও তা ক্রমে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু

---

১১৭. ২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, জুন ১৯৯৯।

এগুলি হ'ল মূলতঃ হাতির বাইরের দাঁতের মত। এই সুন্দর সুন্দর কথামালার আড়ালে লুকিয়ে আছে কুটিলতার ক্রূর হাসি। যার বাস্তব ফল ছোট্ট পৃথিবী নামক এই গ্রহপৃষ্ঠে বসবাসরত শতকরা ৮০ ভাগ দরিদ্র জনগোষ্ঠী ইতিমধ্যে হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে ধনী দেশ সমূহের কলোনীতে পরিণত হয়েছে আজ গরীব দেশগুলো। উন্নত বিশ্বের উন্নত প্রযুক্তির ও তুলনামূলকভাবে সস্তা পণ্যের বিপরীতে তাদের নিজস্ব পণ্য ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় শেষ হ'তে চলেছে। ফলে তারা এখন বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ প্রভৃতি পুঁজিবাদী বিশ্বের গড়া অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মুখাপেক্ষী হ'তে বাধ্য হচ্ছে। এক সময়ের সোনালী আঁশ বাংলাদেশের পাট সম্পদ আজ চাষীর গলার ফাঁসে পরিণত হয়েছে। অমনিভাবে হ'তে চলেছে অধুনা সম্ভাবনাময় চিংড়ী ও গার্মেন্টস শিল্পের ভাগ্যে। এখন আবার নযর পড়েছে আমাদের বিপুল সম্ভাবনাময় তৈল ও গ্যাস মওজূদের দিকে। মুক্তবাজার অর্থনীতি ও অবাধ বাণিজ্যের ধুয়া তুলে তারা দরিদ্র বিশ্বের কাঁচামাল ও সম্পদ অবাধে লুণ্ঠনের সুযোগ পেয়েছে। অবাধ প্রতিযোগিতায় সবলের কাছে দুর্বলের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। আর তা হ'তে চলেছে আজ তথাকথিত বিশ্বায়নের নামে।

নব নব প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক আগ্রাসন ছাড়াও বিশ্বায়নের তৃতীয় কুফল হ'ল সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। আধুনিক স্যাটেলাইট-এর মাধ্যমে টিভি পর্দায় ভেসে ওঠে পশ্চিমা নগ্ন ও মারদাঙ্গা ছবি। আমাদের দেশের লোকেরা তা ক্ষুধার্তের মত গিলতে শুরু করেছে। ফলে ধর্ষণ, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি সহ নানাবিধ সমাজ বিরোধী কর্ম আজ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির দুর্নিবার আগ্রাসন, অর্থনীতির বিশ্বায়ন ও সংস্কৃতির বিজাতীয়করণ আজ আমাদের সমাজ জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে।

বিশ্বায়নের বিশ্বমোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের সর্বত্র গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের মিঠাবুলি আওড়ালেও তার নিজ দেশের খবর এই যে, 'সারা পৃথিবীতে একটা নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ অপরাধ হয়, শুধুমাত্র আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যেই হয় তার অর্ধেক অপরাধ। ১০ মিনিট বিদ্যুৎ না থাকলে লাখ লাখ ধর্ষণ হয়। হয় ছিনতাই ও অপহরণ। রাস্তায় রাস্তায় ছিন্নমূল মানুষের ঢল। ক্ষুধার্ত এসব সর্বহারা বনু আদমের জন্য একমুঠো ভাতের ব্যবস্থা কিংবা একটু মাথা গোঁজার ঠাই মার্কিন গণতন্ত্র গত তিন শতাব্দীকালেও নিশ্চিত করতে

পারেনি। বর্ণবাদী ধ্যান-ধারণা মার্কিন সমাজে প্রবল প্রতাপে এখনও বিরাজমান। আইন ও বিচার ব্যবস্থা উচ্চবিত্তদের প্রভাব মুক্ত নয়'। চিরন্তন মানবিক নৈতিকতার ন্যূনতম নিরাপত্তাও সেদেশে নেই। নিজ মেয়ের বয়সী ১১ জন মেয়ের সাথে ফষ্টিনষ্টি করেও সেদেশের প্রেসিডেন্টের (বিল ক্লিনটন) বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হয় না। বরং এতে তার জনপ্রিয়তা নাকি পূর্বের চেয়ে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

বুভুক্ষ মানবতাকে পুঁজিবাদী বিশ্বের সর্বগ্রাসী থাবা হ'তে রক্ষা করা ও বিশ্বব্যাপী ইহূদী-খ্রিষ্টান চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর দায়িত্ব ছিল মুসলমানদের। কিন্তু তারা সোচ্চার হয়নি। ফলে রাশিয়া থেকে বিতাড়িত ইহূদীদের এনে জমা করা হ'ল মুসলমানদের প্রথম ক্বিবলা বায়তুল মুক্বাদ্দাসের পুণ্যভূমি যেরুযালেমে। উদ্দেশ্য, তৈল সমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী সামরিক ঘাঁটি গড়ে তোলা এবং মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলির উপরে ছড়ি ঘুরানো।

অতঃপর গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের স্বঘোষিত নেতা ও বিশ্বায়ন তত্ত্বের উদ্গাতা এই অপশক্তিগুলি একত্রিত হয়ে তাদের সৃষ্ট জারজ রাষ্ট্র ইসরাঈলকে দিয়ে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মে'রাজ ধন্য পবিত্র বায়তুল আক্বছা জামে মসজিদে তারা ১৯৬৯ সালের ২১শে আগস্ট তারিখে আগুন ধরিয়ে দেয়। ফলে সে আগুনে জেগে ওঠে ঘুমন্ত মুসলিম বিশ্ব। মাত্র এক মাসের মধ্যেই মরক্কোর রাজধানী রাবাতে বৈঠকে বসেন ২৪টি মুসলিম দেশের রাষ্ট্র প্রধানগণ। ২২ হ'তে ২৫শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৈঠকে গঠিত হয় 'অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কান্ট্রিজ' (ওআইসি) বা ইসলামী সম্মেলন সংস্থা। মুসলিম দেশগুলির সাধারণ সমস্যা, অভিন্ন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য ঐক্যবদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণ করাই ছিল এই সংস্থা গঠনের মূল লক্ষ্য। বাদশাহ ফায়ছাল স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, ওআইসি গঠিত হলে আল-আক্বছা মুক্ত হবে এবং একদিন সেখানে গিয়ে ছালাত আদায় করবেন তিনি। কিন্তু ওআইসি-র রূপকার ও মধ্যপ্রাচ্যের তৈল অস্ত্র প্রয়োগ তত্ত্বের উদ্গাতা এই দুঃসাহসী নেতাকে সে স্বপ্ন পূরণ হ'তে দেয়নি ঐ ইহূদী-খ্রিষ্টান চক্র। ১৯৭৫-এর ২৫শে মার্চ তাঁকে তাঁর প্রাসাদেই হত্যা করা হয় আমেরিকায় পড়ুয়া তাঁরই ভাতিজাকে দিয়ে। এভাবে শেষ করে দেওয়া হয় ওআইসি-র প্রাণপুরুষকে। অতঃপর

খুঁড়িয়ে চলা ওআইসি এখন কেবল একটি নাম সর্বস্ব প্রতিষ্ঠান মাত্র। কিন্তু এটাই কি শেষ কথা?...

বিশ্বায়নের কপট বলয় থেকে বেরিয়ে এসে মুসলিম উম্মাহকে তার আদর্শিক স্বাতন্ত্র্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ফেলে আসা খেলাফতের আদলে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হওয়া এখন সময়ের একান্ত দাবী। ওআইসি-কে এখন পূর্ণ ইসলামী স্বাতন্ত্র্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক জোট হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে হবে। ১৯৪৯ সালে পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো 'ন্যাটো' জোট গঠন করলে ১৯৫৩ সালে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগুলো তার পাল্টা 'ওয়ারশ' জোট গঠন করে। দু'টি পরস্পর বিরোধী সামরিক জোট থাকায় শক্তির ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। ফলে ৩য় বিশ্বযুদ্ধের বদলে শুরু হয় স্নায়ুযুদ্ধ। যা চলে '৯০-এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়া পর্যন্ত। 'ওয়ারশ' জোটের কম্যুনিস্টরাও এখন পুঁজিবাদী ব্লকে ভিড় করেছে। অতএব এখন মুখোমুখি হয়ে গেছে ইহূদী-খ্রিষ্টান ও হিন্দু সহ তাবৎ পুঁজিবাদী বিশ্ব এবং তাবৎ মুসলিম বিশ্ব। 'মৌলবাদ'-এর নামে সকল অমুসলিম শক্তির অভিন্ন টার্গেট হ'ল ইসলাম। ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে সবাই ঐক্যবদ্ধ। অতএব মুসলিম উম্মাহর একক প্লাটফরম হিসাবে ৫৬ (এখন ৫৭) জাতির ওআইসি-কে যত শীঘ্র সম্ভব শক্তিশালী সামরিক জোট হিসাবে আত্মপ্রকাশ করা আশু যরূরী। এটা সম্ভব হ'লেই তবে সম্ভব হবে চেচনিয়া, সোমালিয়া, পূর্ব তিমূর, আফগানিস্তান, কাশ্মীর, ফিলিস্তীন সহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুসলিম নিধন যজ্ঞের অবসান ঘটানো। আমরা সেদিনের অপেক্ষায় রইলাম।

বর্ষশেষের নিবেদন

আল্লাহ্র রহমতে আমাদের প্রাণপ্রিয় মাসিক 'আত-তাহরীক' তার ৩য় বর্ষ শেষ করল। যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে আত-তাহরীক পদযাত্রা শুরু করেছিল, বিগত তিন বছরে তা কতটুকু সফল হয়েছে, তার মূল্যায়ন করবেন সুধী পাঠকবৃন্দ। তবে ইতিমধ্যেই যেসব মন্তব্য আমরা পেয়েছি, তার আলোকে এতটুকু বলা চলে যে, আমরা আমাদের লক্ষ্যপথে এগিয়েছি, লক্ষ্যচ্যুত হইনি। হতাশ নই, আশান্বিত হয়েছি। যারা ভাবতেন প্রচলিত কোন একটি মাযহাব ও

তরীকা ভিন্ন মুসলমান থাকা যায় না, মাযহাবী ফিক্বহ ব্যতীত ফৎওয়া হয় না, তারা নিশ্চয়ই বুঝে নিয়েছেন যে, এসব ধারণা অলীক মাত্র। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণই হ'ল প্রকৃত মাযহাব বা চলার পথ। এর বাইরে মুসলমানের জন্য কোন চলার পথ নেই। দুনিয়ার কল্যাণ ও আখেরাতে মুক্তি কেবল এ পথেই সম্ভব, একথাটি জাতির সম্মুখে পেশ করে আত-তাহরীক যে একটি নীরব বিপ্লব সৃষ্টি করে চলেছে, সেটা এখন অনেক সুধীজনের কাছ থেকে শোনা যাচ্ছে। *ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ*।

আত-তাহরীক-এর গ্রাহক-এজেন্ট, পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা ও শুভানুধ্যায়ী সকলের প্রতি বর্ষশেষে রইল আমাদের প্রাণঢালা অভিনন্দন। কামনা রইল নিষ্কাম দো'আ ও অটুট সহযোগিতার। আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র খেদমতটুকু কবুল করুন-আমীন![১১৮]

৬৪. ধর্মনিরপেক্ষতার ভয়াল রূপ

ভারতের গুজরাট রাজ্যের প্রধান শহর আহমদাবাদের অনতিদূরে গোদরা রেলস্টেশন ও তৎসন্নিহিত এলাকা ছাড়িয়ে অন্যূন ৩৭টি শহরে ও গ্রামে চলছে সংখ্যালঘু মুসলমানদের জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করার বহ্ন্যুৎসব। নিকটাত্মীয়ের শেষ বিদায়কালে অশ্রুসিক্ত নয়নে দরদভরা অন্তরে প্রার্থনা করার বদলে কলিজার টুকরা সন্তান যে দেশে তাদের মা-বাপের মুখে আগুন দিয়ে বিদায় করে এবং তাতেও ক্ষান্ত না হয়ে শ্মশানঘাটে নিয়ে পুড়িয়ে মা-বাপের নগ্নদৃশ্য অবলোকন করে। অতঃপর খাড়া হয়ে যাওয়া দগ্ধীভূত কংকালটিকে পুনরায় লাঠি মেরে চূর্ণ করা যাদের মানবরচিত ধর্মীয় বিধানের অন্তর্ভুক্ত। ধর্মের নামে জীবন্ত নরবলি ও সতীদাহ প্রথা যাদের মাত্র সেদিনের ঘটনা। এহেন লোকদের হাতে তরতাযা মানুষ তাও যদি সে তাদের ভাষায় যবন, ম্লেচ্ছ মুসলমান হয়, তাহ'লে তো তাকে পুড়িয়ে হত্যা করা রীতিমত উৎসবের বিষয় বৈ-কি। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, হিন্দু চরমপন্থী নেতাদের সাম্প্রদায়িক হিংসা ও দাঙ্গাবাজি রাজনীতির কারণেই 'মুসলিম লীগ' নেতারা বাধ্য হয়ে সেদিন ভারতবর্ষের বিভক্তিতে সম্মত হয়েছিলেন। আজও পর্যন্ত তাদের সেই মুসলিম

---

১১৮. ৩য় বর্ষ, ১২তম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০০।

বিদ্বেষ ষোলআনা বজায় রয়েছে। বিভক্তির পর থেকে বিগত ৫৫ বছরে একটি বিদেশী পত্রিকার হিসাব মতে ভারতে ছোট-বড় অন্যূন ১৮০০০ প্রকাশ্য দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে। যেখানে হিন্দুরা ঘোষণা দিয়ে মুসলমানদের খুঁজে খুঁজে হত্যা করেছে এবং যেখানে নিহত মুসলিমের সংখ্যা ৫ থেকে ৬ লক্ষের মত। অসংখ্য কবরস্থানকে বানানো হয়েছে খেলার মাঠ কিংবা গরুর বাথান। দখল করা হয়েছে অগণিত মসজিদ। এমনকি মসজিদকে ক্লাব, সিনেমা হল বা গরুর গোয়াল বানানোর ঘটনাও ঘটেছে প্রচুর।

কিন্তু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশে বিগত ৫৫ বছরে অনুরূপ ৫টি দাঙ্গার ঘটনা কেউ দেখাতে পারবেন কি? যেখানে মুসলিম দাঙ্গাবাজরা কেবল ধর্মের কারণে হিন্দুদের খুঁজে খুঁজে প্রকাশ্যে হত্যা করেছে? নেই, একটিও নেই। তার কারণ 'ইসলাম'। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে পরধর্মে সহিষ্ণু হ'তে শিখিয়েছে। মানুষকে আল্লাহ্‌র সেরা সৃষ্টি মানুষ হিসাবে ভালবাসতে শিখিয়েছে। দ্বীনের ব্যাপারে কারো উপরে যবরদস্তি না করার নির্দেশ দিয়েছে। বিশ্বধর্ম ইসলামের এই বিশ্বজয়ী আদর্শকে বিশ্বের বৈষয়িক শক্তিধর মোড়লরা সর্বদা ভয়ের চোখে দেখে। আর তাই ইসলামের অগ্রযাত্রাকে তারা যেকোন মূল্যে রুখে দিতে চায়। অজুহাত না পেলেও নিজেরা অজুহাত সৃষ্টি করে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে বসবাসকারী মুসলমানদের উপরে তারা চালিয়ে যাচ্ছে একের পর এক লোমহর্ষক নিধনযজ্ঞ। ইহূদী-খ্রিষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদী লবী একাট্টা হয়ে আজ নিশ্চিহ্ন করে চলেছে ফিলিস্তীন, কাশ্মীর ও আফগানিস্তানের মুসলিম পরিচিতিকে। ইরাকে বিগত সোয়া একযুগ ধরে তারা চালিয়ে যাচ্ছে নিষ্ঠুর ধ্বংসযজ্ঞ। সোমালিয়া, চেচনিয়া, ফিলিপাইনে চলছে তাদের হিংস্র আগ্রাসন। লিবিয়া ও ইরানের প্রতি রয়েছে তাদের সদা শ্যেনদৃষ্টি। সর্বাধিক মুসলিম অধ্যুষিত দেশ ইন্দোনেশিয়া থেকে পূর্ব তিমুর প্রদেশটিকে তারা ইতিমধ্যে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে। লৌহমানব বলে খ্যাত সুহার্তোকে হটিয়ে বহুদলীয় হৈ চৈ তন্ত্র সৃষ্টি করে সেখানে তাদের আজ্ঞাবহ দুর্বল শাসক বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ৩৭০০ কোটি ডলার ঋণের জালে আটকিয়ে পাকিস্তানী জেনারেলকে কাবু করে প্রথমে আফগানিস্তানকে পদানত করেছে। অতঃপর পাকিস্তানের ইসলামী শক্তিগুলিকে তার হাত দিয়েই নিশ্চিহ্ন করার নীলনকশা বাস্তবায়ন

করা হচ্ছে। বাকী রইল তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশকে পকেটস্থ করা। বর্তমানে তারই প্রক্রিয়া চলছে। যদিও এর সূচনা হয়েছে ভারত বিভক্তির পর থেকেই। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন কিছু তাযা ইস্যু সৃষ্টি করার এবং তার চাইতে বেশী প্রয়োজন হিন্দুবাদী নেতা বাজপেয়ী ও আদভানীর ক্ষমতায় টিকে থাকার।

প্রথমোক্ত কারণে গত ১লা অক্টোবর জাতীয় নির্বাচনের পরপরই তাদের এদেশীয় এজেন্টদের মাধ্যমে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের জিগির তোলা হয় এবং সেইসব নির্যাতনের কল্পচিত্র সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কলিকাতায় বসেই নীলনকশা আঁকা হয়। কিন্তু তাতে কোন লাভ হয়নি। গত ২২শে নভেম্বর জনৈক শীর্ষ ভারতীয় এজেন্ট ও ঘাদানিক নেতা ভিডিও-সিডি সহ ঢাকা বিমানবন্দরে হাতেনাতে ধরা পড়ায় তাদের সব জারিজুরি ফাঁস হয়ে যায়। ফলে এর মাত্র দু'মাসের মাথায় নতুন আরেকটি ইস্যু সৃষ্টির জন্য ২২শে জানুয়ারী কলিকাতার মার্কিন কনস্যুলেটে হামলা চালিয়ে দোষ চাপানো হয় বাংলাদেশের উপরে।

কিন্তু না, ষড়যন্ত্র বসে থাকবেনা। বাজপেয়ী-আদভানীকে ভারতের ক্ষমতায় টিকে থাকতেই হবে। তাই যে হিন্দুত্বকে উস্কে দিয়ে বিজেপি রাতারাতি ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়েছিল ও তাদের নেতা বাজপেয়ী ও আদভানী যথাক্রমে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হ'তে পেরেছিলেন, সেই প্রেসক্রিপশনকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি শাসিত গুজরাট প্রদেশে গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী মুসলিম নিধনযজ্ঞ শুরু করা হ'ল। তার আগে তারা কেন্দ্রীয় কোয়ালিশন সরকারের অন্যতম শরীক দল 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ' ও তার সহগামী শিবসেনা, বজরং প্রভৃতি জঙ্গী দলের মাধ্যমে ও বিশেষ করে কর সেবকদের মাধ্যমে ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর বিজেপি নেতাদের ইন্ধনে ধ্বংসপ্রাপ্ত ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদের স্থলে রামমন্দির নির্মাণের জন্য ১৫ই মার্চ ২০০২ শুক্রবার তারিখ ঘোষণা করে। যদিও এবিষয়ে সেদেশের সুপ্রিম কোর্টের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল, এর মাধ্যমে মুসলমানদের ক্ষুব্ধ করা এবং তাদেরকে নিধন করার জন্য ইস্যু তৈরীর সাথে সাথে নিজেদেরকে

হিন্দুত্বের সোল এজেন্ট হিসাবে যাহির করা। যাতে সর্বত্র হিন্দুত্বের উন্মাদনা সৃষ্টি হয় ও এর মাধ্যমে আগামী জাতীয় নির্বাচনে পুনরায় ক্ষমতায় আসা যায়। অতএব কাজটি হঠাৎ করে ঘটেনি; বরং পূর্ব পরিকল্পিতভাবে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে করা হয় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় গিয়েই।

‘কর সেবক’ নামীয় এইসব ধর্মান্ধরা গোদরা স্টেশনে নেমে একজন বৃদ্ধ মুসলিম দোকানদারের দাড়ি ধরে টানাটানি করে ও তাকে মারধর করে। এমতাবস্থায় তার ষোড়শী কন্যা বাপকে বাঁচাতে আসলে তারা বৃদ্ধকে রেখে তার মেয়েটিকে ট্রেনে উঠিয়ে নেয়। সন্তানকে উদ্ধারের জন্য বৃদ্ধের আর্ত চিৎকারে দু’জন হকার লাফিয়ে চলমান ট্রেনে উঠে চেইন টেনে ট্রেনটিকে স্টেশনের অদূরে থামিয়ে দেয়। তখন ট্রেনে অবস্থানরত কর সেবকরা লাঠিসোটা নিয়ে জনতার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এভাবেই শুরু হয় মারামারি। এক্ষণে ঐ উন্মত্ত জনতার মাঝে উগ্রবাদী শিবসেনা, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং প্রভৃতি দলের ক্যাডাররা যে লুকিয়ে ট্রেনে আগুন ধরিয়ে দেয়নি- একথা কে হলফ করে বলবে? অথচ মুসলমানদের নামে এই অগ্নিকাণ্ডের গুজব দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়া হয় সর্বত্র। অতঃপর শুরু হয় ব্যাপক মুসলিম নিধনযজ্ঞ। যে গুজরাটের মাটি মুসলমানদের রক্তে বারবার রঞ্জিত হয়েছে এবং যা মুসলমানদের বধ্যভূমি বলে পরিচিত, সেখানকার ভীত-কম্পিত মুসলমানেরা কোন সাহসে হিন্দুবাদী বিজেপির শাসনকালে হিন্দুদেরকে পুড়িয়ে মারার সাহস করবে? তাই আসল বিষয়টি বুঝতে কারু কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

অতএব, হে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ! ধর্মনিরপেক্ষতার নামাবলী ছেড়ে প্রকৃত ধার্মিক হৌন! দেশে ধর্মীয় শিক্ষা ও পরিবেশ বজায় রাখুন। ধর্মান্ধ নয়, প্রকৃত ধার্মিক নাগরিক সৃষ্টি করুন। কেননা ধার্মিক ব্যক্তিগণ কখনোই ধর্মের কারণে সহিংসতা করেন না। কারু জান-মাল-ইযযতের উপরে হামলা করেন না। বাংলাদেশী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরাও সাবধান হৌন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে দ্বীনদার ও ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ হওয়ার তাওফীক দিন। আমীন![১১৯]

১১৯. ৫ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মার্চ ২০০২।

৬৫. সীমান্তে পুশইন : মানবতা তুমি কোথায়?

গ্রীক দার্শনিক ডিয়োজেনিস (Diogenes) ভরদুপুরে জ্বলন্ত মোমবাতি নিয়ে কি যেন সন্ধান করছেন। লোকেরা জমা হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করতে লাগল- এই দুপুর বেলা রোদের মধ্যে আপনি মোমবাতি জ্বালিয়ে কি খুঁজছেন। ব্যাকুল দার্শনিক উদাস নেত্রে লোকদের দিকে তাকিয়ে বললেন, to search man 'মানুষ খুঁজছি'।

হিটলার-মুসোলিনীর উত্তরসুরী বুশ-ব্লেয়ার-শ্যারণ চক্রের পশুসুলভ আস্ফালন দেখে প্রত্যেক জ্ঞানবান মানুষের মধ্যে যখন ক্ষুব্ধ বিবেক ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠছে, গত এক যুগের অধিককাল ধরে 'বিশ্ব সংস্থা' কর্তৃক আরোপিত অর্থনৈতিক অবরোধের ফলে ক্ষুধায় ও অপুষ্টিতে মৃত্যুবরণকারী ইরাকের প্রায় ১৫ লক্ষ বনু আদমের মৃত্যু ছাড়াও রোগজর্জর ইরাকীরা যখন জীবনযুদ্ধে বিপর্যস্ত, তখন মড়ার উপরে খাড়ার ঘায়ের মত মানবাধিকারের বিশ্বমোড়ল বুশ-ব্লেয়ার গোষ্ঠী হিংস্র নেকড়ের মত অর্ধমৃত ইরাকীদের উপরে হামলে পড়ার জন্য লেজ পাকাচ্ছে। নিজ দেশের ও অন্য দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের বিশাল বিশাল যুদ্ধ বিরোধী প্রতিবাদ সমাবেশের গগণবিদারী শ্লোগানমুখর জোরালো দাবীসমূহ এইসব তথাকথিত গণতন্ত্রী ও মানবাধিকার বাদীদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না। আতংকিত বিশ্ববাসীর দৃষ্টি যখন ইরাকের দিকে, ঠিক সেই মুহূর্তে মুসলিম উম্মাহ্র আরেক জাত দুশমন আদভানী-বাজপেয়ী চক্র বাংলাদেশ সীমান্ত জুড়ে সর্বত্র 'পুশইন' বর্বরতা শুরু করেছে। 'পুশইন' অর্থ ধাক্কা দিয়ে ঢুকাও আর 'পুশব্যাক' অর্থ ধাক্কা দিয়ে ফিরিয়ে দাও। ১৯৯৪-৯৫ সালে বিএনপি সরকার যখন ক্ষমতায় ছিল, তখন একবার এই মরণ খেলা শুরু করেছিল ভারত। সেদেশের বাংলাভাষী মুসলমানদেরকে বিনা অপরাধে গরু-ছাগলের মত ধরে এনে সীমান্তে জড়ো করে মেরে-পিটিয়ে-ধাক্কিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকিয়ে দিয়ে এই ছোট্ট দেশটিকে আরও সমস্যা ভারাক্রান্ত করা এবং ভয় দেখিয়ে বাংলাদেশ সরকারকে ভারতের নতজানু হ'তে বাধ্য করাই ছিল সেই নোংরা কূটনীতির লক্ষ্য। এবারও আমাদের সরকারের উপরে চাপ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ঘোষণা দিয়েই তারা এই বর্বরতা শুরু করেছে।

১৯৯২ সালে বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার নায়ক বর্তমানে ভারতীয় স্বরাষ্ট্র ও উপ-প্রধানমন্ত্রী এল. কে. আদভানী কিছুদিন পূর্বে সেদেশে '২ কোটি বাংলাদেশী অবৈধভাবে বসবাস করছে' বলে হুমকি দিয়েছিলেন। তার পরেই গত ২২শে জানুয়ারী'০৩ থেকে তাদের এই জঘন্য 'পুশইন' তৎপরতা শুরু হয়। দিল্লী, বোম্বে, মহারাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রদেশ থেকে বাংলাভাষী মুসলিম নাগরিকদের ধরে প্রচণ্ড শীতের মধ্যে সীমান্তে এনে খোলা আকাশের নীচে এমনকি কাদাপানির মধ্যে নামিয়ে দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকে পড়তে বাধ্য করা হচ্ছে। আসতে না চাইলে বন্দুকের বাঁট ও লাঠি দিয়ে গরুপেটা করা হচ্ছে। ভারতের সীমান্তরক্ষী বিএসএফ দস্যুদের নির্যাতন সইতে না পেরে জনৈকা মহিলা আয়েশা খাতুনের গর্ভ খালাস হয়ে গেছে। নির্যাতিতা যায়েদা খাতুন দু'শিশু সন্তান নিয়ে চলন্ত বাসের নীচে ঝাঁপ দিয়ে জীবনের জ্বালা নিবারণ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। জানিনা আজকে পর্যন্ত ঐ অভুক্ত ও তৃষ্ণার্ত বেদনাহত বোনটি বেঁচে আছে কি-না। ত্রিশোর্ধ পেয়ারা খাতুন ২ ছেলে ও ২ মেয়ে নিয়ে কয়দিন অভুক্ত থাকার পর একটু খাবার পেয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বলেন, 'আল্লাহ বাঁচাও'। তার অবুঝ শিশুরা ক্রন্দনরতা মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে ফ্যাল ফ্যাল করে। ওরা জানেনা তাদের অপরাধ কি? দিল্লীর সীমাপুর বাঙ্গালী পল্লীর বাসিন্দা তারা। তাদের নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট ও রেশন কার্ড আছে। পুলিশ তাদের সবকিছু কেড়ে নিয়ে বেঁধে এনেছে সীমান্তে পুশইন করার জন। স্বামী মনছূর আলী ঐসময় ছিলেন মৃত্যুশয্যায়। পিয়ারা বেগম জানেনা তার স্বামীর অবস্থা এখন কি। ভারতীয় পুলিশেরা তাদের প্রতি হুংকার ছেড়ে বলছে 'কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবি, আমরা বাংলাদেশী। নইলে গুলি করে মেরে ফেলব'। তাদের মারের চোটে কারো মাথা ফেটেছে, কারো মাজা ভেঙ্গেছে, কারু হাত-পা ভেঙ্গেছে। পিছনে বিএসএফ সম্মুখে বিডিআর। পিছনে গুলি সম্মুখে গুলি। অথচ তারা জানেনা কি তাদের অপরাধ। এই হ'ল ভারতীয় দানবদের পুশইন তৎপরতার বাস্তব চিত্র। অর্ধ মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও তথাকথিত গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের ধ্বজাধারীরা নিশ্চুপ।

বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারত ধর্মনিরপেক্ষতার পৈতা গলায় ঝুলিয়ে মুসলিম নিধনযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে দেশের সর্বত্র। জাতিসংঘের এই সদস্য রাষ্ট্রটি

জাতিসংঘের ২৫৬ নং প্রস্তাব মেনে নেওয়া সত্ত্বেও বিগত ৫৪ বছর যাবত তা অমান্য করে চলেছে এবং আজও কাশ্মীরী মুসলমানদের উপরে তারা অবর্ণনীয় যুলুম-নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ বিশ্বমানবতা নিশ্চুপ। এবার তারা বাংলাদেশ-এর দিকে মুখ ফিরিয়েছে। শান্তিবাহিনী, বঙ্গসেনা ইত্যাদি বাহিনী তাদেরই সৃষ্টি। পুশইন-এর ন্যায় অমানবিক ক্রিয়াকর্মে সম্ভবতঃ ভারতই বিশ্বে প্রথম পথিকৃৎ। নিজ দেশের নিরীহ নাগরিকদেরকে মানবঢাল হিসাবে বন্দুকের নলের দিকে ঠেলে দেওয়ার এই মর্মভেদী আচরণ এযাবত বিশ্বের কোন দেশ করেছে কি-না আমাদের জানা নেই।

বুশ-ব্লেয়ার চক্র ইরাকে ব্যাপক বিধ্বংসী মারণাস্ত্র খুঁজতে জাতিসংঘকে ব্যবহার করছে। অথচ পাশেই ইসরাঈলে যে ভুরি ভুরি বিধ্বংসী মারণাস্ত্রের ডিপো রয়েছে, সেগুলির ব্যাপারে কারু কোন মাথাব্যথা নেই। ঐ দুষ্টচক্রের উদ্দেশ্য ইরাকের তথা মধ্যপ্রাচ্যের বিপুল তৈল সম্পদ দখল করা। প্রতিবেশী ভারতেরও প্রধান লক্ষ্য বাংলাদেশের বাজার দখল করার সাথে সাথে তার মাটির নীচে লুকিয়ে থাকা অফুরন্ত তৈলের ভাণ্ডার করায়ত্ত করা। ইতিমধ্যেই সুন্দরবন সীমান্তে তৈলকূপ খনন করে সে আমাদের তৈল সম্পদ শোষণ করতে শুরু করেছে। দক্ষিণ তালপট্টির প্রায় সিকি বাংলাদেশ এলাকা সে দখল করে নিয়েছে। যেমন নিয়েছে ইতিপূর্বে বেরুবাড়ী এলাকাটি। ভাতে মেরে, পানিতে মেরে সে বাংলাদেশকে করায়ত্ত করতে চায়। আর সেজন্যেই সিরাজুদ্দৌলাদের হটিয়ে সে এখানে তার তল্পীবাহক মীরজাফরদের ক্ষমতায় বসাতে চায়। এদেশের সাধারণ মানুষ তাদের প্রকৃত দুশমন রাষ্ট্রটিকে ইতিমধ্যেই চিনে ফেলেছে। তাই ভারত একদিকে এদেশের রাজনৈতিক দুর্বৃত্তদের হাত করার চেষ্টা করছে। অন্যদিকে উজানে পানি আটকিয়ে, শুকিয়ে-ডুবিয়ে এবং সর্বশেষ পুশইন অপতৎপরতার মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে ভীত-সন্ত্রস্ত্র করার নোংরা পথ বেছে নিয়েছে। সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ আজ তাদের হিংস্র লালসার শিকার। যে মানুষের কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রের সৃষ্টি, সেই মানুষই আজ নিজ হাতে গড়া রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বলি হচ্ছে। আর যেসব নেতারা এগুলো করছে, তারা গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও জনকল্যাণের কথা বলেই এগুলো করছেন। জনগণের ভোটে নেতা হয়ে ভোটারদের রক্তে

হাত রাঙাতে এদের একটুও বিবেকে বাঁধে না। তুলনাহীন মিথ্যাচার ও মুনাফেকীর মধ্যে তলিয়ে গেছে বিশ্ব রাজনীতির শীর্ষ অঙ্গন। গণতন্ত্রের নামে জনগণকে বিভক্ত করে ফায়েদা লোটার স্বার্থান্ধ ফেরাউনী রাজনীতি সারা বিশ্বকে আজ গ্রাস করেছে। আল্লাহ বলেন, '(তথাপি) লোকেরা ফেরাঊনের নীতির অনুসরণ করছে। যদিও ফেরাঊনের নীতি সঠিক পথে পরিচালিত ছিল না' *(হূদ ১১/৯৭)*। নিকটতম প্রতিবেশী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, 'ওদেরকে বের করে দেবই। কোনরূপ আপোষ করব না'। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, দিল্লী-কলিকাতা কূটনীতি একই ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। মনুষ্যত্ব, বিবেক, বিচারবোধ, ন্যায়-অন্যায় পার্থক্যবোধ সবই আজ স্বার্থান্ধ রাজনীতির সামনে গৌণ হয়ে গেছে।

সীমান্তে পুশইন চলছে। এরই মধ্যে বৃহত্তর খুলনা, যশোর ৬টি যেলাকে নিয়ে স্বাধীন 'বঙ্গভূমি' আন্দোলনের নেতারা হুমকি দিয়েছে, আগামী ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারা বিশাল সশস্ত্র ব্রিগেড নিয়ে বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকবে। তারা দিল্লীকে অনুরোধ করেছে শীঘ্র বাংলাদেশ দখল করে নেওয়ার জন্য। ভারত গুজরাটে সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা মাথায় পূর্বপরিকল্পিতভাবে হাযার হাযার মুসলমানকে হত্যা করল, তাদেরকে গৃহহারা করল, নিজ মাতৃভূমি থেকে উৎখাত করল, এত কিছুর পরেও সে গণতন্ত্রী এবং মানবাধিকারবাদী আমেরিকার বন্ধু। বাংলাদেশের ৫৪টি নদীর উজানে বাঁধ দিয়ে ১৫ কোটি বাংলাদেশীকে পানিতে ডুবিয়ে ও শুকিয়ে মারার মরণ ফাঁদ বানিয়ে রেখেও সে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র নয়, বরং বিশ্বের সেরা গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ উদারনৈতিক রাষ্ট্র। গণতন্ত্র, মানবাধিকার, স্বাধীনতা ও স্বাধিকারবাদীরা তোমরা আজ কোথায়?

হযরত লূত্ব (আঃ) নিজের কওমকে উপদেশ দিয়ে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে শ্লেষভরে বলেছিলেন, 'তোমাদের মধ্যে কি কোন ভাল মানুষ নেই'? *(হূদ ১১/৭৮)*। আজও তাই ভারতীয় নেতাদের বলতে ইচ্ছা করে 'তোমাদের মধ্যে কি কোন মানুষ নেই'?[১২০]

১২০. ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ২০০৩।

৬৬. ইহূদীরা বিশ্ব শাসন করছে!

গত ১৬ ও ১৭ অক্টোবর'০৩ মালয়েশিয়ার প্রশাসনিক রাজধানী পুত্রজায়ায় অনুষ্ঠিত পৃথিবীর ৫৭টি মুসলিম রাষ্ট্রের সংগঠন ওআইসির ১০ম শীর্ষ সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে মালয়েশিয়ার বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী ৭৩ বছর বয়স্ক মাহাথির মুহাম্মাদ তাঁর উদ্দীপনাময় ভাষণে বলেন যে, 'ইহূদীরা অন্যদের মাধ্যমে পৃথিবী শাসন করছে'। তাঁর এই বক্তব্যে ইহূদীদের মদদদাতা খ্রিষ্টান বিশ্বের ক্রুসেড কণ্ঠ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ জুনিয়র বুশ তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে মাহাথিরকে দুঃখ প্রকাশ করতে বলেছেন। মাহাথির এসবের ধারে কাছে না গিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করেন, ওরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে এমনকি তাদের নবীর বিরুদ্ধে ঢালাও বক্তব্য দিয়ে পার পেয়ে যাবে, আর আমরা তাদের বিরুদ্ধে সামান্য কিছু বললেই সন্ত্রাসী বা সন্ত্রাসের মদদদাতা বনে যাব, এটা হ'তে পারে না। তিনি বলেন, আমার বক্তব্যে ইউরোপ-আমেরিকার নেতৃবৃন্দ ক্ষুব্ধ হওয়াতেই প্রমাণিত হয় যে, ইহূদীরা কাদের মাধ্যমে বিশ্ব শাসন করছে। অথচ এই ইউরোপীয়রাই ১ কোটি ২০ লাখ ইহূদীর ৬০ লাখকেই হত্যা করেছিল'। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইহূদীরা আজ ইউরোপীয়দের ঘাড়ে বন্দুক রেখে সারা বিশ্বে ছড়ি ঘুরাচ্ছে। যাকে তাকে চোখ রাঙিয়ে কথা বলছে। সমস্ত আরব বিশ্বকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রেখেছে। এমনকি সমস্ত মুসলিম বিশ্বকে টার্গেট করার অজুহাত সৃষ্টির জন্য সুপরিকল্পিতভাবে তারা ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরের টুইন টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনা ঘটায়। এরপর থেকেই তাদের বরকন্দাজ প্রেসিডেন্ট বুশ তার শাসনকালের প্রথম দু'বছরেই আফগানিস্তান ও ইরাক দু'টি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রকে গ্রাস করেছে। পাকিস্তানকে বগলদাবা করেছে। সঊদী আরব, ইরান ও সিরিয়ার দিকে এখন বন্দুক তাক করে রেখেছে। যেকোন সময়ে সে ঐসব অঞ্চলে হামলে পড়ে মুসলমানদের জান-মাল, ইয্যত লুণ্ঠন ও তৈল শোষণে মেতে উঠবে।

মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দ দেখছেন ও বুঝছেন সবকিছু। কিন্তু তারা কিছুই করতে পারছেন না প্রধানতঃ কয়েকটি কারণে। ১. অতি ভোগবাদী, বিলাসী ও অলস মস্তিষ্ক হওয়ার কারণে নেতৃস্থানীয় মুসলিম রাষ্ট্রনেতাদের ও ঐসব দেশের এলিট শ্রেণীর অধিকাংশের চিন্তাশক্তির প্রখরতা, আত্মসম্মানবোধ ও লক্ষ্য অর্জনের দৃঢ়তা ভোঁতা হয়ে যাওয়া। ২. অধিকাংশ মুসলিম দেশে ইহূদী-

খ্রিষ্টানদের চালান করা গণতন্ত্রের নামে দলাদলি ও পারস্পরিক হিংসা-প্রতিহিংসার রাজনৈতিক কালচার চালু হওয়া। প্রথমোক্ত দলের নেতাগণ তাদের তৈল বিক্রির অর্থ জমা রেখেছেন পাশ্চাত্যের ব্যাংকগুলিতে। আর এভাবেই তারা বন্দী হয়ে আছেন ইহূদীদের হাতে। শেষোক্ত দলের নেতাগণ আভ্যন্তরীণ হিংসা-হানাহানি ও শোষণ-লুটপাটের রাজনীতির ফলে রাজকোষ খালি করে ইহূদী নিয়ন্ত্রিত বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ নেতাদের কাছে ঋণ ও অনুদান প্রাপ্তির আশায় সর্বদা ঘুরে বেড়ান ভিক্ষুকের মত। ফলে তারাও বন্দী হয়ে আছেন ইহূদীদের কাছে। এভাবে মুসলিম বিশ্বের কোন দেশই আজ প্রকৃত অর্থে স্বাধীন নয়।

রাষ্ট্র নেতাদের চরম ব্যর্থতায় বিপর্যস্ত সমাজের হতাশাগ্রস্ত মানুষ অবশেষে নিজেদের জীবন বাজি রেখে চূড়ান্ত পন্থা বেছে নিয়ে থাকে। যা অনেক সময় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসীদের সাময়িকভাবে হ'লেও নিবৃত্ত করে। উপমহাদেশে বৃটিশ বিরোধী জিহাদ আন্দোলন ও বিভিন্ন সময়ের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং বর্তমান কালে কাশ্মীর, ফিলিস্তীন, আফগানিস্তান, চেচনিয়া ও ইরাকী জনগণের মুক্তি আন্দোলন একথাই মনে করিয়ে দেয়। যদিও এসব বিচ্ছিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। ইহূদী নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া ও রাষ্ট্রনেতারা এইসব প্রতিরোধ আন্দোলনকে আজকাল সন্ত্রাসবাদ বলে আখ্যায়িত করছে নিজেদের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে আড়াল করার জন্য। জানিনা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে তারা কি বলে আখ্যায়িত করবেন।

ইতিমধ্যেই ইহূদী-নাছারা নিয়ন্ত্রিত এনজিও গোষ্ঠী তাদের ঋণের জালে বাংলাদেশের জনগণকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। তাদেরই তাঁবেদার বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ-এর চোখ রাঙ্গানিতে দেশ চলছে ভীত-সন্ত্রস্ত গতিতে। অতএব ইহূদী-নাছারা ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ত্রয়ী শক্তির হিংস্র থাবা থেকে বাঁচার জন্য হে নিপীড়িত জনগণ গা ঝাড়া দিয়ে জেগে ওঠো। আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে এসো। ঐ শোন আল্লাহ্র ঘোষণা : '(হে নবী!) ইহূদী-নাছারাগণ কখনোই তোমার উপরে খুশী হবে না যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মের অনুসারী হবে। তুমি বল, আল্লাহ্র হেদায়াতই চূড়ান্ত হেদায়াত। এক্ষণে যদি তুমি তাদের স্বেচ্ছাচারিতার অনুসারী হও তোমার নিকটে ইল্ম (অহি-র জ্ঞান) এসে যাওয়ার পরেও, তাহ'লে

তোমার জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন অভিভাবক বা কোন সাহায্যকারী থাকবে না *(বাক্বারাহ ২/১২০)*। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন![১২১]

৬৭. সুনামি : ক্বিয়ামতের আগাম সংকেত

আল্লাহ বলেন, 'হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের কম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদায়িনী মা তারা কোলের শিশুকে ভুলে যাবে, গর্ভবতীর গর্ভ খালাস হয়ে যাবে এবং মানুষকে তোমরা দেখবে মাতাল সদৃশ। অথচ তারা মাতাল নয়। বস্তুতঃ আল্লাহ্র শাস্তি অতীব কঠোর' *(হজ্জ ২২/১-২)*। নিঃসন্দেহে গত ২৬শে ডিসেম্বর'০৪ রবিবারের সুনামি (Tsunami) কোন ক্বিয়ামত ছিল না। কিন্তু তা সারা বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিয়েছে, সৃষ্টিকে লণ্ডভণ্ড করেছে, এমনকি আস্ত পৃথিবীকে একদিকে এক ইঞ্চি কাত করে দিয়েছে। তাতে আবহাওয়া ও প্রকৃতিতে আসতে শুরু করেছে ব্যাপক বিপর্যয়। অনেক জনপদ তলিয়ে গেছে সাগরের নীচে চিরদিনের মত। অনেক তলদেশ উপরে উঠে এসেছে। আজকের নিউজিল্যাণ্ড এককালে যেমন ছিল বিশাল সাগর। অনুরূপভাবে আজও যদি আস্ত ভারতবর্ষ তলিয়ে গিয়ে ভারত মহাসাগরে আরেকটি নতুন মহাদেশের সৃষ্টি হয়, তাতেও বিস্মিত হবার কিছু নেই। কারণ প্রকৃতির নিয়ামক মানুষ নয়। সবকিছু নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্র হুকুমে। ভারত মহাসাগরের তলদেশে দু'টি টেকটোনিক প্লেট-এর উপর-নীচে সংঘর্ষে সৃষ্ট ভূমিকম্পের মাত্র চার সেকেণ্ডের ধাক্কায় মহাসাগর ও ভূপৃষ্ঠে এমনকি মহাবিশ্বে যে আলোড়ন হয়েছে, সেটা কি আগামী দিনে পৃথিবী নিশ্চিহ্নকারী ক্বিয়ামতের আগাম সংকেত নয়? এটাই তো কুরআনে বর্ণিত 'কুন ফাইয়াকূন'-এর বাস্তব রূপ। পথভোলা মানুষকে পথে ফিরানোর জন্য সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে মাঝে-মধ্যে এরূপ ধাক্কা ও পরীক্ষা নাযিল হয়ে থাকে। নবীগণ যুগে যুগে মানুষকে সেকথাই স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেছেন। এবারের সুনামিতে একটি বিরল ঘটনা ঘটেছে যে, পানি নাকি দেওয়ালের মত কোন কোন স্থানে ৩৩ ফুট ঊর্ধ্বে উঠে দাঁড়িয়ে ছিল। এই স্থির ঢেউ পরবর্তীতে তীব্র গতিতে আশপাশে ছড়িয়ে পড়ে। একটি ঢেউয়ের পরবর্তী ঢেউ কখনো এক ঘণ্টার ব্যবধানে এসেছে। যার গতিবেগ ছিল ঘণ্টায়

---

১২১. ৭ম বর্ষ ২য় সংখ্যা নভেম্বর ২০০৩।

৮০০ কিলোমিটার। এই ঘটনা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় নীলনদের পানি দাঁড়িয়ে থাকার কথা। যে পানির দেওয়ালের মাঝ দিয়ে নবী মূসা (আঃ) ও বনু ইস্রাঈলগণ নদী পার হয়ে যান ও পশ্চাদ্ধাবনকারী ফেরাঊন ও তার সৈন্যদল সেখানে ডুবে মরে।

মূসা ও ফেরাঊনের যুগের কয়েক হাযার বছর পরে বিজ্ঞান এখন অনেক এগিয়ে গেছে। এখন ভূমিকম্প বা পানিকম্প পরিমাপক যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। সেকারণ সুনামি-র ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হওয়ার অনেক আগেই মানুষ জেনে ফেলতে পারে এবং হুঁশিয়ার হয়ে আত্মরক্ষা করতে পারে। আধুনিক মিডিয়ার মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যে তা সারা বিশ্বে জানিয়েও দেওয়া যেতে পারে। তবুও কেন এত প্রাণহানি হ'ল? যেখানে পশু-পক্ষীরা তাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আগেই বুঝতে পেরে আত্মরক্ষা করতে পারল, সেখানে মানুষ কেন পারল না? এর জবাব যা জানা গেছে তা অতীব মর্মান্তিক, যা সুনামি-র ভয়াবহতার চাইতে ভয়াবহ। সেটা এই যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াইতে Natinal Oceanic and Atmospheric Adminstration (NOAA) ‘নোয়া’ নামক যে সংস্থা রয়েছে, তার সদস্য সংখ্যা হ'ল ২৬টি দেশ। এই ২৬টি দেশের বাইরে তারা কাউকে সুনামি-র আগাম তথ্য প্রদান করে না। এবারের সুনামি উৎপন্ন হওয়ার ১৫ মিনিটের মধ্যেই মহাকাশ পরিভ্রমণরত মার্কিন উপগ্রহে তা ধরা পড়ে বলে সংস্থার নেতা চার্লস ম্যাকরিনি বলেন এবং তার ৩ ঘণ্টা পরে সেটি এশীয় দেশগুলির উপকূলে আঘাত হানে। এই মার্কিন সংস্থাটি তাদের সদস্য দেশগুলিকে এ খবর সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেয়, যাদের সুনামি আঘাত হানার সম্ভাবনাই ছিল না। অথচ মানবাধিকারের ফেরিওয়ালা মার্কিনীরা এশীয় দেশগুলিকে আগাম জানালে লাখ লাখ বনু আদমের অমূল্য জীবন রক্ষা পেত। এখন তারা ঘটা করে যখন ত্রাণ সাহায্যের ঘোষণা দিচ্ছে, সেখানেও দেখা যাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মাত্র ৩৫ কোটি ডলার এবং বৃটেন মাত্র ৯ কোটি ৬০ লাখ ডলারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। অথচ মার্কিন সরকার গত ৬৫৬ দিনে ইরাক ধ্বংসে ব্যয় করেছে ১৪,৮০০ কোটি ডলার এবং বৃটেন ব্যয় করেছে ১১৫০ কোটি ডলার। দেখা যাচ্ছে, সুনামিতে মার্কিনের প্রতিশ্রুত সাহায্যের পরিমাণ ইরাক যুদ্ধে তাদের মাত্র দেড় দিনের ব্যয়ের সমান। এরপরেও তারা সাহায্যের বিনিময়ে সেখানে ধর্মান্তর প্রক্রিয়া শুরু করেছে বলে ‘ইন্দোনেশীয়

ওলামা পরিষদ' অভিযোগ তুলেছে। এমনকি এই সুযোগে তারা ঐসব দেশে স্থায়ী সেনাঘাঁটি বানাবার পাঁয়তারা করছে। তাই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের চাইতে এখন মানবসৃষ্ট বিপর্যয়ই অধিক ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। নমরূদ ও ফেরাঊনরা চিরদিন এটা করে গেছে, আজও করে চলেছে। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন, 'ভূমিতে ও পানিতে সর্বত্র বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে মানুষের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কিছু কিছু স্বাদ আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে' *(রূম ৩০/৪১)*।

উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষের বাড়াবাড়ি চরমে উঠে গেলে মাঝে-মধ্যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারী সংকেত নেমে আসে গযবের আকারে। এ গযব কখনো সরাসরি ঐ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উপরে আসে, যেমন ফেরাঊন ও তার লোক-লষ্করের উপরে এসেছিল। কখনো অন্যের উপরে আসে অত্যাচারীদের সাবধান করার জন্য। এর মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিতে চান যে, এ পৃথিবী ও মহাবিশ্বের সৃষ্টি, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা সবই আল্লাহ্র হাতে। যেমন তিনি বলেন, 'তাঁর নিদর্শন সমূহের অন্যতম এই যে, তাঁরই আদেশে আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত আছে। অতঃপর তিনি যখন ডাক দিবেন, তখন তোমরা সবাই মৃত্তিকা থেকে উঠে আসবে'। 'নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর। সবাই তাঁর আজ্ঞাবহ' *(রূম ৩০/২৫-২৬)*।

আজ পৃথিবী এক ইঞ্চি কাত হয়ে গেছে। যার ফলে হিমালয়ের বরফ গলে প্লাবিত হ'তে পারে তার পাদদেশের অঞ্চলগুলি। ভারত ও চীনে দেখা দিতে পারে প্রচণ্ড খরা। বাংলাদেশ ক্রমে সরে যাচ্ছে উত্তর-পূর্বদিকে। ইতিমধ্যে যমুনা নদীর তলদেশে অস্বাভাবিক পরিবর্তন এসেছে। দু'দিনের মধ্যেই নাব্যতা সংকট দেখা দিয়েছে নাকালিয়া পয়েন্টে। অতঃপর পৃথিবী যদি আরেকটু কাত হয়ে যায় ও দিক পরিবর্তিত হয়ে সূর্য পূর্বদিকের বদলে পশ্চিম দিকে ওঠে, তবে সেটাই হবে ক্বিয়ামতের প্রথম আলামত,[১২২] যা পৃথিবীকে চূড়ান্ত ধ্বংসে নিক্ষেপ করবে। অতএব হে মানুষ! সুনামি থেকে শিক্ষা নাও। আল্লাহকে ভয় কর। অন্যায়-অত্যাচার থেকে বিরত হও। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন আমীন![১২৩]

---

১২২. মুসলিম হা/২৯৪১; মিশকাত হা/৫৪৬৬ 'ফিৎনা সমূহ' অধ্যায়।
১২৩. ৮ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ২০০৫।

মুসলিম বিশ্ব

৬৮. ইরান-আফগান সংকট

মুসলিম বিশ্বের অন্যতম দু'টি দেশ ইরান ও আফগানিস্তান। সুন্নী মতাবলম্বী তালেবান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত আফগানিস্তান। অপর দিকে শী'আদের দ্বারা শাসিত ইরান। দেশ দু'টির মধ্যে ভয়াবহ উত্তেজনা বিরাজ করছে। যেকোন সময় ভয়ঙ্কর সংঘাত লেগে যেতে পারে। সম্প্রতি আফগানিস্তানের মাযার-ই শরীফে তালেবান কর্তৃক ইরানের ৯ জন কূটনীতিক হত্যাকে কেন্দ্র করেই মূলতঃ দু'দেশের মধ্যে সম্পর্কের এই চরম অবনতি। ইরান ২ লাখ ৭০ হাযার সৈন্য, অসংখ্য ট্যাঙ্ক, কামান ও জঙ্গী বিমান মোতায়েন করে স্মরণকালের বৃহত্তম সামরিক মহড়া শুরু করেছে আফগান সীমান্তে। অপরপক্ষে তালেবান সরকারও ১০ হাযার সৈন্য মোতায়েন করেছে। প্রতিবেশী দু'টি মুসলিম দেশের এই অবস্থা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। যেখানে ইসলামী আদর্শে উজ্জীবিত পাশাপাশি ভ্রাতৃপ্রতিম দু'টি দেশ একত্রে অবিচ্ছিন্নভাবে পারস্পরিক আদর্শ বিশ্ববাসীকে উপহার দেয়ার কথা, সেখানে নিজেদের শত্রুসুলভ মহড়া মুসলিম বিশ্বকে তো হতাশ করেছেই, পাশাপাশি ইসলাম বিদ্বেষী বিশ্ব মোড়লদের হাত তালির সুযোগ করে দিয়েছে। পৃথিবী জুড়ে যখন ব্যাপক হারে মুসলিম নিধন চলছে, আন্তর্জাতিক চক্রান্তের শিকার হয়ে মুসলমানরা যখন প্রায় কোণঠাসা, বসনিয়া-চেচনিয়ার পরে এখন কসোভোয় যখন মুসলমানদের পাইকারীভাবে হত্যা করা হচ্ছে, গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে নিশ্চিহ্ন করা হচ্ছে, পার্শ্ববর্তী ভারতীয় কাশ্মীরে মুসলমানরা চরমভাবে নির্যাতিত হচ্ছে, তখন প্রতিবেশী দু'টি মুসলিম দেশের মধ্যে উত্তেজনা সত্যিই হতাশাব্যঞ্জক।

শী'আ-সুন্নী মতবাদই ইরান-আফগান বৈরিতার অন্যতম কারণ। চরমপন্থী শী'আ শাসিত ইরান কখনো চায় না যে, পৃথিবীর কোথাও সুন্নী রাষ্ট্র গড়ে উঠুক। ফলে ইসলামী ও আন্তর্জাতিক আইন লংঘন করে ৭ হাযার অসহায় তালেবান যুদ্ধবন্দীকে নির্দয়ভাবে হত্যা করতেও তারা বিন্দুমাত্র সংকোচ বোধ করেনি। প্রথমবার মাযার-ই শরীফ দখল করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসার সময় এই হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে। অথচ পরবর্তীতে মাযার-ই শরীফ

পুনর্দখলের সময় পূর্বের ঘটনার নাটের গুরু নয় জন ইরানী কূটনীতিক যুদ্ধাবস্থায় নিহত হ'লে ইরান উপরোক্ত ব্যবস্থা নেয়। ইরান মূলতঃ পূর্ব থেকেই সুন্নী নিধনে সচেষ্ট ছিল। শী'আ শাসক ইসমাঈল ছাফাভী (১৪৯৯-১৫২৪ খৃঃ) কর্তৃক ইরানে শী'আদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুন্নীদের একচেটিয়া হত্যাকাণ্ড এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ইসমাঈল ছাফাভী কর্তৃক সুন্নী হত্যার পর সম্ভবতঃ ইতিহাসের বৃহত্তম সুন্নী নিধন ছিল সম্প্রতি সাত হাযার তালেবান সুন্নী যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করা। মূলতঃ তালেবান কর্তৃক শী'আ অধ্যুষিত মাযার-ই শরীফ দখলের পর থেকেই ইরানের গাত্রদাহ শুরু হয়। ইতিপূর্বে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল তালেবানদের দখলে আসলে ইরান কাবুল থেকে স্বীয় দূতাবাস গুটিয়ে নেয়। মোটকথা তালেবানদের উত্থান ইরান কখনো মেনে নিতে পারেনি। পাশাপাশি দু'টি মুসলিম দেশের বৈরিতা আমাদের কাম্য নয়। বরং ইরানের উচিৎ নতুন মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে আফগানিস্তানকে স্বীকৃতি ও সমর্থন দিয়ে পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করা এবং ইসলাম বিদ্বেষী চক্রের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

ইসলাম শান্তির ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম উম্মাহ শতধা বিচ্ছিন্ন। ঐক্য, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের পরিবর্তে আজ পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা বিরাজমান। ফলে একদিকে যেমন আভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি, তেমনি ইসলামের শত্রুদের উপহাসের পাত্র হচ্ছি। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে ইসলামের একটি মাত্র দল ছিল। তাঁদের সংবিধান ছিল পবিত্র কুরআন ও রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী, সম্মতি ও কর্ম তথা হাদীছ। উদ্ভূত সমস্যাবলীর সমাধান তাঁরা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকেই নিতেন।

দুর্ভাগ্যজনক হ'লেও সত্য যে, পরবর্তীতে প্রথমে শী'আ-সুন্নী ও ৪র্থ শতাব্দীতে এসে তাক্বলীদী দর্শন সুন্নীদেরকে প্রথমতঃ চারটি প্রধান মাযহাবে বিভক্ত করে। ফলে মাযহাবী বিদ্বেষের কারণে বাগদাদ ধ্বংস হয়। অথচ আল্লাহ পাকের নির্দেশ ছিল 'তোমরা পরস্পরে সম্মিলিত ভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে ধারণ কর, সাবধান দলে দলে বিভক্ত হয়ো না' *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*। এই সুমহান বাণীর দিকে সামান্যতম ভ্রুক্ষেপ না করে আমরা অসংখ্য দলে-উপদলে বিভক্ত

হয়েছি। ফলে যে মুসলমানরা এক সময় অর্ধ জাহান শাসন করেছিল, সে মুসলমান আজ নিজ গৃহেও নিরাপদ নয়। কেউ কেউ ঐক্যের আহ্বান জানান বটে, কিন্তু নিজ মাযহাবী সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। এ যেন এমন যে, 'বিচার মানি কিন্তু তাল গাছটি আমার'। আমরা মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যের আহ্বান জানাই সকল বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে নিঃশর্তভাবে মেনে নেয়ার একটি মাত্র শর্তে। যখন আমরা এই শর্তের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারব তখন ঐক্য সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার তাওফীক দান করুন- আমীন![১২৪]

৬৯. কসোভোয় মুসলিম নির্যাতন

কসোভো বর্তমানে একটি বিপন্ন মানবতার নাম। কসোভোর সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণ সংখ্যালঘু খ্রিষ্টান সার্বদের হাতে নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে সবকিছু ফেলে নিঃস্ব হাতে বানের স্রোতের মত পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র সমূহে পালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কেন? কি তাদের অপরাধ? তাহ'লে আসুন একবার পিছন ফিরে তাকাই।

ইউরোপের বলকান অঞ্চলে আড্রিয়াটিক সাগর পাড়ে অবস্থিত বৃহত্তর যুগোশ্লাভিয়ার বিভিন্ন অংশে রয়েছে সার্বিয়া, ক্রোয়েশিয়া, বসনিয়া, হার্জেগোভিনা, কসোভো এবং আলবেনিয়া প্রভৃতি রাজ্য ও অঞ্চলগুলো। আলবেনিয়া, বসনিয়া, হার্জেগোভিনা ও কসোভোর অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান। দীর্ঘকাল ধরে যুগোশ্লাভিয়া তথা সার্বিয়ার শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট ও জাতিগত বৈষম্যের শিকার কসোভো ও অন্যান্য মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যগুলির মুসলমানদের মধ্যে অসন্তোষের আগুন ধিকিধিকি জ্বলছিল। ১৯৯১ থেকে ১৯৯২ সালের মধ্যে যুগোশ্লাভিয়া ফেডারেশনের ৪টি অঙ্গরাজ্য স্বাধীনতা ঘোষণা করে। একই ধারায় যখন বসনিয়া এবং হার্জেগোভিনা স্বাধীনতা ঘোষণা করল, তখন তাদের উপরে নেমে এল ইতিহাসের বর্বরতম নির্যাতন ও বিতাড়নের বিভীষিকাময় ইতিহাস। আন্তর্জাতিক ইহূদী-খ্রিষ্টান চক্র কোনক্রমেই ইউরোপের মাটিতে কোন স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বরদাশত

---

১২৪. ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৯৮।

করতে পারেনি। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত চার বছর একটানা প্রতারণা ও পোড়ামাটি নীতি অনুসরণ করে হাযার হাযার মুসলমানকে হত্যা ও প্রায় ৬ লাখ মুসলমানকে বিতাড়িত করে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনাকে পঙ্গু করে দিয়ে তারা ক্ষান্ত হয়। সার্ব খ্রিষ্টানদের পক্ষ নিয়ে এ সময় রাশিয়া প্রকাশ্যে অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক ভূমিকা রাখা।

এইভাবে সব অঙ্গরাজ্য হারিয়ে এখন যুগোশ্লাভিয়া বলতে রয়েছে সার্বিয়া ও মন্টেনিগ্রো। কসোভো উক্ত সার্বিয়া রাজ্যেরই একটি প্রদেশের নাম, যার ২০ লাখ অধিবাসীর মধ্যে মুসলমান ১৮ লাখ ও সার্ব খ্রিষ্টান মাত্র ২ লাখ। মুসলমান মূলতঃ পার্শ্ববর্তী আলবেনীয় বংশোদ্ভূত। তাই ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিকভাবে আলবেনীয়দের সাথে তাদের রয়েছে সার্বিক মিল। ফলে সার্বিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়েও তাদের রয়েছে স্বতন্ত্র ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। বর্তমান সংঘাতের মূল কারণ এখানেই। একদিকে উগ্র সার্ব জাতীয়তাবাদ, অন্যদিকে মুসলিম জাতিসত্তা ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। মার্শাল টিটোর আমল থেকে কসোভোর মুসলমানগণ যে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে আসছিল, বর্তমান যুগোশ্লাভ প্রেসিডেন্ট শ্লোবোদান মিলোসেভিচের সরকার সেটুকুও কেড়ে নিয়েছে। আলোচনার মাধ্যমে যখন এ সমস্যার সুরাহা হ'ল না। বরং কসোভোর যাবতীয় সরকারী চাকুরী-বাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, কল-কারখানা সর্বত্র সার্ব প্রাধান্য চাপিয়ে দেওয়া হ'তে লাগল, তখনই ১৯৯৮ সালের মার্চ মাসে কসোভোর পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল 'কসোভো লিবারেশন আর্মি' বা সংক্ষেপে 'কেএলএ'।

শুরু হ'ল সশস্ত্র সংগ্রাম। সার্ব পুলিশের পরে নেমে এল সার্ব সেনাবাহিনী তাদের হিংস্র থাবা নিয়ে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে ও মুসলিম নাগরিকদের নির্বিচার গণহত্যা চালাতে শুরু করল সার্ব সেনাবাহিনী। ফলে রাতারাতি উদ্বাস্তু হয়ে ছুটতে লাগল তারা পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে সবকিছু ফেলে রেখে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের টনক নড়ল। তারা আপোষ রফার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোন ফলোদয় হ'ল না। অবশেষে গত ২৪ শে মার্চ থেকে ন্যাটো বিমান হামলা শুরু করেছে। কিন্তু তাতে সার্বদের হিংস্রতা মোটেই

কমেনি; বরং আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্ষ্যাপা কুকুরের মত তারা মুসলমানদের উপরে হামলা ও নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। তাই অনেকেই ইতিমধ্যে ন্যাটোর বিমান হামলাকে মুসলিম বিশ্বকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য নিছক একটা 'আই ওয়াশ' বলে ধারণা করছেন। কম্যুনিস্ট রাশিয়া ও চীন সার্ব দস্যুদের প্রকাশ্য সমর্থন দিয়েছে এবং তাদের উপরে ন্যাটো হামলার নিন্দা করেছে। প্রতিবেশী অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো যুগোশ্লাভ সরকারকে আদর্শিক কারণে নৈতিক সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে অথবা চুপ রয়েছে। বসনিয়ার মত কসোভোর বিরুদ্ধে যুগোশ্লাভ সরকার পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করেছে এবং ইতিমধ্যেই কসোভোর ৬ লাখ মুসলমান পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহে আশ্রয় নিয়েছে। কসোভোকে মুসলিম শূন্য অথবা মুসলিম সংখ্যালঘু অঞ্চলে পরিণত করার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে তারা এগোচ্ছে। কেননা ন্যাটো বা বৃহৎ শক্তি বলয়ের কেউই এখনও কসোভোর স্বাধীনতাকে সমর্থন করেনি। অথচ কসোভোতে শান্তি প্রতিষ্ঠার একটিই মাত্র পথ খোলা রয়েছে। সেটা হ'ল তার পূর্ণ স্বাধীনতা। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যত দ্রুত এটা মেনে নিবে, তত দ্রুত সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

কসোভোর দুর্দশাগ্রস্থ ভাইদের খাদ্য, পানীয় ও আশ্রয় দানে সহযোগিতার হাত বাড়ানোর জন্য জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিকটে আহ্বান জানিয়েছে। কিন্তু দুঃখ হয় ওআইসি-র জন্য। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিত্বশীল এই সংস্থা আজও মুখ খোলেনি। যেমন খোলেনি পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশ। বিপন্ন মানবতা কি এমনিভাবেই কাঁদতে থাকবে? তবুও বলব 'মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয়, আঁধারে তার সূর্য হাসে; হারা শশীর হারা আলো অন্ধকারেই ফিরে আসে'। হজ্জের মহামিলনের মাসে এবং ঈদুল আযহার কুরবানীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিশ্ব মুসলিমের ঐক্যবদ্ধ ও দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলার উদাত্ত আহ্বান জানাই এবং সাথে সাথে কসোভো সহ বিশ্বের সকল প্রান্তের বিপন্ন মানবতার জন্য আল্লাহ্‌র নিকটে প্রার্থনা জানাই- 'আল্লাহ তুমি মযলূমদের সাহায্য কর'! আমীন![১২৫]

---

১২৫. ২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৯৯।

৭০. পাকিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থান

পারমাণবিক শক্তিধর একমাত্র মুসলিম দেশ পাকিস্তান এখন সামরিক শাসনের অধীনে। প্রতিবেশী চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতে যখন নতুন সরকারের অভিষেকের আয়োজন চলে, পাকিস্তানে তখন ঘটে সামরিক অভ্যুত্থান। অটল বিহারী বাজপেয়ী যখন কারগিল বিজয়ের পুরস্কার ঘরে তুলেন অর্থাৎ তৃতীয় বারের মত ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন, ঠিক তার প্রাক্কালেই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়ায শরীফের অপমানজনক পদচ্যুতি ঘটে। ১২ই অক্টোবর'৯৯ এক রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল পারভেয মোশাররফকে আকস্মিকভাবে বরখাস্ত করার পর এই অভ্যুত্থান ঘটে। জানা গেছে, মাত্র দু'সপ্তাহ আগে নতুন মেয়াদে সেনাপ্রধান পদে নিযুক্তি দেয়ার পর বিনা কারণেই প্রধানমন্ত্রী নওয়ায শরীফ জেনারেল পারভেয মোশাররফকে বরখাস্ত করেছিলেন এবং একই পদে নিযুক্তি দিয়েছিলেন অন্য একজন বিশ্বস্ত জেনারেলকে। অভিযোগ রয়েছে যে, দুই-তৃতীয়াংশ আসনে বিজয়ী হওয়ার পর নওয়ায শরীফ সাংবিধানিক শাসনের পরিবর্তে একনায়কসুলভ শাসনের দিকে ঝুঁকে পড়েন। মাত্র আড়াই বছরের শাসনামলে তিনি একজন প্রেসিডেন্ট, একজন প্রধান বিচারপতি, দু'জন নৌবাহিনী প্রধান, সিন্ধুর সরকার এবং দু'জন সেনাবাহিনী প্রধানকে বরখাস্ত করেন। সর্বোপরি সেনাপ্রধান জেনারেল পারভেয মোশাররফকে বরখাস্ত ও হত্যা প্রচেষ্টা চালিয়ে সেনা অভ্যুত্থানের সুযোগ তৈরী করে দেন। অতঃপর তিন দিন কার্যতঃ সরকারবিহীন চলার পর ১৫ই অক্টোবর শুক্রবার সারা দেশে যরূরী অবস্থা ঘোষণার মাধ্যমে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল পারভেয মোশাররফ প্রধান নির্বাহী হিসাবে দেশের সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ করেন। সংবিধান ও পার্লামেন্ট স্থগিত করা হয়। তবে প্রেসিডেন্ট রফীক তারার স্বপদে বহাল থাকেন।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার পর বিগত ৫২ বছরের মধ্যে প্রায় ২৪ বছরই পাকিস্তান সামরিক শাসনের অধীনে থেকেছে। ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ূব খান রাতের অন্ধকারে ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে সামরিক শাসনের সূচনা করেন। ১৯৬৯ সালে প্রবল গণরোষে

তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করেন জেনারেল ইয়াহ্ইয়া খানের কাছে। অতঃপর স্বাধীনতার ২৩ বছর পর ১৯৭০ সালে পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষমতায় আসেন যুলফিকার আলী ভুট্টো। ১৯৭৭ সালে জেনারেল যিয়াউল হক ভুট্টোকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করেন। ১৯৮৮ সালে এক রহস্যজনক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত না হওয়া পর্যন্ত যিয়াউল হক-এর সামরিক শাসন বহাল থাকে। এর আগে ১৯৮৫ সালে তিনি সামরিক শাসন তুলে নিলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই শুরু হয় নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের অভিযাত্রা।

পাকিস্তানের নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারগুলোর ইতিহাস আরো জঘন্য, আরো কলংকিত। বিগত ১১ বছরে প্রতিটি গণতান্ত্রিক সরকারই ক্ষমতা কুক্ষিগত করা ও আখের গোছানোর কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। ক্ষমতাসীন দল মাত্রই দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়েছে। নির্বাচিত সাংবিধানিক সরকারগুলোর সীমাহীন দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বেচ্ছাচারিতা, অসহনশীলতা প্রভৃতি কারণে জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। উক্ত সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যখন বিরোধী দলে অবস্থান নিয়েছে, তখন ঐ দল আবার বিপ্লবী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ চিত্র শুধু পাকিস্তানের নয়। বাংলাদেশ ও ভারত সহ তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমূহের প্রায় সবগুলোরই একই অবস্থা। নির্বাচনের পূর্বে ভাল মানুষী আচরণ এবং ক্ষমতাসীন হয়ে বিমাতাসুলভ আচরণ, বিরোধী মত ও প্রতিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন, সর্বোপরি ক্ষমতা স্থায়ী করতে যেকোন পদক্ষেপ গ্রহণ আজকের বিশ্বে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমূহের জন্য রূঢ় বাস্তবতা।

এর কারণ হিসাবে বলা চলে যে, গণতন্ত্রে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে জনগণের নামে স্বল্পসংখ্যক রাজনীতিকের হাতে। দলের নেতা উক্ত ক্ষমতার যথেচ্ছ ব্যবহার করেন। ফলে তিনি একসময় অহংকারী হয়ে চরম স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হন। গণতন্ত্রে গুণ ও যোগ্যতার চেয়ে সংখ্যার গুরুত্ব বেশী। সেকারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা ও সরকার প্রধানের স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রতিরোধ করার কেউ থাকে না। পাকিস্তানের নওয়ায শরীফ দুই তৃতীয়াংশের অধিক বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পার্লামেন্টে গিয়ে স্বেচ্ছাচারী হয়ে পড়েন। ফলে তাঁর

পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। অন্যদিকে সামরিক সরকারের পক্ষে স্বেচ্ছাচারী হওয়াটা আরও স্বাভাবিক ব্যাপার। এক্ষণে এ দু'য়ের মধ্যবর্তী পথ আমাদের তালাশ করতে হবে। যেখানে সার্বভৌমত্ব মানুষের হাতে থাকবে না। থাকবে আল্লাহ্র হাতে। হালাল-হারাম ও ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি মানুষ নির্ণয় করবে না, করবেন আল্লাহ। কোন সিদ্ধান্ত এককভাবে নয়, হবে যোগ্য ও গুণীজনের পরামর্শভিত্তিক এবং তা হবে আল্লাহ্র আইনের অধীন। যেখানে সংখ্যা নয়, বরং মেধা ও যোগ্যতা হবে নেতৃত্বের মাপকাঠি। সেই শূরা পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থাই হ'ল ইসলামী সরকার ব্যবস্থা। আমরা সেই ইলাহী শাসন ব্যবস্থাই মনে-প্রাণে কামনা করি। নইলে বর্তমান বিশ্বের গণতন্ত্র ও সামরিকতন্ত্রের মধ্যে চরিত্রগত কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন![১২৬]

৭১. বন্দী ফিলিস্তীন : জবাব সশস্ত্র জিহাদ

'উড়ে এল চিল জুড়ে নিল বিল' বলে বাংলায় একটি প্রবাদ বাক্য চালু আছে। আজকের ফিলিস্তীনের অবস্থা তাই। সংখ্যাগুরু ফিলিস্তীনী আরব মুসলিম জনগণকে বিতাড়িত করে বাহির থেকে আসা মুষ্টিমেয় সংখ্যক ইহূদী ফিলিস্তীনের শতকরা ৮০ ভাগ এলাকা গ্রাস করে সেখানে তাদের স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করেছে। আর সেখানকার স্থায়ী নাগরিক ফিলিস্তীনী জনগণ এখন সারা মধ্যপ্রাচ্যে উদ্বাস্তু হিসাবে দুর্বিষহ জীবনের ঘানি টেনে চলেছে। ইহূদী কামানের বিরুদ্ধে তাদের ইট-পাটকেল নিক্ষেপকে অভিহিত করা হচ্ছে 'সন্ত্রাস' বলে। এটাই হ'ল আজকের নিষ্ঠুর বাস্তবতা। আর এটা করছে মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী আমেরিকা-ব্রিটেন-ফ্রান্স-রাশিয়া তথা আন্তর্জাতিক পরাশক্তিগুলি।

ফিলিস্তীনের পরিচয় : ফিলিস্তীনের পূর্ব নাম 'কেন'আন'। হযরত নূহ (আঃ)-এর পঞ্চম অধঃস্তন পুরুষের নাম 'ফিলিস্তীন'। 'ক্রিট' ও 'এজিয়ান' সাগরের দ্বীপপুঞ্জ থেকে আগত ফিলিস্তীনীদের নামানুসারে এই অঞ্চল 'ফিলিস্তীন' নামে পরিচিত হয়। খ্রিষ্টানদের আগমনের বহু পূর্বেই এরা এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন

১২৬. ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৯৯।

করে। ফিলিস্তীনীরা 'অগনন' সম্প্রদায়ভুক্ত এবং আরব বংশোদ্ভূত। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের অভ্যুদয়ের সাথে সাথে তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। খলীফা আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর সময়ে ১৩-১৭ হিজরী সনে ফিলিস্তীন পূর্ণভাবে ইসলামী খেলাফতের অধীনস্ত হয়। তখন থেকেই ফিলিস্ত ীন মুসলিম দেশ হিসাবে পরিচিত। মাঝে ১০৯৬ হ'তে ১১৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ৯১ বছর খ্রিষ্টান ক্রুসেডাররা একে দখলে রেখেছিল। তারা 'মসজিদে আক্বছা'-এর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণকারী সত্তুর হাযারের অধিক মুসলমানকে এক সপ্তাহের মধ্যে হত্যা করেছিল। পরে ছালাহুদ্দীন আইয়ূবীর কাছে পরাজিত হয়ে খ্রিষ্টান দস্যুরা এদেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। এরপর দীর্ঘ ৪০০ বছর যাবত ফিলিস্তীন ওছমানীয় তুর্কী খেলাফতের শাসনাধীনে একটি প্রাদেশিক রাজ্য ছিল। তাদের নিজস্ব সরকার ছিল, ছিল পৌরসভা এবং রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে ওছমানীয় পার্লামেন্টে ছিল তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি।

এরপর মহাপ্রলয়ের মত বিশ্বব্যাপী ১ম মহাযুদ্ধের দাবানল জ্বলে উঠল ১৯১৪ সালে। যুদ্ধ শেষে 'ভার্সাই চুক্তি'র বলে ফিলিস্তীনকে নিয়ে নেয় বৃটেন। শুরু হয় বিপর্যয়। ১৯১৭ সালের ২রা নভেম্বর বৃটেন কর্তৃক 'বেলফোর' ঘোষণার ভিত্তিতে ১৯১৮ সাল থেকে বহিরাগত ইহূদীদের জন্য ফিলিস্তীনের দুয়ার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং সাথে সাথে তাদের যাবতীয় নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণাধিকার নিয়ে আইন প্রণয়ন করা হয়। ফলে বিভিন্ন দেশ থেকে ইহূদীরা এখানে এসে বসতি স্থাপন শুরু করে। ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী ১০,১৬২ বর্গমাইল জুড়ে প্রতিষ্ঠিত ফিলিস্তীনে (প্যালেস্টাইন) ১৯১৮ সালে বৃটিশ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে লোকসংখ্যা ছিল ৭০,৮০০। এর মধ্যে আরব ছিল শতকরা ৯৩ ভাগ এবং বাদবাকী ৭ ভাগ ছিল দেশীয় ইহূদী। মাত্র ৩০ বছর পরে ১৯৪৮ সালে ১৪ই মে যখন বৃটেন সেখান থেকে চলে আসে, তখন ফিলিস্তীনের লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ১৯,৫০,০০০। যার মধ্যে ২ লাখ দেশীয় ইহূদী, ৪ লাখ বহিরাগত ইহূদী ও বাদবাকী সাড়ে ১৩ লাখ সুন্নী আরব মুসলিম। ফিলিস্তীনের মর্যাদাগত পরিচয় হ'ল এই যে, এর বুকেই রয়েছে মুসলমানদের প্রথম ক্বিবলা ও মি'রাজের স্মৃতিধন্য 'বায়তুল আক্বছা'। প্রথমে কা'বা গৃহ নির্মাণের ৪০ বছর পর এ গৃহ নির্মিত হয়। পরবর্তীতে দাঊদ ও সুলায়মান (আঃ) কর্তৃক নির্মিত এটিই পৃথিবীর সর্ব প্রাচীন ও দ্বিতীয় ইবাদত

গৃহ। এখানে 'বেথেলহামে' ঈসা (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন এবং এখান থেকেই তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়। ক্বিয়ামতের পূর্বে তাঁর হাতেই এখানে ইয়াজূজ-মাজূজ ও দাজ্জাল ধ্বংস হবে। 'তূর' পাহাড়ও এখানে অবস্থিত।[১২৭]

উল্লেখ্য যে, পশ্চিমা শক্তিসমূহের চাপ ও প্ররোচনায় ১৯৪৭ সালের ২৯শে নভেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ফিলিস্তীনের বিভক্তি প্রস্তাব গ্রহণ করে। যেখানে ফিলিস্তীনে একটি পৃথক আরব রাষ্ট্র ও একটি পৃথক ইহূদী রাষ্ট্র এবং যেরুযালেমের জন্য একটি আন্তর্জাতিক অঞ্চল গঠনের কথা বলা হয়। অতঃপর ১৯৪৮ সালে বৃটেন ফিলিস্তীন ত্যাগ করার সাথে সাথে ইহূদী নেতারা স্বাধীন 'ইস্রাঈল' রাষ্ট্রের ঘোষণা দেয় এবং তার কয়েক মিনিট পরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইস্রাঈলকে স্বীকৃতি দেয়। অতঃপর ১৯৪৯ সালে বৃহৎ শক্তিবর্গ তাকে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র করে নেয়। এরপর ইঙ্গ-মার্কিন ও ইস্রাঈলী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মুখে দশ লক্ষ আরব মুসলিম নিজেদের দেশ ছেড়ে পার্শ্ববর্তী আরব দেশ সমূহে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। আর ফিলিস্তীনে থেকে যায় মাত্র ২,৪৭,০০০ নির্যাতিত আরব মুসলিম। ফিলিস্তীনের ৮০% ভূভাগ দখল করে নেয় আগ্রাসী ইস্রাঈলী দখলদাররা। সেদিন থেকে নিয়ে বিগত ৫২ বছর যাবত চলছে এই ফিলিস্তীন ট্রাজেডী। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রের উদ্বাস্তু শিবিরে যাদের জন্ম ও মৃত্যু। ইস্রাঈলের পশ্চিম তীরের ফিলিস্তীনী ভূখণ্ডে চলছে তাদের নিয়মিত রক্তের হোলিখেলা। যা আজও অব্যাহত রয়েছে।...

ঘটনার সূত্রপাত : ইস্রাঈলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বর্তমান কট্টরপন্থী বিরোধী দলীয় লিকুদ পার্টির নেতা এরিয়েল শ্যারন কর্তৃক উস্কানীমূলক ভাবে গত ২৮শে সেপ্টেম্বর যেরুযালেম সফরের পর থেকে বর্বর ইস্রাঈলী বাহিনী নতুন করে তাদের সামরিক হামলা জোরদার করে এবং মাত্র কয়েক সপ্তাহের হামলায় ইতিমধ্যে দু'শতাধিক ফিলিস্তীনী নিহত ও সাত হাযারের অধিক আহত ও পঙ্গু হয়ে গেছে চিরদিনের মত। পশ্চিম তীরে ফিলিস্তীনী পুলিশের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ধ্বংস হয়েছে। রামাল্লায় প্রেসিডেন্ট আরাফাতের সরকারী বাসভবন হয়েছে নিষ্ঠুর রকেট হামলার শিকার। যে ইঙ্গ-মার্কিন খৃষ্টচক্র ও জাতিসংঘ 'ইস্রাঈল' নামক অবৈধ রাষ্ট্রের জন্ম দিল, তারাই আবার ১৬ই

---

১২৭. মুসলিম হা/২৯৩৭; মিশকাত হা/৫৪৭৫।

অক্টোবর মিসরে গিয়ে শার্ম আল-শেখে বসল শান্তি আলোচনার নামে অন্যায় কালক্ষেপণের কূটকৌশল বাস্তবায়নের জন্য। ওদিকে ২৩শে অক্টোবরে কায়রোতে বসল আরব লীগ। কিন্তু সর্বত্র নেতৃপর্যায়ে রয়েছে ইঙ্গ-মার্কিন চক্রের গোপন কালো হাত ও আসুরিক চাপ। ফলে জোড়াতালি দেওয়া একটা চুক্তির নামে পর্বতের মুষিক প্রসব হয়েছে মাত্র। ফিলিস্তীনীরা মার খেয়েই চলেছে। প্রতিদিন সেখানে লাশ পড়ছে। বাড়ছে আহত ও নিহতের সংখ্যা। ধ্বংস হচ্ছে স্থাপনা। সমস্ত আরব রাষ্ট্রে হয়েছে এর ব্যাপক প্রতিক্রিয়া। ইস্রাঈলের বিরুদ্ধে উত্তাল হয়ে উঠেছে মধ্যপ্রাচ্যের জনমত ও সেই সাথে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে তাদের সহানুভূতিশীল বিশ্ব জনমত।

প্রতিরোধ সংগ্রাম : ১৯৬০ সালে আরব রাষ্ট্রসমূহের পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত হয় ‘প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন’ (P.L.O)। ১৯৬৯-এর ফেব্রুয়ারীতে এর নেতৃত্বে আসেন কায়রোর ফিলিস্তীন ছাত্র ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বিপ্লবী ছাত্রনেতা ইয়াসির আরাফাত। যিনি ইতিপূর্বেই ‘আল-ফাতাহ’ গেরিলা সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। মার্কসবাদী ‘পপুলার ফ্রন্ট’ ও ইসলামপন্থী ‘হামাস’ গ্রুপ থাকা সত্ত্বেও ফিলিস্তীনী জনগণের নেতৃত্ব রয়েছে মূলতঃ প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাতের হাতে।

সমাধান কোন পথে : ইস্রাঈলের বিরুদ্ধে এযাবত যতগুলি যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে, ১৯৭৩ সালের যুদ্ধ ব্যতীত বাকী সব ক’টি প্রচলিত যুদ্ধেই আরবরা ও মিসরীয়রা পরাজিত হয়েছে। ফলে ২০০০ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর ফিলিস্তীনীরা শুরু করেছে ‘ইন্তিফাদাহ’ (الانتفاضة) বা ব্যাপক জনযুদ্ধ। যাকে কার্যকর প্রতিরোধ হিসাবে অনেক আরব সামরিক বিশেষজ্ঞ অভিমত প্রকাশ করেছেন। ইনতিফাদায় ইস্রাঈল দারুণভাবে মার খাচ্ছে। ইতিমধ্যে তারা দক্ষিণ লেবানন থেকে ১৬ বছর পরে হিযবুল্লাহ গেরিলাদের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে পালিয়েছে। ট্যাংক-রকেট-কামান ইত্যাদি প্রচলিত অস্ত্র প্রয়োগ করে বেসামরিক জনগণকে হত্যা করলে ইস্রাঈল একদিকে যেমন বিশ্ব জনমত হারাবে, অন্যদিকে তেমনি কাপুরুষোচিত অন্যায় কর্মের জন্য নিজ জনগণের কাছেও নিন্দিত হবে। ইস্রাঈলকে জব্দ করতে তাই ‘ইন্তিফাদা’ বা ব্যাপক জনযুদ্ধের পথ বেছে নিয়েছে ফিলিস্তীনী জনগণ। তারা সব হারিয়েছে। এখন আর তাদের হারাবার

কিছু নেই। তাই কেবল নিয়মিত সামরিক বাহিনী নয়, ফিলিস্তীনের প্রত্যেক নাগরিক এখন সৈনিকে পরিণত হয়েছে। এমনকি মায়েরাও অধিক সন্তান জন্মদানে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। যাতে তাদের সন্তানদের রক্তের বিনিময়ে ফিলিস্তীনের হারানো স্বাধীনতা ফিরে আসে। আর এটা বাস্তব যে, গণ বিস্ফোরণ বোমা বিস্ফোরণের চাইতে অধিকতর শক্তিশালী। এই সশস্ত্র জনযুদ্ধ বা জিহাদের মাধ্যমেই আন্তর্জাতিক আগ্রাসী শক্তির হাতে বন্দী ফিলিস্তীনের মুক্তি আসবে ইনশাআল্লাহ।

সেই সঙ্গে আমরা মুসলিম উম্মাহকে কুরআনী নির্দেশের দিকে ফিরে আসতে আহ্বান জানাই। তারা যেন ইহূদী-খ্রিষ্টান ও কুফরী শক্তিকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ না করেন এবং তারা যেন অতি দ্রুত 'ওআইসি'-কে সক্রিয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক জোটে রূপান্তরিত করেন। তাহ'লে শুধু ইস্রাঈল নয়, কাশ্মীর, আফগানিস্তান, কসোভো, চেচনিয়া সহ বিশ্বের সকল স্থান হ'তে মুসলিম নির্যাতন নিমেষে বন্ধ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। মুসলিম রাষ্ট্র সমূহের নেতৃবৃন্দ বিষয়টি যত দ্রুত উপলব্ধি করবেন, ততই মঙ্গল। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন![১২৮]

৭২. আফগানিস্তানে মার্কিন হামলা

গত ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১ মঙ্গলবার সকাল ৯-টায় নিউইয়র্কের বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্র টুইন টাওয়ারে ও ওয়াশিংটনের সামরিক প্রতিরক্ষা কেন্দ্র পেন্টাগনে যুগপৎ হামলার প্রতিশোধের নামে বিনা প্রমাণে উসামা বিন লাদেনকে দায়ী করে গত ৭ই অক্টোবর রবিবার রাতের অন্ধকারে যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র আফগানিস্তানের উপরে বর্বরোচিত হামলা শুরু করেছে। আজও চলছে সে মর্মান্তিক অভিযান। মরছে শত শত মানুষ। ধ্বংস হচ্ছে অগণিত স্থাপনা। পাথর-বালির দেশ আফগানিস্তানে পোড়ামাটি নীতি অনুসরণ করে চলেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। মুখে বলছে ৫০ বছরেও যুদ্ধ শেষ হবে না। এতেই বুঝা যায়, তাদের মতলবটা কি? তাদের উদ্দেশ্য উসামা নয়, বরং উদ্দেশ্য অন্য কিছু।

বর্তমান বিশ্বের একক খ্রিষ্টান পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী তার শক্তিবলয় বিস্তার ও সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চায়। গত শতাব্দীর আশির দশকে তারা

---

১২৮. ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, নভেম্বর ২০০০।

তাদের প্রতিপক্ষ রুশদেরকে আফগানিস্তানের উপরে লেলিয়ে দেয়। অন্যদিকে স্বাধীনচেতা আফগানদেরকে অস্ত্র দিয়ে তাদের মাধ্যমে সোভিয়েত রাশিয়াকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মিটিয়ে দেয়। ৯০-এর দশকে বর্তমান বুশ-এর পিতা সিনিয়র বুশ ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দামকে লেলিয়ে দেন কুয়েতের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে নিজে ত্রাণকর্তা সেজে কুয়েত ও সঊদী আরবের মাটিতে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের সুযোগ করে নেন। তারপর জাতিসংঘের মাধ্যমে অবরোধ চাপিয়ে দিয়ে গত একযুগ ধরে শক্তিশালী ইরাককে পঙ্গু করে ফেলে ও এযাবত সেখানকার প্রায় ১৫ লাখ বনু আদমকে তারা অনাহারে-অপুষ্টিতে মৃত্যুবরণে বাধ্য করেছে। বর্তমানে একমাত্র পরমাণু শক্তির অধিকারী মুসলিম দেশ পাকিস্তানকে করায়ত্ত করা ও অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী চীনের উপরে ছড়ি ঘুরানো এবং প্রতিবেশী উযবেকিস্তান, তাযিকিস্তান সহ মধ্য এশিয়ার তৈলসমৃদ্ধ গরীব দেশগুলিকে কব্জা করার উদ্দেশ্যে আফগানিস্তানকে তাদের খুবই প্রয়োজন। সে লক্ষ্য পূরণের জন্যই তারা মরিয়া হয়ে বোমা ফেলছে আফগানিস্তানে।

আমেরিকা নিজ দেশের নাগরিকদের উপরে যেমন সে সন্ত্রাস করে, পরদেশের উপরেও তেমনি। ৬০-এর দশকে নিজ দেশের কৃষ্ণাঙ্গদের মানবাধিকার দমন করার জন্য সিআইএ-এর মাধ্যমে সেদেশের মানবাধিকার নেতা মার্টিন লুথার কিং-কে তারা হত্যা করে। ৯০-এর দশকে অন্যতম কৃষ্ণাঙ্গ নেতা রুডনী কিং-এর উপরে অবর্ণনীয় পুলিশী নির্যাতনের কাহিনী সবার জানা আছে। মার্কিন শ্বেতাঙ্গ সন্ত্রাসবাদী দল কু-ক্লাক্স-ক্ল্যান সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ নীরব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল আদিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানরা আজ নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত হয়ে 'নিজ দেশে পরবাসী' অবস্থায় ধুঁকে ধুঁকে মরছে। পরদেশে মার্কিনীদের ও তাদের দোসরদের সন্ত্রাসের নযীরের শেষ নেই। ১৯১৪ সালে ভারতের জালিওয়ানওয়ালা বাগে সমবেত জনসভায় বৃটিশ জেনারেল ডায়ার বিনা উসকানিতে মেশিনগানের গুলি চালিয়ে ১৫ হাযার মানুষকে হত্যা করে। ১৯৪৫ সালে ৬ ও ৯ আগষ্ট যুক্তরাষ্ট্র জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমা হামলা চালিয়ে মাত্র ২ মিনিটে প্রায় দেড় লক্ষ জাপানীকে হত্যা করে, যার রেশ আজও চলছে। কোরিয়াতে হাযার হাযার মানুষকে হত্যার পর ভিয়েতনামে ৩০ হাযারের ঊর্ধ্বে বনু আদমকে তারা অস্ত্রের খোরাক বানিয়েছে। তাদেরই প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় গত ৫২ বছর ধরে ইহূদী

ইস্রাঈলের হাতে ফিলিস্তীনী মুসলমানদের রক্ত ঝরছে। তৎকালীন গেরিলা নেতা ও বর্তমানে ইস্রাঈলী প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারণ ১৯৮২ সালে লেবাননে হামলা চালিয়ে সাড়ে সতেরো হাযার উদ্বাস্তু ফিলিস্তীনীকে হত্যা করেন। কেবল শাবরা-শাতিলা উদ্বাস্তু শিবিরেই একদিনে হত্যা করেন তিন হাযার ফিলিস্তীনী আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাকে। এই ব্যক্তি এখন পশ্চিমাদের কাছে Honourable man এবং ইয়াসির আরাফাত হচ্ছেন 'সন্ত্রাসী'। ১৯৪৮ সালে পালেস্টাইনের দার ইয়াসীন গ্রামের সকল ফিলিস্তীনীকে হত্যা করে তাদের লাশগুলি রাস্তায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রেখে বুক ফুলিয়ে দম্ভ করেছিল যে মোনাহিম বেগিন, পরবর্তীতে সেই সন্ত্রাসী ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হন এবং ভূষিত হন নোবেল শান্তি পুরস্কারে। শ্যারণ, বেগিন, শামির, মোশে দায়ান প্রমুখদের রাইফেলের গুলির বিপরীতে অসহায় কোন ফিলিস্তীনী যদি পাথর ছুঁড়ে মারে, তাহ'লে সে হয় সন্ত্রাসী ও মৌলবাদী। আজও তেমনি বিনা প্রমাণে স্রেফ সন্দেহবশে অসহায় আফগানদের উপরে টন কে টন বোমা ফেলা হচ্ছে, তবুও আমেরিকা সন্ত্রাসী নয়, সন্ত্রাসী হ'ল মুক্তিকামী তালিবান যোদ্ধারা। মুসলিম নেতারা সহ তাবৎ গণতান্ত্রিক বিশ্ব এই অন্যায় ও অমানবিক দৃশ্য চুপচাপ দেখে চলেছে। কারু মুখে কথা নেই। ধিক তোমাদের রাজনীতির, ধিক তোমাদের গণতন্ত্র ও মানবাধিকার বুলির।

অনুরূপভাবে গণতন্ত্রের লেবাসধারী ইঙ্গ-মার্কিন-রাশিয়া চক্রের পরোক্ষ মদদে কাশ্মীরে ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসকরা সেখানকার ৯০% মুসলিম জনসাধারণের রক্ত ঝরাছে বিগত ৫২ বছর ধরে। লিবিয়া ও ইরাকের উপরে একই চক্রের ইঙ্গিতে জাতিসংঘের অবরোধ চলছে বছরের পর বছর ধরে। আর ধুঁকে ধুঁকে মরছে সেসব দেশে হাযার হাযার বনু আদম। সুদান, সোমালিয়া, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, কসোভো ও চেচনিয়াতেও চলেছে তাদের মাধ্যমে ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম বর্বরতা। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজর হুমকি দিয়ে বলেছিলেন, ইউরোপে কোন মুসলিম রাষ্ট্রের উত্থান ঘটতে দেওয়া হবে না'। তারই বাস্তবতা ঘটানো হয়েছে জাতিসংঘ সনদের দোহাই দিয়ে বসনিয়াকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দেওয়ার মাধ্যমে এবং কসোভোকে ন্যাটো বাহিনীর অধীনে প্রকারান্তরে সার্বীয় দস্যুদের সাথে যুক্ত রাখার মাধ্যমে। মার্কিনীরা সেখানকার খ্রিষ্টান বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদদ দিয়ে চলেছে। এরাই লিবিয়ার

রাজধানী ত্রিপোলীতে প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফীকে হত্যা করার জন্য সন্ত্রাসী বিমান হামলা চালিয়ে তার ৯ বছরের বোবা মেয়েকে হত্যা করেছে। এরাই মাদক পাচারের খোঁড়া অজুহাতে পানামার জনপ্রিয় রাষ্ট্রনায়ক নারিয়েগাকে সামরিক অভিযান চালিয়ে তস্করের মত অপহরণ করে নিয়ে গেছে। এরাই বারবার কিউবার রাষ্ট্রপ্রধান ফিডেল ক্যাস্ট্রোকে হত্যার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়েছে। এরাই হাইতির সাবেক প্রেসিডেন্টকে সামরিক অভিযান চালিয়ে পদচ্যুত করেছে। এরাই ১৯৯৮ সালের ২৪শে আগস্ট উসামা বিন লাদেনকে হত্যার জন্য আফগানিস্তানে বিমান হামলা চালিয়েছে। এধরনের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ভুরি ভুরি নযীর মার্কিনীরা সৃষ্টি করেছে।

আফগানিস্তানে আজকের Operation crusade Kabul হচ্ছে তথাকথিত গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের ধ্বজাধারী ইহূদী-খ্রিষ্টান চক্রের সর্বশেষ সন্ত্রাসী সংযোজন মাত্র। বর্তমানে এই চক্রের সাথে হাত মিলিয়েছে ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত। তাদের উদ্দেশ্য, এই সুযোগে কাশ্মীর ও পাকিস্তানকে ঘায়েল করা। কিছু না হোক মার্কিন গোয়েন্দাদের মাধ্যমে পাকিস্তানের ২৪টি পারমাণবিক বোমা চুরি করা অথবা এর প্রযুক্তি কৌশল হস্তগত করা। ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট গোলাম ইসহাক খান মধ্য এশিয়ার মুসলিম প্রধান ৬টি দেশ নিয়ে একটি 'ইসলামী ব্লক' গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তখন থেকেই আমেরিকার শ্যেনদৃষ্টিতে পড়ে পাকিস্তান। কেননা এই অঞ্চলে কোন ইসলামী শক্তির উত্থান ঘটুক, আমেরিকা বা ভারত তা কখনোই চায় না।

তাই সবশেষে বলব, আফগানিস্তানের উপরে হামলা কেবল সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, এ হামলা সকল মুসলিম বিশ্বে পরিচালিত হবে। অতএব আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে। আমরা ইহূদী-খ্রিষ্টান-ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্রের সন্ত্রাসের সহযোগী হব, না মযলূম মানবতার সাথী হব, এ বিষয়ে আমাদের জনগণকে ও সর্বোপরি বর্তমান জোট সরকারকে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমরা মযলূম আফগান ভাইদের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে গায়েবী মদদ প্রার্থনা করছি। আল্লাহ বিশ্বের সর্বত্র ইসলাম ও মুসলমানদেরকে ও মযলূম মানবতাকে হেফাযত করুন -আমীন!

৭ই নভেম্বর ও রামাযান : ১৯৭৫-এর ৭ই নভেম্বর ছিল দেশের মুক্তি ও স্বাধীনতার মাইলফলক। আমরা এ দিনটিকে স্বাগত জানাই। আসছে রামাযান আমাদের আধ্যাত্মিক মুক্তির প্রশিক্ষণের মাস। আমাদের দেশ চিরস্বাধীন থাক ও রামাযানের সাধনার মাধ্যমে আমাদের আত্মা পবিত্র হৌক এই কামনা করি- আমীন![১২৯]

৭৩. এশিয়ার দুর্গের পতন। অতঃপর..

Citadel of Asia বা 'এশিয়ার দুর্গ' আফগানিস্তানের পতন হয়েছে আগ্রাসী আমেরিকার হাতে। গত শতাব্দীর শেষাংশে একবার তার পতন হয়েছিল রাশিয়ার হাতে। আর বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে পতন হ'ল আমেরিকার হাতে। দু'টি পতনেরই মূলে ছিল অর্থ ও পদলোভী দেশপ্রেমহীন আফগান নেতৃবৃন্দ। ৮০-এর দশকে রাশিয়ার পুতুল সরকার নূর মুহাম্মাদ তারাকী ও নাজীবুল্লাহদের পতনের পর আজ আবার জাতিসংঘের ছদ্মাবরণে মার্কিনীদের চাপিয়ে দেওয়া ২৯ সদস্যের অন্তর্বর্তীকালীন পুতুল সরকারের প্রধান হিসাবে পশতু নেতা আব্দুল হামীদ কারজাই দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। ইতিমধ্যে ক্ষমতা নিয়ে তাদের মধ্যে শুরু হয়েছে তুমুল কোন্দল। তাযিক, উযবেক, শী'আ, মাসঊদ গ্রুপ, দোস্তাম গ্রুপ, পশতু নেতা পীর সৈয়দ আহমাদ গীলানী ও অন্য এক উপদল নেতা আব্দুর রাসূল সাইয়াফের মধ্যে অন্তর্দলীয় দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করেছে।

'তালিবান' উৎখাতের পরে উত্তরাঞ্চলীয় জোট সেদেশে এখন আর কোন বিদেশী সৈন্য চাচ্ছে না। সম্প্রতি কান্দাহারে হামলাকারী আমেরিকান দু'টি বিমানকে লক্ষ্য করে কারা গুলী ছুঁড়ল, এখনো সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। আমেরিকা হয়ত এবার উত্তরাঞ্চলীয় জোট নেতাদের পিছনে তাদের মধ্য থেকেই একটা বি-টীম সৃষ্টি করবে এদের জব্দ করার জন্য। এটা নিশ্চিত যে, কারজাই সরকার আফগানিস্তানে স্থিতিশীলতা আনতে পারবে না। ১৯৯০ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত এ জোটই ক্ষমতায় ছিল। তখন আপোষে মারামারির কারণে পুরা আফগানিস্তানের উপরে তারা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়নি। শী'আপন্থী 'হিযবে ওয়াহদাত' ও আহমাদ শাহ মাসঊদ গ্রুপের পিছনে

১২৯. ৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, নভেম্বর ২০০১।

ইরান ও রাশিয়ার মদদ না থাকলে দেশের বাকী অংশটুকুর উপরে তারা অতি সহজে নিয়ন্ত্রণ লাভে সক্ষম হ'ত। যতদূর জানা যায় তালিবানরা পরাজিত হয়ে নয়, বরং ইচ্ছাকৃতভাবে কাবুল ও কয়েকটি শহর থেকে সরে না গেলে এত দ্রুত আমেরিকার বিজয় আসতো না। শীর্ষস্থানীয় একটি তালিবান সূত্রের বর্ণনা মতে তারা যুদ্ধ কৌশল হিসাবে তাদের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গিয়েছে। ৬ মাস তারা বর্তমান জোট সরকারকে সময় দেবে। তারপর তাদের বিশৃংখল অবস্থার সুযোগে পুনরায় ব্যাপক গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে কাবুল সহ সারা আফগানিস্তানে তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে।

হার-জিত যাই বলুন, আমেরিকাসহ ইসলাম বিরোধী বিশ্বচক্র তাদের পরিকল্পনা মত এগিয়ে চলেছে। সন্ত্রাস দমনের নামে আফগানিস্তানের উপরে দখল কায়েম করে তারা আণবিক বোমার অধিকারী পাকিস্তানকে তার নিকটতম বন্ধু প্রতিবেশী ইসলামী আফগানিস্তান থেকে বঞ্চিত করেছে। এখনকার আফগানিস্তান আর পাকিস্তানের সেফগার্ড বন্ধুরাষ্ট্র নয়। ফলে পাকিস্তানের চারদিক এখন শত্রু রাষ্ট্র দিয়ে ঘেরা। এরপরেই সন্ত্রাস দমনের নামে মার্কিনীরা হাত রাখবে কাশ্মীর উপত্যকায় ভারতের ঘাড়ে বন্দুক রেখে। ১৩ই ডিসেম্বর ভারতীয় পার্লামেন্টে হামলা চালিয়ে ১৩ জনকে হত্যা করে তারা তার প্রাথমিক মহড়া শুরু করেছে এবং সন্দেহভাজন উসামা বিন লাদেনের ন্যায় এখানেও যথারীতি দু'টি পাকিস্তান ভিত্তিক কাশ্মীরী মুজাহিদ গ্রুপকে সন্দেহ করা হয়েছে। এমনকি এখানেও উসামার আল-কায়েদা গোষ্ঠীর হাত থাকতে পারে বলা হচ্ছে। অতএব এবার শুরু হবে প্রতিশোধের নামে প্রথমে কাশ্মীর ও পরে পাকিস্তান ধ্বংসের পালা। এমনকি সন্ত্রাসীরা আশ্রয় নিয়েছে এই সন্দেহ করে সোমালিয়া ও সূদানের উপরে এবং ইরাকের উপরেও মার্কিন হামলা আসন্ন বলে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।

অনেকেরই ধারণা পারভেয মোশাররফ ইচ্ছাকৃতভাবে আমেরিকাকে সমর্থন দিয়েছেন। কিন্তু ব্যাপারটা কি এতই সাদামাটা? বর্তমান পাকিস্তানের দ্বিতীয় ক্ষমতাধর জেনারেলের মতে তা নয়। ১১ই সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ারে হামলার দু'দিন পর প্রথমে পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল ও তার দু'ঘণ্টা পর প্রেসিডেন্ট বুশ পাকিস্তানী প্রেসিডেন্টকে ফোন করে বলেন, আমরা আফগানিস্তানে হামলা করতে যাচ্ছি। পাকিস্তানের সাহায্য চাই। নইলে তাদের আণবিক স্থাপনা এবং

কাশ্মীরের উপর ঝুঁকি আসবে'। এমন ধমক খাওয়ার পর ৩৭০০ কোটি ডলার ঋণের বোঝা বহনকারী পাকিস্তানী নেতা সঙ্গতকারণেই চুপসে যান। যদি বলি কাছাকাছি একই অবস্থা বাংলাদেশ সহ অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলির, তাহ'লে এরূপ ধারণা সম্ভবতঃ মিথ্যা হবে না। কারণ সর্বত্র অর্থনৈতিক সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমেই যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী তার সামরিক ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের জাল বিস্তার করে থাকে। পাকিস্তানী সমর্থন ব্যতিরেকে তালেবানরা এক ঘণ্টাও টিকে থাকতে পারবে না বলে একটা কথা চালু ছিল। যদি তাই-ই হয়, তাহ'লে পাকিস্তান, সঊদী আরব ও আরব-আমিরাত তাদের সমর্থন প্রত্যাহার ও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার পরেও তালেবানরা কেন আত্মসমর্পণ করেনি? যদি কেউ বলেন যে, এটা তাদের ঈমানী জাযবা ও নিখাদ দেশপ্রেমের কারণেই সম্ভব হয়েছে, তাহ'লে এটাও পরিষ্কার যে, ঐ দু'টি বস্তু কখনোই নিঃশেষ হবার নয়। এই আগুন আফগানিস্তানের বর্তমান দখলদার শাসনকে একদিন জ্বালিয়ে দেবে। সাথে সাথে পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশগুলিতেও তা জ্বলে উঠবে। দুনিয়াসর্বস্ব রাজনীতিকদের হিসাব-নিকাশ হয়তবা সেদিন সব মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে।

New world order বা 'নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা' নামে বুশ-এর ঘোষিত নীতি মূলতঃ বিশ্বব্যাপী যুক্তরাষ্ট্রের একক কর্তৃত্ব সম্প্রসারণের অপকৌশল মাত্র। বর্তমানে আমেরিকা ও রাশিয়ার হাতে প্রায় ১২ হাযার মেগাটন পারমাণবিক বিস্ফোরণ ক্ষমতা রয়েছে। অর্থাৎ বিশ্বের প্রতিটি মানুষের জন্য মাথাপিছু বিস্ফোরক বরাদ্দ হ'ল ৩ টন টিএনটি। গত শতাব্দীতে পৃথিবীর যেখানে যত যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ ও সন্ত্রাস ঘটেছে, প্রায় সবগুলিতেই মার্কিন অস্ত্র, অর্থ ও কূটনীতি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে এবং সর্বত্র তার মূল লক্ষ্য থেকেছে সম্ভাবনাময় মুসলিম শক্তি বা শক্তিবলয়কে ভিতর ও বাহির থেকে দুর্বল অথবা ধ্বংস করে দেওয়া।

তৈল অস্ত্রের উদ্গাতা বাদশাহ ফায়ছালকে তারাই হত্যা করিয়েছে। ইসলামী পারমাণবিক বোমার উদ্গাতা যুলফিকার আলী ভুট্টোকে তারাই মেরেছে। পরবর্তীতে ইসলামী আফগানিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা যিয়াউল হক-কে তারাই সুকৌশলে হত্যা করেছে। সবকিছুই 'ওপেন সিক্রেট'। আজকে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস দমনের নামে ভুখা-নাঙ্গা নিরীহ নিরপরাধ আফগানদের উপরে যুদ্ধের হিংস্রতা চাপিয়ে দিয়েছে তারাই। ফিলিস্তীন ও কাশ্মীরেও তাদের

হিংস্রতা স্পষ্ট। ফলে মুসলিম বিশ্ব এখন সন্ত্রাস থেকে মহা সন্ত্রাসের ভয়ে ভীত ও বিপন্ন। আমাদের নেতৃবৃন্দের বিলাস নিদ্রা ভঙ্গ হবে কি? আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন- আমীন![১৩০]

৭৪. বিধ্বস্ত ফিলিস্তীন ও আমরা

ইঙ্গ-মার্কিন চক্রের সহায়তায় ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে তেলআবিবে বিকেল ৪-টায় বিশ্ব ইতিহাসে প্রথম 'ইস্রাঈল' নামক একটি রাষ্ট্রের ঘোষণা দেওয়া হয় এবং তার কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমেরিকা ইসরাঈলকে রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৪৯ সালে বৃহৎ শক্তিবর্গ তাকে জাতিসংঘের সদস্য করে নেয়। এরপর থেকে শুরু হয় ইসরাঈলের বৈধ (?) অগ্রযাত্রা ও মুসলমানদের নিশ্চিহ্নকরণ প্রক্রিয়া! যা বর্তমানে একটি ক্রান্তিকালে পৌঁছে গেছে। ১৯১৭ সালের ২রা নভেম্বর 'বেলফোর চুক্তি' থেকেই মূলতঃ মুসলিম ফিলিস্তীনকে ইহূদী করণের সূচনা হয়। প্রায় শতবর্ষের মাথায় এসে তা এখন পূর্ণতার শিখরে পৌঁছে যেতে বসেছে। ইহূদী-খ্রিষ্টান চক্র বিগত একশত বছর যাবত আলোচনার নামে কেবল কালক্ষেপণ করেছে। কিন্তু তাদের লক্ষ্যে তারা অবিচল থেকেছে। নরমে হৌক গরমে হৌক বা প্রতারণার মাধ্যমে হৌক তারা তাদের লক্ষ্য হাছিলে অনড় রয়েছে। তবুও পরের মাটিতে জবরদখল বসিয়ে তারা কখনোই শান্তিতে ছিল না, আজও নেই। তাদের ভাগ্যে রয়েছে আল্লাহ্র চিরস্থায়ী গযব। সূরায়ে ফাতিহায় ইহূদীদেরকে 'মাগযূব' বা অভিশপ্ত ও খ্রিষ্টানদেরকে 'যা-ল্লীন' বা পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ যেন মুসলমানদেরকে তাদের পথে পরিচালিত না করেন, সেজন্য ছালাতে প্রতি রাক'আতে সূরায়ে ফাতিহা পাঠের মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করা হয়। ইহূদী-নাছারাগণ ইসলামের স্থায়ী দুশমন। তাদেরকে ও কাফিরদেরকে বৈষয়িক স্বার্থ ব্যতীত আন্তরিক বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে আল্লাহ পাক নিষেধ করেছেন *(মায়েদাহ ৫/৫১, আলে-ইমরান ৩/২৮)*। মুসলমানেরা ইসলাম ত্যাগ করে তাদের দলভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা কখনোই মুসলমানদের উপরে সন্তুষ্ট হবে না *(বাক্বারাহ ২/১২০)*।

---

১৩০. ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০১।

মিথ্যা ও প্রতারণা তাদের মজ্জাগত। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সাথে তাদের প্রতারণা ছিল ইতিহাস প্রসিদ্ধ। যার জন্য আল্লাহ্‌র হুকুমে তিনি তাদেরকে মদীনা থেকে উৎখাত করেন। কুরআনে এটাকে 'আউয়ালুল হাশর' বা প্রথম উৎখাত বলা হয়েছে। অতঃপর তাদের শেষ হাশর হবে ক্বিয়ামতের দিন। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইহূদীরা বিশ্বের কোথাও শান্তির সাথে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারবে না। আজও তারা খ্রিষ্টান নেতাদের সহায়তায় মুসলিম বিশ্বের সাথে প্রতারণা করেই চলেছে। কখনো মিত্রবাহিনী সেজে, কখনো জাতিপুঞ্জ, কখনো জাতিসংঘের সাইনবোর্ড নিয়ে, কখনো গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের নামে তারা বিভিন্ন মুখোশে বিশ্বব্যাপী শোষণ-নিপীড়ন ও সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক কালে তারা উসামা বিন লাদেনকে খোঁজার নামে আস্ত একটি স্বাধীন দেশ আফগানিস্তানকে নাস্তানাবুদ করল। হাযার হাযার আফগান মুসলমান নর-নারী ও শিশু নিহত হ'ল। বিধ্বস্ত হ'ল সেদেশের গৌরবমণ্ডিত স্থাপনা সমূহ। এমনকি সেখানে কয়েকদিন পূর্বে যে ভূমিকম্প হয়ে গেল, সেটাও অবিশ্রান্ত মার্কিন বোমা হামলার ফলশ্রুতি বলে অনেক বিশেষজ্ঞ মত প্রকাশ করেছেন । ওসামা বা মোল্লা ওমরের কোন খবর নেই। অথচ আফগানিস্তানের নিরীহ জনগণকে তারা শেষ করল। বিতাড়িত করল একটি প্রতিষ্ঠিত সরকারকে ও উদ্বাস্তু বানালো সেদেশের স্থায়ী অধিবাসী জনগণকে। যারা এখন পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছে।

বর্তমানে ফিলিস্তীনে তারা যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে আধুনিক বিশ্বে তার তুলনা কেবল তারাই। জেনিন শহরটিকে নিশ্চিহ্ন করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি, নিহত লাশগুলিকে বুলডোজারের নীচে পিষে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতেও তাদের বিবেকে ধাক্কা লাগেনি। কিন্তু গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের এই ধ্বজাধারীরা সেগুলি বেমালুম চেপে যাচ্ছে। বিধ্বস্ত জেনিন উদ্বাস্তু শিবির ঘুরে এসে জাতিসংঘ প্রতিনিধি রয়েড লারসেন ১৯শে এপ্রিল তারিখে বললেন, 'সেখানে ইসরাঈলী সৈন্যদের বর্বরতা অচিন্তনীয়'। অথচ মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী কলিন পাওয়েল মধ্যপ্রাচ্য শান্তিমিশনে সপ্তাহব্যাপী বিলাসভ্রমণ শেষে ২৫শে এপ্রিল সেদেশের সিনেটে রিপোর্ট দিলেন, 'জেনিনে ইসরাঈলী গণহত্যার

কোন প্রমাণ মেলেনি'। দুঃখ হয় মুসলিম দেশগুলির নেতাদের জন্য। এতকিছুর পরেও তারা দ্বিচারিণী বুশ প্রশাসনকেই ফিলিস্তীনে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখার জন্য কাতর আহ্বান জানাচ্ছেন। অথচ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি যদি একযোগে মাত্র একমাস আমেরিকা ও তার সহযোগী দেশগুলিতে তৈল রফতানী বন্ধ রাখে, তাহ'লে এক সপ্তাহের মধ্যে তাদের যুদ্ধের চাকা বন্ধ হ'তে বাধ্য। নির্যাতিত ইরাক যদি একমাস তৈল রফতানী বন্ধের ঘোষণা দিতে পারে, তাহ'লে সঊদী আরব, কুয়েত, ইরান ও অন্যান্য দেশগুলি কেন পারে না?

অতএব আমরা মনে করি যে, মুসলিম বিশ্বকে নিজেদের শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াতে হবে এবং তাদেরকে আল্লাহ পাক তৈল ও গ্যাস সহ যেসব অমূল্য সম্পদ দান করেছেন, সেগুলির পরিকল্পিত ব্যবহারে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা রাখতে হবে। জনৈক মার্কিন বিশেষজ্ঞের মতে 'আমেরিকার সম্পদ ফুরিয়ে আসছে। বর্তমান শতাব্দীতেই তাদের চূড়ান্ত ধস প্রত্যক্ষ করা যাবে'। বরং এটাই বাস্তব যে, ফিলিস্তীন সহ বিভিন্ন দেশে আমেরিকার দ্বৈতনীতি তার নৈতিক ভিত্তি ধ্বংস করে দিয়েছে। এখন তার অর্থনৈতিক ভিত্তি ধ্বংস হওয়ার অপেক্ষা মাত্র। আর সেটা খুব সহজেই সম্ভব মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির তৈলাস্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে এবং অন্যান্য মুসলিম দেশের স্ব স্ব সম্পদ সমূহকে মার্কিন ও তার দোসরদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করার মাধ্যমে। সর্বোপরি প্রয়োজন মুসলিম সরকারগুলিকে মার্কিন তোষণনীতি পরিহার করে পবিত্র কুরআনে ঘোষিত স্থায়ী ও স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতির অনুসরণ করা। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য সাধ্যমত শক্তি সঞ্চয় কর পালিত ঘোড়া ইত্যাদির মাধ্যমে। যার দ্বারা তোমরা ভীত করবে আল্লাহ্র শত্রুদের ও তোমাদের শত্রুদের এবং তারা ব্যতীত অন্যদের, যাদেরকে তোমরা জানোনা। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে জানেন। জেনে রেখ, তোমরা আল্লাহ্র রাস্তায় যা কিছু ব্যয় কর, সবটাই তোমরা পূর্ণভাবে ফেরৎ পাবে এবং তোমাদের উপরে এতটুকুও যুলুম করা হবে না' *(আনফাল ৮/৬০)*। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন।[১৩১]

---

১৩১. ৫ম বর্ষ, ৭ম-৮ম সংখ্যা, এপ্রিল-মে ২০০২।

৭৫. রক্তঝরা কাশ্মীর, নিষ্পিষ্ট গুজরাট ও জেনিন : মুসলিম বিশ্বের নীরবতা ও অমুসলিম বিশ্বের কপটতার মাঝখানে

ভারতের গুজরাটে ও ফিলিস্তীনের জেনিন উদ্বাস্তু শিবিরের মুসলিম জনগোষ্ঠী ইতিহাসের বর্বরতম নিষ্ঠুরতার শিকার হ'ল। আধুনিক মিডিয়া এই দুই জনপদে মনুষ্যরূপী পশুদের অবিশ্বাস্য হিংস্রতার বিস্তারিত রেকর্ড জগদ্বাসীর সম্মুখে উদ্ভাসিত করে দিল। নির্যাতিত ও নিষ্পিষ্ট মানবতার কাতর আর্তনাদ হৃদয়বান মানুষের অন্তর স্পর্শ করল। ধিক্কার দিল নামধারী বিশ্বনেতাদের পশুসুলভ আচরণকে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দ হয়তবা এটাকে তাকদীরের লিখন বলে সান্ত্বনা খুঁজে নিলেন। অপরপক্ষে ইহূদী-খ্রিষ্টান ও তাদের সহযোগী অমুসলিম জোট দেখেও না দেখার ভান করে রইল। 'চোরকে চুরি করার ও মহাজনকে সাবধান থাকার কপট নীতির অনুশীলনে পারদর্শী এইসব বিশ্বনেতারা হয়তবা সান্ত্বনা পেয়েছেন এই ভেবে যে, যারা মরছে ওরা মুসলমান। ওরা মানুষ নয়, ওরা মৌলবাদী, ওরা জঙ্গীবাদী, ওরা সন্ত্রাসী। তাই ওদের সংখ্যা ভূপৃষ্ঠে যত কমে, তত ভাল।

বিভিন্ন কারণে মানুষ অনেক সময় অন্যায়কে ন্যায় বলে চালিয়ে দেয়। দল ও রাষ্ট্র নেতারাও এর ব্যতিক্রম নন। কিন্তু বিশ্বের ১৯২টি রাষ্ট্রের একজন বাদে প্রায় সকল নেতাই যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিন্ন সুরে কথা বলতে পারেন, এটা সম্ভবতঃ ইতিহাসের একটি নতুন অভিজ্ঞতা। গুজরাট ও ফিলিস্তীনের সাম্প্রতিক গণহত্যা এবং ইতিপূর্বে সংঘটিত বসনিয়া, চেচনিয়া, কসোভো, সোমালিয়া প্রভৃতি দেশের গণহত্যাগুলি যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত না হয়ে অন্যদের বিরুদ্ধে হ'ত, তাহ'লে হয়তবা বিশ্ববিবেক চুপ করে থাকত না। কিন্তু একথা কে বুঝাবে যে, মুসলমানেরাও মানুষ। তাদেরও রয়েছে আত্মরক্ষার অধিকার।

কাশ্মীরে ভারত যে দখলদার শক্তি, একথা একটা শিশুও বুঝে। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে বিভক্ত ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম এলাকাগুলি নিয়ে 'পাকিস্তান' গঠিত হয়। সে হিসাবে কাশ্মীর নিঃসন্দেহে পাকিস্তানের অংশীভূত। কিন্তু কাশ্মীরী বংশোদ্ভূত জওয়াহের লাল নেহরু এটা মানতে না পেরে রাতারাতি সৈন্য পাঠিয়ে রাজ্যটির বৃহদাংশ দখল করে নেন। সেই থেকে শুরু হ'ল অধিকৃত কাশ্মীরে সংখ্যাগুরু মুসলমানদের মুক্তি সংগ্রাম। কাশ্মীরী

মুজাহিদদের এই মুক্তিযুদ্ধকে এখন বলা হচ্ছে ‘সন্ত্রাস’ ও ‘জঙ্গী তৎপরতা’। যদি এরা সন্ত্রাসী হয়, তবে এদেরকে সন্ত্রাসী বানিয়েছে হানাদার ভারত। আর স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরকে দখলদার শক্তি চিরকাল ‘সন্ত্রাসী’ বলেই অভিহিত করেছে। যেমন করেছিল দখলদার বৃটিশরা ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্নিপুরুষ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, ক্ষুদিরাম, তীতুমীর, শরীয়তুল্লাহ, সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী, শাহ ইসমাঈল শহীদ, মাওলানা বেলায়েত আলী, এনায়েত আলী প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে।

জাতিসংঘে প্রস্তাব পাস হ’ল কাশ্মীরে গণভোটের। কিন্তু ভারত তা মানলো না। কারণ তারা ভালভাবেই জানে যে, গণভোটের ফলাফল ভারতের বিরুদ্ধে যাবে। গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের সোল এজেন্ট ইঙ্গ-মার্কিন চক্র ভারতকে নগ্ন সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। বৃহৎ শক্তিবলয়ের প্রায় সকল দেশ মুজাহিদদের সমর্থন ও আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাস বন্ধের জন্য পাকিস্তানের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। অথচ একটি দেশও কাশ্মীরীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের ন্যায়সঙ্গত দাবী মেনে নেওয়ার জন্য ভারতকে চাপ দিচ্ছে না। ফলে ভারত এখন বলছে ‘কাশ্মীর’ বলে কোন সমস্যা নেই। পরিণামে হয়ত দেখা যাবে যে, আল্লাহ চাহে তো এই শতাব্দীতেই কাশ্মীর একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে।

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী থেকে সংঘটিত গুজরাটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য ভারত সরকার ও ক্ষমতাসীন বিজেপি কাউকে দোষারোপ করার ছুঁতো খুঁজে পায়নি। গোধরায় রেলওয়ে কম্পার্টমেন্টে অগ্নিসংযোগের জন্য মুসলমানদের দায়ী করা হয়েছে কোনরূপ নিরপেক্ষ তদন্ত ছাড়াই, স্রেফ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ঐ এলাকায় মুসলিম গণহত্যা চালানোর পূর্ব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অজুহাত সৃষ্টির জন্য। দেশী-বিদেশী প্রতিটি মানবাধিকার সংগঠন এবং কয়েকটি বিদেশী দূতাবাসের নিজস্ব চ্যানেলে পরিচালিত তদন্তে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, গুজরাটে মুসলিম গণহত্যা ছিল সরকারীভাবে পূর্ব পরিকল্পিত। ওয়াশিংটনভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন ‘হিউম্যান রাইটস ওয়াচ’ তাদের ৭৫ পৃষ্ঠা ব্যাপী রিপোর্টে বলেছে যে, স্থানীয় পৌর কর্তৃপক্ষের দেওয়া ভোটার তালিকা ও মুসলিম মালিকানাধীন খতিয়ান দেখে দেখে উগ্র হিন্দুরা মুসলিম নিধনযজ্ঞ চালিয়েছে। এমনকি ভারতীয় পত্র-পত্রিকায়ও গুজরাট সরকারের ব্যর্থতার তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে এবং সেখানকার বিভিন্ন

রাজনৈতিক দল গুজরাটের বিজেপি দলীয় প্রাদেশিক সরকারের আশু পদত্যাগ দাবী করেছে। কলিকাতা থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক ‘সানন্দা’ ১৫ই এপ্রিল সংখ্যায় ৮ মাসের গর্ভবতী এক মুসলিম মায়ের পেট চিরে বাচ্চা বের করে টুকরো টুকরো করা, মুসলিম মহিলাকে পুলিশ কর্তৃক দাঙ্গাবাজদের হাতে তুলে দেওয়া ও তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা, এক পরিবারের ১৯ জনের সবাইকে পুকুরের পানি বিদ্যুতায়িত করে সেখানে নিক্ষেপ করে হত্যা করা ইত্যাকার লোমহর্ষক অশ্রুতপূর্ব বর্বরতার ঘটনাবলী তুলে ধরা হয়েছে। প্রখ্যাত ভারতীয় লেখক অরুন্ধতি রায় গুজরাটের মুসলিম গণহত্যাকে হিটলারের নাৎসী বাহিনীর গণহত্যার সাথে তুলনা করেছেন।

গুজরাট পরিস্থিতিতে দেশের ও বিদেশের বিভিন্ন সংস্থার রিপোর্টে জর্জরিত ভারতীয় নেতারা নিজেদের সন্ত্রাসী চেহারা ঢাকার জন্য ও গুজরাট ট্রাজেডী থেকে বিশ্বের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেন এবং মার্কিন উপ সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর গত ১৪ই মে ভারত সফরের প্রাক্কালে তড়িঘড়ি শ্রীনগরে ভারতীয় সেনাঘাঁটিতে বোমা হামলা করে নারী-শিশু সহ কিছু নিরপরাধ বনু আদমকে হত্যা করে প্রমাণ করতে চান যে, এসবই কাশ্মীরী মুসলিম জঙ্গীদের কাজ। তারপর এটাকে ইস্যু করে তারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সারা দেশে যুদ্ধের সাজ সাজ রব তুলে দেয়, এমনকি পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকিও দেয়। মজার কথা এই যে, বোমা হামলাকারী ৩ জনের কেউ বাঁচেনি। যেমন বিগত ২২শে ডিসেম্বরে ভারতীয় পার্লামেন্টে হামলাকারী ৬ জন বন্দুকধারীর কেউ বাঁচেনি। যাতে আসল তথ্য কখনোই ফাঁস হবার সুযোগ না থাকে। দুর্ভাগ্য, বিশ্ব বিবেক এত ভোতা হয়ে গেছে যে, ভারত যা বলছে, তারা তাই বিশ্বাস করছে। একটি দেশও আসল কথা বলছে না। যত দোষ মুসলমানদের। তারাই সন্ত্রাসী, তারাই জঙ্গীবাদী। অথচ বিজেপির মূল দল হিন্দু মৌলবাদী আরএসএস, বজরং ইত্যাদি সংগঠনগুলিকে, যাদের উত্থিত কৃপাণ-ত্রিশূলে মুসলিম গণহত্যার ছবি সকল পত্র-পত্রিকায় আসছে, তাদেরকে কেউ সন্ত্রাসী বলছে না। বর্তমান বিজেপি সরকারের মূল কলকাঠি তাদের হাতেই সমর্পিত।

ভারতের মুসলিম নাগরিকদের উপর নিয়মিত নির্যাতন, কাশ্মীরীদের আত্মনিয়ন্ত্রাধিকারের দাবী প্রত্যাখ্যান ও কাশ্মীরী মুজাহিদদের সাহায্য দানের

অভিযোগ এনে পাকিস্তানকে যুদ্ধে প্ররোচিত করার সাথে ইসরাঈলের ফিলিস্তীনী নির্যাতন, তাদের জন্মগত অধিকার হরণ এবং তাদেরকে সাহায্য দানের অভিযোগ এনে প্রতিবেশী আরব দেশগুলিকে যুদ্ধে উস্কে দেওয়া ইত্যাদির স্পষ্ট মিল রয়েছে। ভারত ও ইসরাঈলের এই কৌশলগত মিল কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং দীর্ঘদিন যাবৎ দু'দেশের সামরিক গোয়েন্দাদের যৌথ পরিকল্পনা ও কর্মকাণ্ডের ফল। এমনকি ইসরাঈল ভারতের কাছে ক্ষেপণাস্ত্র বিধ্বংসী অস্ত্র বিক্রির মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বকে এই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে যে, তারা যদি এ ধরনের কোন অপ্রচলিত অস্ত্র তৈরীর চেষ্টা করে, তবে তাদের সে চেষ্টা যেকোন মূল্যে ব্যর্থ করে দেওয়া হবে। আমেরিকাও এই অস্ত্র বিক্রিতে সম্মত ছিল। হিন্দু-ইহূদী জোটের এই অপতৎপরতার মূল লক্ষ্য স্রেফ কাশ্মীরীদের দমন করা নয়, বরং তাদের লক্ষ্য ভারতের বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ভীত করা এবং প্রতিবেশী মুসলিম দেশগুলিকে চোখ রাঙানো। মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দের আলস্য নিদ্রা ভাঙবে কি? আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন![১৩২]

৭৬. হালাকু-র পুনরাবির্ভাব ও আমাদের করণীয়

১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারীতে মোঙ্গল নেতা হালাকু খানের নেতৃত্বে আগ্রাসী তাতার বাহিনী বাগদাদে হামলা চালিয়ে ৪০ দিনে সর্বাধিক হিসাব মতে ৪০ লক্ষ মানুষকে হত্যার মাধ্যমে বাগদাদ ধ্বংস করেছিল। বিধ্বস্ত হয়েছিল সকল স্থাপনা। ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল তৎকালীন বিশ্বের সেরা জ্ঞান কেন্দ্র বাগদাদের বৃহদায়তন লাইব্রেরীগুলিকে দজলা-ফোরাতের পানিরাশিতে। ছয়শত বছরের সঞ্চিত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিমেষে হারিয়ে গিয়েছিল একদল মানুষরূপী হায়েনার হিংসার অনলকুণ্ডে। উক্ত ঘটনার দীর্ঘ ৭৪৫ বৎসর পরে আগামী ফেব্রুয়ারী বা মার্চেই হয়ত বাগদাদে আমরা আবার সেই ধ্বংসস্তূপ অবলোকন করব। আর এবারেও নাকি নিহত হবে ৪০ লাখের মত বনু আদম। ধ্বংস হবে সবকিছু! হালাকুর স্থলে এবার আবির্ভূত হয়েছে শতাব্দী সেরা সন্ত্রাসী রাষ্ট্রনায়ক জর্জ বুশ (জুনিয়র)। সেদিনের হালাকু বাগদাদ ধ্বংস করে ফিরে গিয়েছিল নিজ দেশে।

---

১৩২. ৫ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, জুলাই ২০০২।

ফলে বাগদাদের ধ্বংসস্তূপের উপর প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল মামলূক মুসলিম সালতানাৎ। কিন্তু এবারের হালাকু ফিরে যাবে না। সে কেবল ভূপৃষ্ঠের মানুষগুলিকে শেষ করেই ক্ষান্ত হবে না। সে চায় ভূগর্ভের তৈল সম্পদ। গত শীতে আফগানিস্তান দখল করে সে উক্ত ভূখণ্ডের উপর দিয়ে তেলের পাইপ লাইন টেনে নেবার রাস্তা অবাধ করে নিয়েছে। এবারের শীতে ইরাক দখল করে সে এশিয়ার তৈলভাণ্ডারে প্রবেশ করতে চায়। পরবর্তীতে ইরান, সঊদী আরব ও গোটা মধ্যপ্রাচ্য তার টার্গেটে রয়েছে। ৮১৬ বছর আগে ১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দে ঐতিহাসিক হিত্তীনের ময়দানে ক্রুসেড বিজেতা সেনাপতি গাযী ছালাহুদ্দীন আইয়ূবীর কাছে সম্মিলিত খ্রিষ্টান বাহিনীর লজ্জাকর পরাজয়ের প্রতিশোধ সে নেবে। অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যের বিশাল তৈল সম্পদ কুক্ষিগত করে মুসলমানদেরকে চিরদিন ইহূদী-খ্রিষ্টানের গোলামে পরিণত করে রাখবে, এটাই ইঙ্গ-মার্কিন সন্ত্রাসী চক্রের একান্ত বাসনা।

আল্লাহ তার রাসূলকে বলেন, ‘ইহূদী-নাছারারা কখনোই তোমার উপর সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না তুমি তাদের ধর্মের অনুসরণ করবে। তুমি বল, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র দেখানো পথই সঠিক পথ। আর যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর, তোমার নিকটে (অহি-র) জ্ঞান এসে যাওয়ার পরেও, তবে আল্লাহ্‌র কবল থেকে তোমাকে বাঁচাবার মতো কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী নেই’ *(বাক্বারাহ ২/১২০)*। ইমাম কুরতুবী এই আয়াত নাযিলের কারণ হিসাবে বলেন যে, ইহূদী-নাছারাদের নেতারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সন্ধি করতে চেয়েছিল এবং তাঁর নিকটে ইসলাম গ্রহণের ওয়াদা দিয়েছিল। তাদের এই প্রতারণা ও কুট-কৌশল সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে আল্লাহপাক অত্র আয়াত নাযিল করেন এবং তাদের বিরুদ্ধে রাসূলকে জিহাদের নির্দেশ দেন’ *(কুরতুবী)*।

আমেরিকার ইতিহাসে সর্বাধিক মেধাহীন বর্তমান প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের মগযে গত বছর পেসমেকার বসানো হয়। তার এক সপ্তাহ পূর্বে হার্টের রোগী তার ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনীর বুকে বসানো হয় ইমপ্লান্টেবল ডিভাইস। এই দুই রোগীর সঙ্গে যোগ হয়েছে অন্য দুই যুদ্ধরোগী পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাম্‌স্‌ফেল্ড। এরা সবাই পরস্পরে তৈল ও অস্ত্র ব্যবসায়ী। এদের নিজস্ব ব্যবসায়ের স্বার্থে এরা সর্বত্র যুদ্ধ বাধায়। ডেমোক্র্যাট হৌক বা রিপাবলিকান হৌক আমেরিকার রাজনীতিকরা প্রায় সকলে একই চরিত্রের।

আমেরিকা, বৃটেন, চীন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার অস্ত্র ভাণ্ডারে যে বিশাল মারণাস্ত্রের মওজুদ রয়েছে, তা দিয়ে এই ক্ষুদ্র পৃথিবীকে কয়েকবার ধ্বংস করা যাবে। তাদের ব্যাপারে কেন কিছুই বলা হচ্ছে না? বর্তমান বুশের পিতা সিনিয়র বুশ ১৯৯০ সালে কুয়েতের বিরুদ্ধে সাদ্দামকে লেলিয়ে দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির নেতাদের মধ্যে সাদ্দামভীতি জাগ্রত করেন ও তার ফলে যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে ২০০ কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রি করে। একই ভয় দেখিয়ে কুয়েতে, সঊদী আরবে ও কাতারে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে। ভূমধ্য সাগরের সর্বত্র তার নৌবাহিনী মোতায়েন হয়। ওদিকে ইসরাঈলকে রক্ষার নামে তাকে তার অস্ত্রভাণ্ডারে পরিণত করে। বর্তমানে ইসরাঈলে আমেরিকার সর্বশেষ ও সর্বাধুনিক ‘এ্যারো’ মারণাস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে, যা বিশ্বের অন্য কোন দেশকে আমেরিকা সরবরাহ করেনি।

গত ৮.১১.০২ইং তারিখে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে ইরাককে নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব পাস হয়েছে। অথচ অন্যকে নিরস্ত্র করার আগে বৃহৎ শক্তিবর্গের নিজেদের অস্ত্র ভাণ্ডার ধ্বংস করা ছিল অধিক যরূরী। একটি সদস্য দেশকে নিরস্ত্র করার ও না মানলে সেখানে হামলা চালিয়ে ধ্বংস করার এমন ন্যাক্কারজনক সর্বসম্মত প্রস্তাব জাতিসংঘের ইতিহাসে ইতিপূর্বে গৃহীত হয়নি বলে বিশেষজ্ঞগণ মন্তব্য করেছেন। এর কারণ ছিল একটাই যে, সদস্য দেশগুলির অব্যাহত বিরোধিতার মুখে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল হুমকির সুরে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘের নিগড়ে আবদ্ধ থাকবে না। সে একাই ইরাকে শক্তি প্রয়োগ করবে। ব্যস! তাতেই প্রস্তাব পাস। জাতিসংঘের ১৪৪১নং প্রস্তাবকে তাই প্রকারান্তরে ৩য় বিশ্বযুদ্ধের ও সেই সাথে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারার অবাধ লাইসেন্স বলা যেতে পারে। গত একযুগ ধরে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক অবরোধের ফলে ইরাকের প্রায় ১৫ লাখ মানুষ ক্ষুধায় অনাহারে ও বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করেছে। এভাবে ইরাককে সবদিক থেকে পঙ্গু করে এখন চূড়ান্ত হামলার মাধ্যমে তাকে তিন টুকরা করে সেখানে স্ব স্ব পুতুল সরকার বসিয়ে আজকের ঐক্যবদ্ধ ও সার্বভৌম ইরাককে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে ফেলাই বুশ-ব্লেয়ার-শ্যারণ চক্রের চূড়ান্ত লক্ষ্য। যেভাবে তারা ইতিপূর্বে গর্বাচেভকে দিয়ে এককালের বিশ্ব শক্তি সোভিয়েত রাশিয়াকে ১৬ টুকরায় বিভক্ত করে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে বিদায় করেছে। গণতন্ত্রের এই

বরকন্দাজরা ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তিমুরে দারিদ্র্য বিমোচন ও ধর্মপ্রচারের মুখোশে ঢুকে সেখানে খ্রিষ্টান সংখ্যাগরিষ্ঠতা সৃষ্টি করে। অতঃপর স্বাধীনতার ধুয়া তুলে একে ইন্দোনেশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়। অথচ এর অনতিদূরে দক্ষিণ ফিলিপাইনের মান্দানাও প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরকে 'সন্ত্রাসী' নামে আখ্যায়িত করছে। একইভাবে কাশ্মীরের ও চেচনিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরকেও তারা 'জঙ্গী' বলে অভিহিত করছে। আমেরিকা তার জন্মের পর থেকে বিগত ২২৫ বছরে অন্যূন ১৭৫টি দেশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সন্ত্রাস চালিয়েছে। এরপরেও সে গণতন্ত্রী ও মানবাধিকারবাদী।

আজ থেকে ১০০ বছর পূর্বে ১৯০২ সালে ওছমানীয় খলীফা সুলতান আব্দুল হামীদ ২য়-এর কাছে ইহূদীরা ফিলিস্তীনে তাদের জন্য আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার অনুমতি প্রার্থনা করেছিল। সেদিন সুলতান দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছিলেন, ওদের নেতা থিয়োডোর হার্জলকে জানিয়ে দাও, যতদিন পৃথিবীতে ওছমানী খেলাফত থাকবে, ততদিন যেন ফিলিস্তীনে ইহূদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অভিলাষ না করে। এটা কেবল তখনই সম্ভব হবে, যখন ওছমানী খেলাফত একটি অতীত ও স্বপ্ন হয়ে যাবে'। সুলতানের এই পরিষ্কার জবাব পেয়ে ইহূদীরা অন্য পথ ধরে এবং লেবাননের নাছিফ ইয়াযেজী, বুতরুস বুস্তানী প্রমুখ খ্রিষ্টান লেখক ও পণ্ডিতদের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যের তরুণ সমাজ ও মুসলিম নেতাদের মধ্যে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও জাতীয়তাবাদের বীজ বপন করতে থাকে ও সাথে সাথে তাদের মধ্যে পাশ্চাত্যের বিলাসী সংস্কৃতির বিষবাষ্প ছড়াতে থাকে। এতে দ্রুত ফল লাভ হয় এবং তুর্কী ও আরব জাতীয়তাবাদী চেতনার সংঘাতে বিশাল ওছমানী খেলাফত ছোট ছোট জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের থাবায় আবদ্ধ হয়ে যায়। অতঃপর ১৯২৪ সালে ওছমানী খেলাফত ধ্বংস হয়ে যায়। তারপর খুব সহজে ১৯৪৮ সালে কথিত 'ইসরাঈল' রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। অতএব আজকে যদি ইরাক বা মুসলিম বিশ্বকে বাঁচাতে হয়, তাহ'লে যেকোন মূল্যে মুসলমানদের ঐক্যের প্রতীক হারানো 'খেলাফত' পুনরুদ্ধার করতে হবে এবং পাশ্চাত্যের সকল জাহেলী মতবাদ আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বিধান পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র দিকে ফিরে যেতে হবে। ১৭ই রামাযানে বদরের

যুদ্ধের দিন যেভাবে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কেবল আল্লাহ্র নিকটে সাহায্য চেয়ে প্রাণভরে প্রার্থনা করেছিলেন এবং তার ফলে আসমান থেকে হাযার হাযার ফেরেশতা নেমে এসে সংখ্যালঘু নিঃসম্বল মুসলিম বাহিনীকে বিজয়ী করেছিল, আজও তেমনি সকল বৃহৎ শক্তির আশ্রয় থেকে মুখ ফিরিয়ে স্রেফ আল্লাহ্র নিকটে আশ্রয় ভিক্ষার মাধ্যমে এবং মুসলিম বিশ্বের সকল শক্তি সমন্বিত করে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সার্বিক জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমেই কেবল প্রকৃত বিজয় ও মুক্তি লাভ সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন![১৩৩]

৭৭. ইরাকে মার্কিন হামলা : বিশ্ব বিবেক জেগে ওঠ

স্তম্ভিত বিশ্ব, ক্ষুব্ধ বিবেক, হতচকিত মানবতা। ২০শে মার্চ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রির শেষ প্রহরে গর্জে উঠেছে দাজ্জালের বোমা। পশুত্ব মুখ ব্যাদান করে হামলে পড়েছে নিরীহ ইরাকীদের উপরে। গণতন্ত্র, মানবাধিকার, নৈতিকতা, আন্তর্জাতিক আইন-কানূন সবকিছুকে অগ্রাহ্য করে ইতিহাসের ঘৃণ্যতম রাষ্ট্রনায়ক জর্জ ডব্লিউ বুশ অন্যূন ১০,০০০ মাইল দূর থেকে উড়ে এসে হামলা শুরু করেছেন দুর্বল ইরাকের উপর। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈলখনি দখলের জন্য বুশ-ব্লেয়ার-হাওয়ার্ড তৈল ব্যবসায়ী বুর্জোয়া চক্র জোট বেঁধেছে। মিসরের বিগত যুগের অহংকারী সম্রাট ফেরাঊন তার প্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টি হবে এই ভয়ে বনু ইস্রাঈলীদের ঘরে পুত্র সন্তান জন্ম নিলেই তাকে মেরে ফেলার চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করে বিশ্ব ইতিহাসকে কালিমালিপ্ত করেছিল। তারও আগে ইরাকের নিন্দিত সম্রাট নমরূদ জ্বলন্ত হুতাশনে জীবন্ত ইব্রাহীমকে পুড়িয়ে নিঃশেষ করতে চেয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্র বিধানের সম্মুখে সবই ব্যর্থ হয়েছিল। এযুগের বুশ-ব্লেয়ার চক্র নমরূদ-ফেরাঊনকে বহুগুণ ছাড়িয়ে গেছে। কেননা নমরূদ-ফেরাঊন ব্যাপক গণহত্যা করেনি, মানুষের আবাসস্থল ঘরবাড়ি ধ্বংস করেনি, শহর-বন্দর জ্বালিয়ে দেয়নি। অথচ এরা তাই-ই করছে ‘গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের নামে’। বিশ্বের অগণিত বিবেকবান মানুষ এই অন্যায়-অনৈতিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিদিন ঘৃণা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন। খৃষ্টান ধর্মগুরু পোপ পলের আবেদন ও প্রার্থনাও হয়েছে ইরাকীদের সমর্থনে। ক্ষুব্ধ

---

১৩৩. ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০২।

মানুষ বুশ-এর ছবি মাড়িয়ে, তার কুশপুত্তলিকায় ফাঁসি দিয়ে, থুথু নিক্ষেপ করে, তাকে জুতিয়ে লাথিয়ে ও আগুনে জ্বালিয়ে ঘৃণা প্রকাশ করছে বিশ্বব্যাপী সর্বত্র। তবুও এই হিংস্র হায়েনাদের বিবেকে ধাক্কা লাগছে না। মযলূম ইরাকের নৈতিক বিজয় ইতিমধ্যেই সাধিত হয়ে গেছে। কারণ অন্যূন ১০০০ গুণ অধিক শক্তিশালী আমেরিকার বিরুদ্ধে ইরাকের এটি কোন যুদ্ধ নয়। বরং ডাকাতের হামলা থেকে স্রেফ আত্মরক্ষা মাত্র।

বুশ তার ভাষণে বলতে চেয়েছেন যে, তার এ হামলা হচ্ছে 'ইরাকীদের রক্ষার জন্য', 'বিশ্বকে রক্ষার জন্য জন্য' এবং 'ইরাকে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য'। এটা নাকি ইরাকী জনগণের কল্যাণে পরিচালিত 'মুক্তিযুদ্ধ'। মিথ্যারও একটা স্তর আছে। কিন্তু এতবড় ডাহা মিথ্যা যে কোন রাষ্ট্রনেতা বলতে পারেন, তা কল্পনাও করা যায়নি। খোদ ইবলীসও সম্ভবতঃ এমন তাযা মিথ্যা বলতে লজ্জাবোধ করবে। তবুও এসবই সত্য। কারণ শক্তি ও অর্থ তার হাতে। সম্ভবতঃ বুশ-এর রক্তচক্ষুর ভয়েই মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি চুপ মেরে আছে। কিন্তু তারা জানে না যে, ক্ষিপ্ত কুকুর কারু বন্ধু নয়। আজ ওরা ইরাককে ধরেছে, কাল তোমাকে ধরবে এটা নিশ্চিত। কারণ ইরাকী তেলের স্বাদ পাওয়ার পর এই হিংস্র দ্বিপদ পশুরা বিশ্বের সর্ববৃহৎ তৈলখনির অধিকারী সঊদী আরবের তেলের স্বাদ গ্রহণের জন্য উঠে পড়ে লাগবে। পার্শ্ববর্তী কুয়েত, কাতার, বাহরায়েন এগুলি তো ওদের কাছে সকালের নাশতার মত। অতএব ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী হকপন্থীদের যার যা আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মুকাবিলায় এগিয়ে আসা কর্তব্য। জালে আটকে পড়া সিংহকে একটি ছোট্ট মুষিক উদ্ধার করেছিল তার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে জাল ছিঁড়ে ফেলার মাধ্যমে। মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলো কিছুই না পারুক শত্রু বাহিনীকে তৈল সরবরাহ বন্ধ করে দিলেই তো যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। বিশ্বের বাকী রাষ্ট্রগুলি ইঙ্গ-মার্কিনীদের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে ও তাদের উৎপাদিত পণ্য বর্জন করে এক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে।

ইরাকে আমরা মানবতার পতন অবলোকন করছি। ইতিপূর্বে আফগানিস্তানে এ দৃশ্য আমরা দেখেছি। গত শতাব্দীতে জাপান, ভিয়েতনাম, বসনিয়া, সোমালিয়া ও কসোভোর মর্মান্তিক ইতিহাস বিশ্ববাসী এখনো ভুলে যায়নি। তারও পূর্বে ১৪৯২ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে খ্রিষ্টান রাজা ফার্ডিন্যাণ্ড ও তার

স্ত্রী ইসাবেলার চক্রান্তে ইউরোপের একমাত্র সমৃদ্ধ মুসলিম রাষ্ট্র স্পেনের রাজধানী গ্রানাডায় ৭ লক্ষ মুসলিম নর-নারীকে প্রতারণার মাধ্যমে মসজিদে ভরে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে ৮০০ বছরের গৌরবোজ্জ্বল ইসলামী শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছিল। মুসলমানদের ধোঁকা দিয়ে বোকা বানানোর এই বিয়োগান্ত ঘটনাকে স্মরণ করে আজও খ্রিষ্টান বিশ্ব April Fool's day পালন করে থাকে। কিন্তু ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়েছে কয়জন? এটা কে না জানে যে, সাদ্দাম হোসেন আমেরিকারই সৃষ্টি এবং তাকে দিয়েই ১৯৮০ সালে ইরানে হামলা চালিয়ে শক্তিশালী ইরান ও ইরাক উভয়কে ৮ বছরের যুদ্ধে কাবু করা হয়েছে। অতঃপর একই সাদ্দামকে দিয়ে ১৯৯০ সালে অন্যায়ভাবে তার সহযোগী ও বন্ধু প্রতিবেশী কুয়েতে আগ্রাসন চালানো হয়। আর এই সুযোগে আমেরিকা 'ত্রাণকর্তা' সেজে কুয়েত ও সঊদী আরবের মাটিতে ঘাঁটি স্থাপন করে। ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী চক্রের দীর্ঘ পরিকল্পনার অংশ হিসাবে তারা প্রথমে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার ইসলাম বিরোধী আক্বীদা প্রচার করে 'খেলাফত'-এর বিরুদ্ধে যুবশক্তিকে ক্ষেপিয়ে তোলে। অতঃপর কামাল পাশার মাধ্যমে ১৯২৪ সালে মুসলিম ঐক্যের প্রতীক 'ওছমানী খেলাফত' ধ্বংস করে ক্রমে মধ্যপ্রাচ্যকে ১৪টি রাষ্ট্রে বিভক্ত করে। তারপর তারা সাদ্দামকে দিয়ে প্রতিবেশী ইরান, কুয়েত ও সঊদী আরবের সাথে ইরাকের সুসম্পর্ক বিনষ্ট করে। অতঃপর বিগত ১৩ বছর যাবত জাতিসংঘ অবরোধের মাধ্যমে তারা শক্তিশালী ইরাককে দুর্বলতর করেছে। অতঃপর এবারের হামলায় তারা ইরাক দখল করে তাকে তিন টুকরা করে সেখানে তিনটি পুতুল সরকার কায়েম করবে। পরবর্তী টার্গেট অনুযায়ী তারা সঊদী আরবকে কুক্ষিগত ও ত্রিধাবিভক্ত করে সেখানেও তিনটি পুতুল সরকার কায়েম করবে। যেটা ওয়েবসাইট সূত্রে প্রাপ্ত বৃটিশ লেবার পার্টির পররাষ্ট্র বিষয়ক সংসদীয় কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান জর্জ গ্যালাওয়ের বক্তব্য থেকে এবং ২১.২.১৯৯৯ সংখ্যা 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকায় প্রকাশিত রবার্ট বি কাপলান-এর 'রি-ড্রয়িং অব মিড-ঈস্ট ম্যাপ' নামক নিবন্ধ থেকে জানা যায়।

গণতন্ত্রের লালনভূমি ইংল্যাণ্ড-আমেরিকার সরকারী ও বিরোধী দলের অধিকাংশ সদস্য বুশ ও ব্লেয়ারের এই অন্যায় আগ্রাসনকে সমর্থন করেছে। বিশাল অংকের যুদ্ধ বাজেট পাস করে দিয়েছে। যদিও তাদের দেশের লক্ষ

লক্ষ মানুষ নেতাদের এই অন্যায় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দৈনিক মিছিল-মিটিং করে যাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী চলছে নিন্দার ঝড়। একদিনেই সোয়াশো কোটি মানুষ পৃথিবীর ছয়শো শহরে ইঙ্গ-মার্কিন হামলা পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল করেছিল। শহরে-গ্রামে-বাজারে সর্বত্র বুশের গলায় এখন ছেঁড়া জুতা ঝুলছে। 'বুশ-ব্লেয়ারের গালে গালে জুতা মারো তালে তালে'-এ ধরনের শ্লোগানে মুখর এখন বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জ। বুশ এখন শয়তানের প্রতিমূর্তি। অন্যায়কারী ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে লোকেরা বলছে, 'তুই মানুষ না বুশ'। আমেরিকার জনগণ Hang Bush লিখে বুশের ফাঁসি দাবী করছে। ইংল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার জনগণেরও একই প্রতিবাদী কণ্ঠ ধ্বনিত হচ্ছে প্রতিদিন। নিন্দা ও বিক্ষোভের ঝড় ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে পৃথিবীব্যাপী। কিন্তু এগুলি জনমত নয়। এগুলির কোন মূল্য যুদ্ধবাজদের কাছে নেই। কেননা একবার ভোট দিয়ে যাদেরকে পার্লামেন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, স্ব স্ব মেয়াদকাল পর্যন্ত তারা যা খুশী তাই-ই করবে, এটাই গণতন্ত্র ও সেটাই সত্য ও ন্যায়ের মানদণ্ড (?)। আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়া এখন সেদেশের তৈল ব্যবসায়ী কতগুলি অর্থগৃধ্নু মন্ত্রী-এমপিদের হাতে যিম্মী। এদেরকে কি রোখার কেউ নেই? নিশ্চয়ই আছে।

আল্লাহ্‌র ওয়াদা এই যে, তিনি মানুষকে মানুষ দিয়েই প্রতিরোধ করে থাকেন *(বাক্বারাহ ২/২৫১)*। অতএব বাকী বিশ্বের রাষ্ট্রনেতা ও সাধারণ জনগণের মধ্য থেকেই আল্লাহ পাক কিছু বান্দাকে নিশ্চয়ই নির্বাচন করবেন এই যুলুম প্রতিরোধের জন্য। তাই একদিকে আমাদেরকে যেমন প্রাণভরে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। অন্যদিকে তাঁরই নির্দেশ অনুযায়ী সর্বশক্তি দিয়ে মযলূম ইরাকীদের সাহায্যে এগিয়ে যেতে হবে। এ দুঃসময়ে যদি বাকী বিশ্ব ও বিশেষ করে মুসলিম বিশ্ব তাদের যথাযোগ্য ভূমিকা পালন না করে, তাহ'লে পৃথিবী থেকে এখনই মানবতা বিদায় নেবে। পশুত্বের জয় হবে। ১৯৩৯ সালে যেমন জার্মান নেতা এডলফ হিটলারের যুদ্ধবাদী নীতির কারণে ২য় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয় ও 'লীগ অব নেশন্‌স'-এর অপমৃত্যু ঘটে, বর্তমানে তেমনি নয়া হিটলার জর্জ বুশ-এর যুদ্ধবাদী নীতির কারণে হয়তোবা 'জাতিসংঘে'র (UNO) অপমৃত্যু ঘটবে। ফলে পৃথিবীর মানুষ তাদের সর্বশেষ সান্ত্বনার স্থলটুকুও হারাবে। পরিশেষে বলব, হে মানুষ! তোমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে ভয় কর। তাঁর সর্বাধিক প্রিয় সৃষ্টি হিসাবে মানুষের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত কর।

পশুত্বকে প্রতিরোধ কর। আল্লাহ্‌র বিধান মেনে নিয়ে মযলূমের সাহায্যে এগিয়ে এসো। যালেমকে থামিয়ে দাও। নিশ্চয়ই সত্য বিজয়ী হবে, মিথ্যা পরাজিত হবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হ'লে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন![১৩৪]

৭৮. বাগদাদের পরাজয় : আমেরিকার পতনের সূচনা

৯ই এপ্রিল ২০০৩ বুধবার আসুরিক শক্তির হিংস্রতার কাছে প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি বাগদাদের পরাজয় হ'ল। সারা বিশ্ব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। যাদের কিছু ক্ষমতা ছিল, তারা কিছুই করল না। যাদের ক্ষমতা নেই, তারাই মিছিল-মিটিং করে ও বিবৃতি দিয়ে মনোবেদনার বহিঃপ্রকাশ ঘটালো। কিন্তু যা হবার তাই হ'ল। আসিরিয়, আক্কাদীয়, ব্যবিলনীয়, আব্বাসীয় প্রভৃতি প্রাচীন পৃথিবীর কয়েকটি বিলুপ্ত সভ্যতার কেন্দ্রভূমি ইরাক আজ দখলদার মার্কিনীদের চারণভূমি। ১২৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারীতে মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খাঁর ভাতিজা হূলাকু ওরফে হালাকু খাঁর হামলায় বাগদাদ বিধ্বস্ত হয়েছিল। সেদিনের প্রেক্ষাপট এবং আজকের প্রেক্ষাপট নিঃসন্দেহে ভিন্ন হ'লেও ধ্বংসের চরিত্র একইরূপ। সেদিন হালাকু এসে কেবল ৪০ লক্ষ বনু আদমকেই হত্যা করেনি, বরং বাগদাদের ঐতিহাসিক লাইব্রেরীকে ধ্বংস করেছিল সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে। লক্ষ লক্ষ বই ও পাণ্ডুলিপির চাপে সেদিন টাইগ্রীস নদীর পানিস্রোত সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কারণ হালাকুর উপদেষ্টাদের দূরদর্শী পরিকল্পনা ছিল বাগদাদকে চিরকালের জন্য তাদের অধীনস্ত করে রাখা। আর এজন্য সবচাইতে বড় প্রয়োজন ছিল, প্রথমে বাগদাদকে মুসলিম শূন্য করা। অতঃপর বেঁচে যাওয়া লোকদেরকে তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, তাহযীব ও তামাদ্দুন থেকে বঞ্চিত করা। তারা অত্যন্ত সুচারুরূপে তাদের উদ্দেশ্য হাছিল করতে সমর্থ হয়েছিল। এজন্য তারা কেবল অস্ত্র শক্তির উপরে ভরসা করেনি, বরং যাবতীয় কূট-কৌশল অবলম্বন করেছিল। তাই সেদিন হালাকুর লোকদের সাথে আব্বাসীয় খলীফার শী'আ মন্ত্রীর গোপন ষড়যন্ত্র হয় এবং তারই ফলশ্রুতিতে এক প্রকার বিনা যুদ্ধে বাগদাদের পতন হ'ল। হালাকু দৃশ্যতঃ বিজয়ী হ'লেও ইতিহাসে সে ঘৃণ্য প্রবাদ ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়। এবারেও তেমনি হানাদার ডব্লিউ বুশ কেবল তার বিশ্বসেরা অস্ত্র সম্ভারের

---

১৩৪. ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, এপ্রিল ২০০৩।

উপরে ভরসা করেনি, বরং সাদ্দাম হোসেনের অতি বিশ্বস্ত খ্রিষ্টান উপ-প্রধানমন্ত্রী তারেক আযীয ও রিপাবলিকান গার্ড বাহিনীর অধিনায়কদের সাথে তিন মাস আগে থেকেই ষড়যন্ত্র পাকিয়ে নেয়। যার ফলশ্রুতিতে এক প্রকার বিনা বাধায় বাগদাদের পতন ঘটে। হালাকুর পথ ধরে বুশও বাগদাদের জগৎ শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান মন্দির ও মিউজিয়াম ধ্বংস করেছে। যেখানে ছিল বিগত দশ হাযার বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্যের সঞ্চিত জ্ঞানসমুদ্র। ছিল আধুনিক সভ্যতার সূতিকাগার হিসাবে রক্ষিত অগণিত উপাত্ত ও উপাদান সমূহ। ছিল ইসলামী সভ্যতার ক্রমবিকাশের রেকর্ড সমূহ এবং আধুনিক শিক্ষা, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় মুসলমানদের অসামান্য অবদানের জ্বলন্ত স্বাক্ষর সমূহ। অথচ তারা বাগদাদের ব্যাংক সমূহে রক্ষিত দীনার ও ডলারে হাত দেয়নি। কেননা মাত্র ৬০০ বছরের যাযাবর জাতি ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মিসকীন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী অপরের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সহ্য করতে পারে না। সংকীর্ণতায় তাড়িত ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী তাই ইরাকের সুপ্রাচীন ও সুবিশাল ঐতিহ্যিক সঞ্চয়কে বেশী ভয় পেয়েছে ও তাকেই সর্বাগ্রে ধ্বংস করেছে। এতে সে সামরিক বিজয় লাভ করলেও বিশ্ব ইতিহাসে বুশ আজ হালাকুর ন্যায় সর্বাধিক ঘৃণিত ব্যক্তি হিসাবে সর্বত্র ধিকৃত হচ্ছে।

২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের 'টুইন টাওয়ার' ধ্বংস কারা করেছিল, তার সুস্পষ্ট প্রমাণ আজও আমেরিকা পেশ করতে পারেনি। তবে সেদেশেরই দেওয়া তথ্যাদির আলোকে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এটি ছিল মুসলিম বিশ্বকে গ্রাস করার অজুহাত সৃষ্টির জন্য আন্তর্জাতিক ইহূদী-খ্রিষ্টান চক্রের সুদূরপ্রসারী চক্রান্তের অংশ। এতে সরাসরি হাত ছিল ইহূদী চক্রের। আর সেজন্যই 'টুইন টাওয়ারে'র অন্যান্য কর্মীরা ঐদিন অফিসে গেলেও প্রায় ৪০০০ ইহূদী কর্মীর কেউ ঐদিন অফিসে যায়নি। এছাড়া ঐদিন ইসরাঈলী প্রধানমন্ত্রীর নিউইয়র্ক সফরের কর্মসূচী থাকলেও অজ্ঞাত কারণে তা বাতিল করা হয়। এতসব প্রমাণ থাকতেও আমেরিকা আফগানিস্তানে আশ্রিত ও সঊদী আরব থেকে বিতাড়িত পাহাড়ের গুহায় গুহায় যাযাবর জীবনে বিপর্যস্ত বিভিন্ন রোগে জর্জরিত দুর্বল ওসামা বিন লাদেনকে প্রধান আসামী করে সকল প্রচার মাধ্যমে হুলস্থুল কাণ্ড বাঁধিয়ে দিল। বিশ্ববাসীর নিকটে কোনরূপ প্রমাণ উপস্থিত করতে না পারলেও সে হাযার হাযার মাইল দূর থেকে উড়ে এসে আফগানিস্তানে হামলা করে বসলো। সেদিনও তার সাথী ছিল তৎকালীন বৃটিশ

প্রধানমন্ত্রী। কেননা বৃটিশ ও আমেরিকা মূলতঃ একই রক্তে জন্ম। বৃটিশ ইংরেজদেরই একটা অংশ আমেরিকায় গিয়ে শক্তি সঞ্চয় করে আজ সারা বিশ্বের অশান্তির কারণে পরিণত হয়েছে। আফগানিস্তান দখলের জন্য সেদিনও দেশপ্রেমিক তালেবান শাসকদের বিরুদ্ধে তারা ডলার আর চেয়ারের লোভ দেখিয়ে ব্যবহার করেছিল আফগান মুসলমানদেরই একটি গোষ্ঠীকে। আফগানিস্তানকে তারা ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। কিন্তু আজও ওসামা কিংবা মোল্লা ওমরের সন্ধান তারা পায়নি। যদি বলি, আমেরিকাই তাদেরকে মেরে নিশ্চিহ্ন করেছে কিংবা এমনভাবে গায়েব করেছে যে পৃথিবী কখনোই তাদেরকে আর খুঁজে পাবে না, তবে বলব যে, কোনটাই মিথ্যা হবে না।

সাদ্দামের ক্ষেত্রেও তারা সম্ভবতঃ একই নীতি অবলম্বন করেছে। কেননা জীবিত ওসামা বা সাদ্দামের চেয়ে নিহত ওসামা বা সাদ্দাম অধিক ভয়ংকর হবে- এটা সাম্রাজ্যবাদীরা ভালভাবেই জানে। ঊনবিংশ শতকে ভারতে জিহাদ ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে দখলদার ইংরেজরা অনেক সময় ফাঁসির আদেশ বাতিল করে দ্বীপান্তরের আদেশ দিত। যেন মুজাহিদগণ শহীদ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে না পারেন। অন্যদিকে মুসলিম জনগণও যেন তাদের রক্তের বদলা নিতে বিদ্রোহে ফেটে না পড়ে। এভাবেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ইতিপূর্বে হত্যা করেছিল 'ইসলামী পারমাণবিক বোমা'র রূপকার যুলফিকার আলী ভুট্টোকে যিয়াউল হকের মাধ্যমে। পরবর্তীতে রাশিয়াকে হটানোর জন্য তাকেই ব্যবহার করা হয় আফগানিস্তানে এবং তারই পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্টি হয় তালেবান ও তাদের নেতা মোল্লা ওমর বা ওসামা বিন লাদেনের। ওসামার বড় ভাই ছিলেন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের বিজনেস পার্টনার। সোভিয়েট রাশিয়াকে হটিয়ে দিয়ে ও তাকে ১৬ টুকরায় বিভক্ত করে অতঃপর যিয়াউল হককে মার্কিনীরা সুকৌশলে বিমান দুর্ঘটনার মাধ্যমে হত্যা করে। এরপর তাদেরই সৃষ্ট তালেবানদের উৎখাত করে এখন তারা আফগানিস্তানের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসেছে। যদিও বিশ্ববাসীকে ধোঁকা দেয়ার জন্য হামীদ কারজাই নামক এক আফগান মীরজাফরকে সেখানকার রাষ্ট্রীয় গদীতে বসানো হয়েছে। টুইন টাওয়ার ধ্বংসের ফলে ৩০০০ মানুষের জীবন গেছে ও তার পুনর্গঠনে মাত্র ৪০ কোটি ডলারের প্রয়োজন হয়েছে। তার বিনিময়ে সে পেয়েছে আফগানিস্তান দখলের একটি মহা অজুহাত, ২৮ বছর পূর্বে নেওয়া তার বিশ্বজয়ী ব্লু প্রিন্ট বাস্তবায়নের জন্য।

১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাঈল যুদ্ধের পরে সঊদী আরবের ক্ষণজন্মা পুরুষ বাদশাহ ফায়ছালের উদ্যোগে ১৯৭৩ সালে মধ্যপ্রাচ্যের তৈলসম্পদকে প্রথমবারের মত অস্ত্র হিসাবে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বে চরম ভীতি ও উৎকণ্ঠা দেখা দেয়। ফলে মার্কিন ইঙ্গিতে ভাতিজা মুসাইয়েদকে দিয়ে চাচা ফায়ছালকে হত্যা করা হয় ১৯৭৫ সালের ২৫শে মার্চ তারিখে। ইতিমধ্যে ১৯৭৩ সালেই তারা পরিকল্পনা প্রণয়ন করে উত্তর আফ্রিকা থেকে পাকিস্তান পর্যন্ত পুরা মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ার তৈলসমৃদ্ধ বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের উপরে মার্কিন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার। ১৯৯১ সালে প্রতিদ্বন্দ্বী পরাশক্তি সোভিয়েট রাশিয়াকে আফগানিস্তান থেকে হটিয়ে তাকে টুকরা টুকরা করার পরে একক পরাশক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী আমেরিকা এখন তার সেই ব্লু প্রিন্ট একে একে বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। ২০০১ সালের ৭ই অক্টোবর বিনা অজুহাতে ও বিনা প্রমাণে সে আফগানিস্তান দখল করল এবং সাথে সাথে পাকিস্তানকে তার বগলদাবা করে নিল। এভাবে সে আফগানিস্তানের উপর দিয়ে তেলের পাইপলাইন নিয়ে যাওয়ার পথ নিষ্কণ্টক করে নিয়ে দেড় বছরের মাথায় ২০০৩ সালের এপ্রিলে এসে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈলভাণ্ডার ইরাক দখল করে নিল। এই আগ্রাসন পরিকল্পনায় তার ব্যয় হয়েছে ২০,০০০ কোটি ডলার ও নিহত হয়েছে মাত্র কয়েক শত সৈন্য। কিন্তু বিনিময়ে পেয়েছে তারা বহু কিছু। সেজন্য তাদের দেশের সরকারী ও বিরোধী দলের অধিকাংশ এমপি চোখ বুঁজে বুশ-ব্লেয়ার ডাকাত চক্রকে সমর্থন দিয়ে গেছে। এখন বুশের জনপ্রিয়তা নাকি তার দেশে অনেক বেড়ে গেছে। ফলে পশু শক্তিতে বিজয়ী বুশ-ব্লেয়ার চক্র যে বাধাহীন গতিতে সম্মুখে এগিয়ে যাবে দিগ্বিজয়ের নেশায় বিগত দিনের চেঙ্গিস-হালাকু, আলেকজাণ্ডার-হিটলারদের মত এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। গণতন্ত্র, মানবাধিকার এসবই কথার কথা মাত্র।

তবুও বলব, সবকিছুরই একটা সীমা আছে। আল্লাহ্র মার দুনিয়ার বাইর। আজকের ইরাকের ব্যবিলন, যা তখন ছিল মেসোপটেমিয় সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র এবং পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম, তাকে দখল করে নিয়েছিল গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার। কিন্তু সেই ব্যবিলন ও সেই ইরাক কি পরবর্তীতে স্বাধীন হয়নি? হিটলার বিশ্বজয়ে বের হয়ে রাশিয়া দখলের দোরগোড়ায় মস্কো পৌঁছে

প্রচণ্ড শীতে দলে দলে তার সৈন্যদের মরতে দেখে রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হন। হিটলারের মৃত্যু আজও রহস্যাবৃত হয়ে রয়েছে। জার্মানরা আজও জানেনা তাদের নেতা কোথায় কিভাবে মরেছে। বুশ-ব্লেয়ারও একদিন পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে। সেদিন তাদের দখলীভূত এলাকা তাদের পরবর্তীদের অধিকারে নাও থাকতে পারে। বরং হাদীছের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী উল্টোটাই হওয়া স্বাভাবিক যে, 'পৃথিবীর এমন কোন বস্তিঘরও থাকবে না যেখানে ইসলাম প্রবেশ করবে না। হয় ইসলাম কবুলের মাধ্যমে সম্মানের সাথে, না হয় জিযিয়া কর দিয়ে অসম্মানের সাথে'। দুনিয়ার সবকিছু মিথ্যা হ'তে পারে, কিন্তু রাসূলের বাণী মিথ্যা হবার নয়। সারা বিশ্ব মুসলমানদের পদানত হবে। ইমাম মাহদী আসবেন। ইতিহাসের কুখ্যাত ও ঘৃণিত ইহূদী-নাছারাকে তিনি একটা একটা ধরে হত্যা করবেন।

অতএব হে মুসলিম উম্মাহ! তোমাদের ভয় নেই, নৈরাশ্য নেই, যদি তোমরা ঈমানদার হ'তে পার। এসো প্রতিজ্ঞা করি ইহূদী-নাছারা দুষ্টচক্রের দেওয়া ডলার ও মতবাদের লেজুড়বৃত্তি নয়, এসো আমরা আল্লাহ্র রজ্জুকে সমবেতভাবে ধারণ করি। তাঁর প্রেরিত অহি-র বিধানকে সার্বিক জীবনে মেনে চলি এবং নিজেদের যা আছে, তাই নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলি। নৈতিক ও বৈষয়িক উভয় শক্তিতে আমাদের বলিয়ান হ'তে হবে। বৈষয়িক উন্নতি কোন উন্নতি নয় যদি তার সাথে নৈতিক উন্নয়ন না ঘটে। ইঙ্গ-মার্কিন চক্রের মিথ্যাচার আজ সবার চোখে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। বাগদাদের ঐতিহ্যবাহী জাদুঘর ও জাতীয় লাইব্রেরী ধ্বংস করায় ইতিমধ্যেই এর প্রতিবাদে বুশের তিনজন সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা পদত্যাগ করেছেন। উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান মার্টিন সালিভল এবং টনি ব্লেয়ারের বৈদেশিক উন্নয়নমন্ত্রী ক্লেয়ার শর্ট এই ধ্বংসযজ্ঞের তীব্র নিন্দা করেছেন। তাই বলব, গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র খোঁজার মিথ্যা অজুহাতে ইঙ্গ-মার্কিন চক্র সর্বাধিক গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র ব্যবহার করে সভ্যতা ও মানবতাকে অপদস্থ করে ইরাকে বাহ্যতঃ বিজয় লাভ করলেও এর মাধ্যমেই তার পতনের সূচনা হ'ল। আল্লাহ দাম্ভিকদের কখনোই পসন্দ করেন না। নিশ্চয়ই অহংকারীর পতন সময়ের ব্যাপার মাত্র। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন![১৩৫]

---

১৩৫. ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা মে ২০০৩।

৭৯. আরাফাত চলে গেলেন

ফিলিস্তীনী জনগণের সাহস ও চেতনার প্রতীক, নির্যাতিত মানবতার প্রতিরোধ সংগ্রামের অগ্নিপুরুষ, ফিলিস্তীনীদের প্রায় অর্ধ শতাব্দীকালের কিংবদন্তীতুল্য নেতা ইয়াসির আরাফাত চলে গেলেন। রেখে গেলেন একরাশ প্রশ্ন : তিনি কি সন্ত্রাসী ছিলেন, না শান্তিবাদী ছিলেন? তিনি কি ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন, না ধর্মচেতনা সম্পন্ন ছিলেন? প্রথম কথায় আসা যায়। হিংসুক ও নোংরা মানসিকতা সম্পন্ন কিছু ইহূদী ও খ্রিষ্টানের কাছে তিনি ছিলেন 'সন্ত্রাসী'। তারা তাঁর মৃত্যুতে খুশী হয়ে আনন্দে নেচেছে। কিন্তু পৃথিবীব্যাপী সাধারণ মানুষ তার জন্য কেঁদেছে। কি ছিল কারণ?

চার বছর বয়স থেকে মাতৃস্নেহহারা শিশু মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ আরাফাত ওরফে ইয়াসির আরাফাত ফিলিস্তীনের হাযার বছরের স্থায়ী বাশিন্দাদেরকে কেবল মুসলিম হওয়ার অপরাধে (?) মুহাজির বেশে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবিরে অপরের দান-ভিক্ষা নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করতে দেখেছেন। দেখেছেন গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ধ্বজাধারী ইঙ্গ-মার্কিন চক্রান্ত কারীদের মদদে বিভিন্ন দেশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ইহূদীদের আমদানী করে ফিলিস্তীনে জোর করে বসাতে। দেখেছেন নির্যাতিত মানুষের ত্রাণকর্তা, সর্বহারাদের আশ্রয় বলে খ্যাত কম্যুনিস্ট রাশিয়ার নগ্ন সমর্থনে জাতিসংঘে ফিলিস্তীন বিভক্তির প্রস্তাব পাস হ'তে। দেখেছেন চোখের সামনে ফিলিস্তীনীদের উপর বহিরাগত ইহূদীদের নির্মম হত্যা, লুণ্ঠন ও বিতাড়নের লোমহর্ষক দৃশ্য। ২০ বছরের তরুণ আরাফাতের ভেতরকার জিহাদী চেতনা তাই শাণিত হয়ে উঠেছিল সেদিন। গঠন করলেন ফিলিস্তীনী ছাত্র সংগঠন। শুরু করলেন প্রতিরোধ সংগ্রাম। পরবর্তীতে ঐ চেতনারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তার সারাটি জীবনে কখনো আল-ফাতাহ গেরিলা নেতা হিসাবে, কখনো পিএলও চেয়ারম্যান হিসাবে, কখনো প্রেসিডেন্ট আরাফাত হিসাবে। আন্তর্জাতিক পরাশক্তিগুলি তাকে দমন করার জন্য নানা বিলাসী প্রস্তাব দিয়ে তাকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছে। তাই দেখা গেছে শান্তিবাদী নেতা হিসাবে তাকে নোবেল প্রাইজ নিতে আন্তর্জাতিক কাশিমবাজারের কুঠি হোয়াইট হাউসে প্রবেশ করতে। আবার কখনো দেখা গেছে সর্বহারাদের স্বর্গ বলে পরিচিত মস্কো-পিকিং-এর নেতাদের সাথে তাদের রাজধানীতে আপ্যায়িত হ'তে। কিন্তু না! আরাফাত তার নিজস্ব চেতনাতে আবার ফিরে এসেছেন অবশেষে। নির্যাতিত

ফিলিস্তীনীদের সাথেই তিনি আমৃত্যু অবস্থান করেছেন রামাল্লায় তার সদর দফতরে। মৃত্যুর পূর্বের তিন বছর সেখানে বাস্তবে গৃহবন্দী থেকেছেন বোমা হামলার মধ্যে সর্বদা জীবন ও মৃত্যুর মুখোমুখি অবস্থানে।

সংখ্যাগুরু ফিলিস্তীনী আরব মুসলিম জনগণকে বিতাড়িত করে বহিরাগত মুষ্টিমেয় ইহূদীরা ফিলিস্তীনের ৮০ ভাগ এলাকা জবর দখল করে সেখানে তাদের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করল কথিত গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের আন্ত র্জাতিক মোড়লদের মদদে। অথচ সর্বোচ্চ ছাড় দিয়েও তিনি ফিলিস্তীনের স্বাধীনতা ফিরে পাননি। ফলে যে হারানোর বেদনায় তরুণ বয়সে তাঁর সংগ্রামী জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল, সেই হারানোর বেদনা নিয়েই তাঁকে বৃদ্ধ বয়সে পৃথিবী থেকে বিদায় হ'তে হ'ল।

ইয়াসির আরাফাত তাই কখনোই সন্ত্রাসী ছিলেন না। মূল সন্ত্রাসী তারাই, যারা তাকে অস্ত্র হাতে নিতে বাধ্য করেছিল। ১৯৮২ সালে লেবাননের ফিলিস্তীনী উদ্বাস্তু শিবিরে হামলা চালিয়ে তৎকালীন ইসরাঈলী প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ও আজকের প্রধান মন্ত্রী এরিয়েল শ্যারণ যখন অন্যূন ৩০০০ ফিলিস্তীনী মুহাজিরকে বোমা মেরে হত্যা করেছিল, তখন তাকে কেউ সন্ত্রাসী বলেনি। আজও যখন সে প্রতিদিন ফিলিস্তীনে গোলা বর্ষণ করে নিরীহ মুসলিম নরনারী-শিশুকে হত্যা করছে, তখন তাকে কেউ সন্ত্রাসী বলছে না। অথচ ইহূদী কামানের বিরুদ্ধে ফিলিস্তীনীরা ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করলে সেটা হচ্ছে সন্ত্রাস। এটাই হ'ল আজকের নিষ্ঠুর বাস্তবতা। কিন্তু এটা মূলতঃ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও প্রতিশোধ। যদি এটা স্রেফ আল্লাহ্র জন্য হয়, পরকালীন মুক্তির জন্য হয়, বিপন্ন মানবতার কল্যাণের জন্য হয়, তাহলে এটা হবে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। এ পথে মরলে শহীদ, বাঁচলে গাযী। এ পথের সংগ্রামীদের কোন মৃত্যু নেই। তারা অমর। মুসলিম সন্তান ইয়াসির আরাফাতের হৃদয়ের গভীরে যদি উক্ত নিয়ত ক্রিয়াশীল থাকে, তবে তিনি উক্ত মর্যাদা পাবেন আল্লাহ্র মেহেরবানী হলে। যদিও বিশ্ব বাস্তবতার আন্তর্জাতিক চাপে তাকে কখনো দেখা গেছে ধর্মনিরপেক্ষ হ'তে। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ্র প্রথম ক্বিবলা ও মে'রাজের স্মৃতিধন্য পবিত্র বায়তুল মুক্বাদ্দাস স্বাধীন করে সেখানেই মৃত্যু শয্যা গ্রহণের আগ্রহ পোষণকারী ইয়াসির আরাফাতের চেতনায় যে ইসলামী বিশ্বাস ক্রিয়াশীল ছিল, এটা নিঃসন্দেহে বলা চলে। যেমন এখানেই মৃত্যু বরণের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন যালেম ফেরাঊনের হাত থেকে মযলূম বনু

ইস্রাঈলীদের মুক্তিদূত বিশ্বনন্দিত নবী হযরত মূসা (আঃ)। এমনকি হযরত আদম (আঃ) ও হযরত ইউসুফ (আঃ) এখানেই নিজেদের দাফন হওয়ার অছিয়ত করেছিলেন।

কোন সমাজে কোন বিপ্লবী সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটলে তাকে প্রশংসার চেয়ে সমালোচনার বাণে বেশী বিদ্ধ হ'তে হয়। কিন্তু তার মৃত্যুর পরেই মানুষ তাকে চিনতে পারে। ইয়াসির আরাফাতও প্রশংসার চেয়ে সমালোচনার আঘাতে জর্জরিত হয়েছেন বেশী। কিন্তু তার মৃত্যুর পরে দেখছি বিশ্বকে কাঁদতে। মুসলিম-অমুসলিম সকল মযলূম মানবতা আজ তার জন্য শূন্যতা অনুভব করছে। এটাই তার বড় পাওয়া। যদিও সে পাওয়া তিনি দেখে যেতে পারেননি। যালেম ও মযলূমের দ্বান্দ্বিক ইতিহাসে চিরকাল আরাফাতরাই স্থান পেয়ে থাকেন। চিরকাল ঘৃণাভরে উচ্চারিত হবে ঘৃণিত বুশ ও শ্যারণদের নাম। কিন্তু আরাফাতরা থাকবেন চিরদিন স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে। আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁর রেখে যাওয়া ফিলিস্তীন মুক্তি আন্দোলন সফল হৌক সেই প্রার্থনা করছি।

জানা আবশ্যক যে, আল-কুদ্স কেবল আরাফাতের নয়, কেবল ফিলিস্তীনীদের নয়, আল-কুদ্স সকল মুসলমানের। তাই আল-কুদ্সের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশ্বের সকল মুসলমানের শামিল হওয়া কর্তব্য। মুসলিম নেতৃবৃন্দ যদি কখনো বিষয়টি উপলব্ধি করেন এবং 'ওআইসি'কে সক্রিয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক জোটে রূপান্তরিত করেন, তাহলে ফিলিস্তীন তো বটেই, আফগানিস্তান, ইরাক, কাশ্মীর, চেচনিয়া, সূদান, সোমালিয়া সহ বিশ্বের সকল স্থান হ'তে মুসলিম নির্যাতন নিমেষে বন্ধ হয়ে যাবে। মযলূম মানবতা ইসলামের সুমহান আদর্শের ছোঁয়া পেয়ে ধন্য হবে। সারা পৃথিবী একদিন ইসলামী খেলাফতের ছায়াতলে চলে আসবে ইনশাআল্লাহ।[১৩৬]

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك،

اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب-

***

১৩৬. ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৪।